Ph. D.

Ph. D.

RB
S91.4
KH

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম

মোঃ জামান খান

Dhaka University Library
382305

382305

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ জামান খান কর্তৃক উপস্থাপিত 'বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

২৫/১২/১৮

(ড. সৈয়দ আকরম হোসেন)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ১ – ৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
এস. ওয়াজেদ আলির প্রবন্ধ ৪১ – ৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
এস. ওয়াজেদ আলির ছোটগল্প ৭৩ – ১২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
এস. ওয়াজেদ আলির ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী ১৩০ – ১৪৮

উপসংহার ১৪৯ – ১৫১

পরিশিষ্ট ১৫২ – ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

১৯৯৩ -৯৪ শিক্ষাবর্ষে *বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধনভুক্ত হই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাকে চাকুরিরত অবস্থায় কলেজের স্বাভাবিক পাঠদানে কোন বিঘ্ন ঘটবে না – এই শর্তে অনুমতি প্রদানে সম্মত হন। ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে নির্ধারিত সময়ে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করতে পেরে আমি আনন্দিত।

বর্তমান অভিসন্দর্ভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেনের তত্ত্বাবধানে রচিত। গবেষণা নির্দেশনার দায়িত্ব পালনে সম্মত হওয়ায় তাঁর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনিই আমাকে গবেষণা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। গবেষণা-পরিকল্পনা ও বিষয়-মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর মীমাংসা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনা ছাড়া আমার পক্ষে এ-গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলো না।

বাংলা সাহিত্যে এস. ওয়াজেদ আলি এক শক্তিমান সাহিত্যিক। তিনি বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রজ্ঞাবান পথিকৃৎ। ইতোমধ্যে সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলি সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও, তা তাঁর বহুমুখী সাহিত্যকর্মের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন নয়। এই অপূর্ণতা লক্ষ করে আমি এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম বিবেচনায় মনোনিবেশ করি। এস. ওয়াজেদ আলির জীবন নয়, সাহিত্যকর্মই আমার গবেষণার মুখ্য বিষয়। তবে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যতোটা প্রাসঙ্গিক, তাঁর জীবন-কর্মাভিজ্ঞতা ততোটাই গ্রহণীয় হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে এস. ওয়াজেদ আলি এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ও শক্তিমান স্থপতি। বিষয়বৈচিত্র্যে ও রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে তাঁর সাহিত্যকর্ম শিল্পসফল ও কালোত্তীর্ণ। প্রবন্ধ, গল্প, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি রচনায় তাঁর শক্তি অভিনব ও সাফল্য বিচিত্র।

সাহিত্যসাধক এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্মের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে মূল অভিসন্দর্ভ চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানসের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা, জাতিভাবনা, রাষ্ট্রচিন্তা, সাহিত্য ও শিল্পভাবনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তর্ভূত হয়েছে এস. ওয়াজেদ আলির প্রবন্ধ। তাঁর প্রবন্ধগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে ও রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে শিল্পসফল ও কালোত্তীর্ণ এবং তা নতুন চেতনা-সঞ্চারী এক অভিনব সাহিত্যসৃষ্টি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তারই মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে এস. ওয়াজেদ আলির গল্প। গল্প-সংগঠনে এস. ওয়াজেদ আলি সমকাল-অনুগত হয়েও পরীক্ষাপ্রবণ, বৈচিত্র্যসন্ধানী এবং নিজস্ব শৈলী উদ্ভাবনে যত্নশীল। তাঁর অনেকগুলি গল্পের বিষয়, ফর্ম ও ভাষারীতিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও সেগুলি কারো পুনরাবৃত্তি নয়, বরং স্বভাবে স্বতন্ত্র। ঘটনাক্রম, চরিত্রাবলি এবং আবেষ্টনীকে অতিক্রম করে তাঁর গল্প সুস্থির হয় মহোত্তম দর্শনে। তাই তিনি রূপক গল্প রচনায় প্রেরণা ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন সর্বাধিক। তাঁর গল্পগুলি আধুনিক ভাষার এক নিপুণ শিল্প-দক্ষতায় নির্মিত। চরিত্রায়ন ও ঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর গদ্যে বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, অনুপ্রাস, উপমা প্রয়োগ এবং চিত্রকল্প নির্মাণ-দক্ষতা প্রচলিত গল্পের ধারায় স্বতন্ত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী। এস. ওয়াজেদ আলির ইতিহাস-জ্ঞান, বিবেচনাবোধ ও ভবিষ্যৎ-দর্শী মননশীলতাও ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি ইতিহাসের নিষ্প্রাণ তথ্য পরিবেশন না করে সে তথ্যকে আশ্রয় করে আপন কল্পনা-প্রতিভার সাহায্যে জীবনরস সৃষ্টি করেছেন এবং ইতিহাসের তথ্যের শূন্যস্থান পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ঘটনা, চরিত্র ও যুগ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা দান করেছেন। তাঁর ভ্রমণসাহিত্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণের ক্রমান্বয়ী বিবরণ, যানবাহনের যোগাযোগ, ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতির বিশেষত্ব সমূহের বিবরণই শুধু প্রকাশ করে নি – পরিবেশভেদে অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা, অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা, লোকাচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং এর সঙ্গে গল্পরস মিশিয়ে একে শিল্পরূপ দান করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* থেকে অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি-পাঠ (Text) গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে এস. ওয়াজেদ আলির গ্রন্থপঞ্জি, প্রকাশিত রচনাসমূহের প্রকাশ-তথ্য, এস. ওয়াজেদ আলি-চর্চা এবং এ-বিষয়ে সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলি ও এস. ওয়াজেদ আলির জীবনের রূপরেখা সংযোজন করা হলো। আমার বিশ্বাস, সংযোজিত তথ্যাবলি ভবিষ্যত এস. ওয়াজেদ আলি-গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সতর্কতা সত্ত্বেও বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল, এজন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস

ব্রিটিশ শাসন-আমলে বাঙালি হিন্দু-সমাজেই প্রথম রেনেসাঁর স্ফুরণ ঘটে, অনুভূত হয় ভাবসংঘাত এবং বাঙালি মুসলমান সমাজে এর স্পন্দন জাগে অর্ধ-শতাব্দীরও পরে। মুসলমানদের মধ্যে যে ভাব-আন্দোলন দেখা দেয় তা ছিল ধর্মজীবনের আদর্শে পূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে বাঙালি মুসলমান সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ বোধ করে নি। তাঁরা আরবি-ফারসি শব্দ বহুল কাব্যধারার সৃষ্টি করেছেন। এই রীতির কাব্যধারা রূপ-রসে বিচিত্র না হলেও বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার ঐতিহাসিক পেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। "একালে মুসলমান সমাজে যে সব ভাব-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল প্রাচীন ধর্ম জীবনের আদর্শে ফিরে যাবার ইচ্ছা। এসব আন্দোলনের মূল্য স্বীকার করে বলা যায় যে, বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে আধুনিক জীবন ও জগতের বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এদের দায়িত্ব যথেষ্ট। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের দিকে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কে সচেনতা দেখা দেয় এবং শিক্ষা গ্রহণে তার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ-সময়েই তারা আত্মনিয়োগ করেন, এর পূর্বে এদিকে মনোনিবেশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"[১] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁরা হিন্দুদের মতো সচেতন ছিলেন না, এবং হিন্দুদের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে ছিলেন। এই থাকার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে।

১৭৯৩ সনে লর্ড কর্নওয়ালিশের (১৭৩৮-১৮০৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। জমির মালিকানা কৃষকের হাত থেকে চলে আসে জমিদারের হাতে। ১৭৯৭ সনে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'সপ্তম আইন' প্রবর্তন করে জমিদারদের অত্যাচার করার আরো সুযোগ করে দেয়। প্রজারা যাতে জমিদারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার সুযোগ না পায়, তার জন্য ১৮১২ সনে প্রবর্তিত 'পঞ্চম আইনে' জমিদার বা তার কর্মচারির বিরুদ্ধে মামলা করা নিষিদ্ধ হয়। তারপর ১৮২৮ সনে 'লাখেরাজ সম্পত্তি' (১৮২৮) ভোগকারীদের বিরুদ্ধে পর পর অনেকগুলো আইন পাশ করা হয়। এসব আইন আদালতের খাতায় থাকলেও জনগণ তা জানতে পারতো না। ফলে গ্রামের বেশির ভাগ মুসলমান যারা 'লাখেরাজ সম্পত্তি' ভোগ করতো তারা তাদের অগোচরেই সব সম্পত্তি হারাতো। এ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমান সমাজ আর্থিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যবসার নামে কোম্পানির লুণ্ঠন এবং শাসনের নামে খাজনা আদায়ে এ দেশের অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ ক্ষেত-মুজুরে এবং ক্ষেত-মজুর ভিখারিতে পরিণত হয়। শিক্ষার ব্যাপারেও মুসলমানদের শোচনীয় দুর্গতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমানদের এ দুর্গতির প্রধান কারণ তাদের আর্থিক দৈন্য। ফারসি ভাষা বর্জন করতে গিয়ে হিন্দুর ধর্ম বা ঐতিহ্যের কোন টান পড়ে নি। সরকারি ভাষা হিসেবে তারা ফারসি ছেড়ে ইংরেজি গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। কিন্তু মুসলমানেরা তা সহজে পারে নি। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরগুলোতে যে সব মুসলমান ফারসি-নবিশ সরকারি অফিস-আদালতে কাজ করতো তারা তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হারিয়ে ফেলে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজরা বাংলাদেশের পণ্য ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে গড়ে তোলে বড় বড় কলকারখানা। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং তাঁতিদের জীবিকা কোম্পানি ও দেশী কর্মচারিদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ ও কুসংস্কারকে অবলম্বন করে এক ধরনের আরবি শিক্ষা এদেশে বিস্তার লাভ করে। কোরানের ভাষা হিসাবে আরবি শেখা মুসলমানেরা তাদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতো। তথাকথিত একশ্রেণীর মোল্লারাই ছিল এ শিক্ষার প্রধান শিক্ষক। এক ধরনের আরবি মাদ্রাসা গ্রামে গ্রামে তাদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। এ সব মোল্লারা যা পড়াতো তার এক বর্ণও ছাত্ররা বুঝতো না।১

সেকালে মুসলমানেরা কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। এজন্যে ইংরেজদের সাথে তারা মেলামেশার সুযোগও পায় নি। তাই ইংরেজি শেখার জন্য তাদের গরজও জাগে নি। তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জাগে হতাশা। আর এ হতাশার জন্যে তারা ইংরেজ সমাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকার জন্যেই তাদের মধ্যে নতুন সভ্যতার প্রভাব পড়ে নি। মুসলমান সমাজ যখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেই সময়ে সকলের পরামর্শ অনুযায়ী লর্ড বেন্টিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন করেন। এর ফলে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বেড়ে যায়। এতে বিভিন্ন চাকুরি হিন্দুদের অধিকারে চলে যায়। হিন্দু কলেজের (১৮১৭) প্রচেষ্টায় বাংলার হিন্দু সমাজ ইংরেজি ভাষা খুব সহজে আয়ত্ত করেছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিখতে এগিয়ে আসে নি।

> নানা রকম প্রতিবন্ধকতার ফলে বাঙালি মুসলমানের পক্ষে যেমন আশানুরূপ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সম্ভব হয় নি, তেমনি এক বিভ্রান্তির কবলে পড়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা দীর্ঘদিন সাড়া দেয় নি।২

সিপাহী অভ্যুত্থানের (১৮৫৭) ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (১৭৬৫-১৮৫৮ অক্টোবর) পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষকে মহারানীর শাসনাধীনে নিয়ে আসে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এর বিরোধিতা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আবেদন করলেও তা কার্যকর হয় নি। বরং ১৮৫৮-এর পর থেকে কোম্পানির কার্যকলাপ ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেলো। সহায়হীন চাষীর উপর শুরু হলো নির্মম অত্যাচার।

> ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ লক্ষ নীলচাষী ধর্মঘট করল। যে সব স্থানে নীলচাষ সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল যেমন, যশোর, নদীয়া, ফরিদপুর ও পাবনা জেলায়- সেইখানে এই ধর্মঘট ব্যাপক আকারে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দিল। কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও প্রজাদের প্রতিরোধ চলতে থাকলো পরবর্তী দু'বছর ধরে। এই ঘটনাই 'নীল বিদ্রোহ' নামে বিখ্যাত।[৩]

পরবর্তীকালে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এ আন্দোলন প্রসার লাভ করে। ফলে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সরকার নীল কমিশন বসান। কমিশনের রিপোর্ট বের হলে সরকার নীলকরদের অত্যাচার কমাবার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন। 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট' (১৮৬১) অনুযায়ী ভাইসরয়ের মহাব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে সদস্য রাখা হয়। সরকারি চাকুরিতেও ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উঁচু সরকারি পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (১৮৫৩) ব্যবস্থা গৃহীত হয়। "নীতিগতভাবে উচ্চ সরকারীপদে ভারতীয়দের নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তার বাস্তব রূপায়ণের পথে যতদূর সম্ভব বাধা সৃষ্টিই ছিল এ সমস্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।"[৪]

সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙালি মুসলমান সমাজে নবাব আব্দুল লতীফ (১৮২৮-১৮৯৩) ও সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) একই সময়ে একই ধরনের আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ পাশ্চাত্য মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ইসলামের সঙ্গে প্রগতির কোন বিরোধ নেই। অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে শিক্ষাক্ষেত্রে সচেতন করার জন্যে নবাব আব্দুল লতীফ আন্দোলন করেন। তাঁরই আন্দোলনের ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহিতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে নবাব আব্দুল লতীফ সমাজ সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে নবজাগরণের বাণী শোনাতে চেয়েছেন। নবাব আব্দুল লতীফের সঙ্গে সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য ছিল। আব্দুল লতীফ অনেক ক্ষেত্রেই স্যার সৈয়দের অনুসারী ছিলেন। বিশেষ করে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ এবং রাজনীতিতে যোগদানের ব্যাপারে উভয়ের মতামত ছিল একই ধরনের। স্বাভাবিকভাবেই আমীর আলীর সঙ্গে আব্দুল লতীফ একমত হতে পারেন নি।

> তাছাড়া আব্দুল লতীফের দৃষ্টিতে মুসলমানদের প্রয়োজন দাঁড়িয়েছিল শুধু ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য ও ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছু পরিচয় লাভ। কিন্তু এই নতুন শিক্ষাকে সত্যই কার্যকরী করার জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল যে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির – সে বিষয়ে (তিনি) আদৌ সচেতন হন নি।[৫]

অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তরের সাথে সাথে নতুন সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস দেখা দেয়। একদিকে জমিদার শ্রেণী আর একদিকে রায়ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। গ্রাম এলাকায় এই দুই শ্রেণীর পাশাপাশি দেখা দেয় জোতদার, ক্ষেতমুজুর ব্যবসায়ী, বণিক ও শ্রমিক শ্রেণী এবং কিছু বৃত্তিভোগী ও পেশাজীবী শ্রেণী। "নবগঠিত এই সব শ্রেণী আবার ঐতিহাসিক নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের ভূমিকা পালন করে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভবপর করে তোলে। বাংলার ভাগ্য বিপ্লবের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী বা ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদানই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।"[৬] উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে হিন্দু প্রাধান্য দেখা দেয়। হিন্দু-সমাজ পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতি ছিল স্বাভাবিক। "জমিদারী কেনা-বেচা করে, ব্যবসা-বাণিজ্য

Dhaka University Institutional Repository

দালালি-দেওয়ানী এজেন্সি করে যেভাবেই ধন সঞ্চয় করা হোক না কেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সেই সঞ্চিত মূলধন শ্রম-শিল্প ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে নিযুক্ত করা সম্ভব নয় এবং তা না করতে পারলে ধনতান্ত্রিক যুগের পরিপূর্ণ বিকাশ ও হতে পারে না। এ দেশের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর এই চেতনা থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে জাতীয় আন্দোলনের সুত্রপাত হয়।"[৭] সিপাহি বিদ্রোহের দায়িত্বটা মুসলমানের ঘাড়ে এসে পড়ে। শাসক মহল মনে করেছিল যে, মোঘল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানেরা এ বিদ্রোহ ঘটিয়েছে। *রাজভক্ত ভারতীয় মুসলমান* (১৮৬০) বইটিতে সৈয়দ আহমদ এর প্রতিবাদ করেন। তিনি মুসলমান সমাজের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি সিপাহি বিদ্রোহেরও বিরোধিতা করেন। চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানের ব্যাপক যোগাযোগ হয়।

পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্যে নবাব আব্দুল লতীফ সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন করে শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে সারা ভারতে মুসলমানদের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করেছিলেন। ১৮৭১ সনে নবাব আব্দুল লতীফ ভাইসরয় লর্ড মেয়োর সঙ্গে দেখা করে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে সরকারের অবহেলার প্রতি ভাইসরয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। "১৮৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি 'কাউন্সিল অব এডুকেশনে'র গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। মি. জে. আর কলভিন তখন কাউন্সিলরের অন্যতম সদস্য। তিনি ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে আব্দুল লতীফকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করেন। এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্শিয়ান বিভাগ খোলা হয়।"[৮]

ইংরেজি শিক্ষায় মুসলমান সমাজের উৎসাহের পরিচয় পেয়ে আব্দুল লতীফ ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দানের জন্যে সরকারকে চাপ দিতে থাকেন। পরবর্তীকালে এই চাপের ফলেই প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৭৩) মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। "প্রকৃত পক্ষে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লর্ড নর্থ ব্রুক প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর থেকেই মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার সব রকম প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।"[৯] ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বিচারপতি আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৯) চেষ্টায় 'ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নামে বাংলাদেশে আর একটি সংগঠন হয়। এ-সংগঠনও শিক্ষা কমিশনের কাছে মুসলমানদের দাবি সম্বলিত একটি 'মেমোরেন্ডাম' পেশ করে এবং এতে শুধু মুসলমানদের জন্যে কলকাতায় একটি কলেজ খোলার অনুরোধ জানায়।

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমান সমাজে যে ভাব-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার মূলে প্রাচীন ধর্মজীবনের আদর্শে ফিরে যাবার ইচ্ছা সর্বাংশে সক্রিয় ছিলো না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কে সচেনতা জাগে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে আসে। উনিশ শতকের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের হাতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয় নি। তখন বাঙালি মুসলমানদের লেখায় যে পরিমাণ আবেগ প্রকাশ পেয়েছে সেই পরিমাণ জীবন জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ প্রকাশ পায় নি। তবে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আগমনে বাঙালি মুসলমান লেখকদের চিন্তা ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। "উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও সভা-সমিতির প্রতি বাঙালি মুসলমান সমাজে আগ্রহ সৃষ্টি হলেও তা সর্ব স্তরের মুসলমানদের মনকে খুশি করতে পারে নি।"[১০]

সাহিত্যে আধুনিকতার অর্থই হলো নতুন মূল্যেবোধের প্রাগ্রসর চর্চা। সাহিত্যে মৌলিক পরিবর্তনের ফলে দেবদেবীর পরিবর্তে মানব জীবন প্রাধান্য লাভ করে। আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় বাঙালির সমাজ-জীবন, তার চিন্তা-ভাবনা ও দেশপ্রেম। বাংলা গদ্যের ব্যবহারই আধুনিক সাহিত্যের সূচনা করে এবং পরবর্তীকালে এ গদ্যই উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সৃষ্টি করে। বাংলা গদ্য শুধু শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখে। গদ্য রীতির প্রবর্তনের ফলেই সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রের সৃষ্টি হয় এবং রচিত হয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ। বাংলা গদ্যের সূচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০) অবদান থাকলেও এ গদ্যের কোন সুনির্দিষ্ট রীতিবৈশিষ্ট্য ছিল না। "এসময় থেকে ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত কালকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।"[১১]

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) পর্যন্ত কোন মুসলমান গদ্য লেখকের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় না। "তবে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মীর মুশর্রফ হুসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'রত্নাবতী' নামক উপন্যাসই আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট প্রথম বাংলা গদ্য রচনা বলিয়া মনে হয়।"[১২]

কাজী নজরুল ইসলামের আগে বাঙালি মুসলমান লেখকদের দৃষ্টি মুসলমান সমাজের বাইরে বেশি প্রসারিত হয় নি। "বাঙালি মুসলমান সমাজে কাজী নজরুলই প্রথম মৌলিক প্রতিভা যিনি সমগ্র বাঙালি সামাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"[১৩]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমান সাহিত্য সাধনার নতুন ধারার সূচনা করে। তবে উনিশ শতকের সপ্তম দশকের আগে বাঙালি মুসলমানের আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে। ফলে তারা সাহিত্য সৃষ্টি করলেও সে সাহিত্য জীবন জিজ্ঞাসায় পূর্ণতা লাভ করে নি।

ইংরেজি শিক্ষার ফলে শিক্ষিত বাঙালি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়। বাঙালির মধ্যে জাগে আত্মসম্মানবোধ, তারা আরও সচেতন হয় এবং জাতীয় গৌরব প্রকাশে তৎপরতা দেখায়। ইংরেজি সাহিত্যের সান্নিধ্যে ক্রমেই বাঙালির মনে দেশপ্রেম জাগে। মাতৃভূমির মর্যাদা নিয়ে বাঙালির মনে আগ্রহ জাগে এবং পরিণামে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে তারা এগিয়ে আসে। ইংরেজি সাহিত্যের রূপগত বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজি শিক্ষাই বাঙালি মুসলমানকে

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার মুক্তির প্রেরণা দান করে এবং আধুনিক জীবনের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। বাঙালি মুসলমানের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানেরা যে শুধু ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়েছিল তা-ই নয়, তারা বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছিল। ফলে যে সব চাকুরিতে ইংরেজি দরকার ছিল না সেখানেও মুসলমানেরা নিজেদের স্থান করে নিতে পারে নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নবাব আব্দুল লতীফ বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলন মুসলমান সমাজের উঁচু স্তরে কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে এর কোন গভীর যোগ ছিল না। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য।

উনিশ শতকের শেষে মুসলমানদের উঁচু ও নিচু শ্রেণীর মধ্যে ভাষার এক বিরাট পার্থক্য চোখে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে যে 'আশরাফ সমাজ' সৃষ্টি হয়েছিল তারা উর্দুকেই তাদের মাতৃভাষা বলে মনে করতো। উনিশ শতকের শেষ দশকে নতুন যুগের নতুন জীবনবোধ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায় এবং এ সময় থেকেই তাদের মধ্যে সাহিত্যিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা তাদের ভাবনাকে সাধারণ মানুষের মনে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। নওয়াব আব্দুল লতীফ চেয়েছিলেন বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, তারা ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করুক। এভাবে শিক্ষাগত দিক থেকে এগিয়ে গেলেই বাঙালি মুসলমান সমাজ একটা শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারবে। সৈয়দ আমীর আলী বাঙালি মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন :

> কলকাতা মাদ্রাসার সংগে একটি বি.এ কলেজ খোলা প্রয়োজন, যেখানে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য আবশ্যিক হিসাবে পঠিত হবে। এভাবেই মুসলমান সমাজ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে।[১৪]

মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিষয়ক অভিমত সরকার প্রত্যাখ্যান করে। সৈয়দ আমীর আলীর শিক্ষা-বিষয়ক অভিমত আধুনিক চেতনার অনুসারী হলেও ইংরেজ শাসক তা গ্রহণ করে নি। সৈয়দ আমীর আলী বাঙালি মুসলমানের জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার জন্যে তাদের মধ্যে সচেনতা ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের জন্য ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৭) গড়ে ওঠে। এ সময় ঢাকাতেও 'সমাজ সম্মিলনী' (১৮৭৯) ও 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) নামে বাঙালি মুসলমান সমাজের দুটো সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

কলকাতাকে কেন্দ্র করে নওয়াব আব্দুল লতীফ ও সৈয়দ আমীর আলী যেভাবে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন, তেমনি ঢাকাকে কেন্দ্র করে 'সমাজ সম্মিলনী' পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান সমাজকে নবজাগরণের বাণী শোনাতে চেয়েছে। এ সংগঠন দুটির উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থার উন্নতিসাধন করা। পরবর্তীকালে রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা ও অসহযোগিতার জন্যে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে নি এবং শেষ পর্যন্ত সংগঠনটি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর টিকতে পারে নি।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের প্রায় দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানেরা ছিল রক্ষণশীল। কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু সমাজ এ সময়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে আরো গভীরভাবে ইংরেজি শেখার জন্য মনোনিবেশ করে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানেরা তখন আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে এবং রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যে ইংরেজি ভাষা শিখতে পারে নি। এমনকি তাদের বাংলা ভাষা চর্চাও ছিল খুব সংকীর্ণ। তাই দেশীয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার সাথে তাদের গভীর যোগাযোগ ছিল না। নানা রকম অসুবিধা ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালি মুসলমানেরা যেমন ইংরেজি ভাষা শিখতে পারেনি তেমনি ধর্মীয় আবেগ ও বিভ্রান্তির কবলে পড়ে তারা বাংলা ভাষাও শিখতে পারে নি।

ইংরেজ শাসনামলে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থার বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরে, জীবন হয়ে ওঠে শহরমুখী এবং দেখা দেয় নতুন শ্রেণীবিন্যাস। এই নতুন শ্রেণীই আবার সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব করে তোলে। কিন্তু মুসলমানেরা সেই সামাজিক অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। কারণ শহরকেন্দ্রিক জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণীই প্রধান্য পায়। তাই শহরমুখী জীবনে এরাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ ও সাহিত্য আন্দোলনে প্রধান্য লাভ করে। অন্যদিকে মুসলমান সমাজ ধর্মসংস্কার আন্দোলনে যোগ দিয়ে সমাজের পরিবর্তন করতে চাইলেও সেই সমাজ আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে গভীর যোগ ঘটাতে পারে নি। বরং তাদের ধর্মীয় আন্দোলন প্রাচীন জীবন যাত্রার দিকে নিয়ে গেছে। ওহাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মনে দেশপ্রেম জেগে উঠলেও সে আন্দোলন ছিল প্রধানত ধর্মীয় আন্দোলন। হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে এ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ লাভ করে। বিধর্মী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ আন্দোলন পরিচালিত হলেও অবশেষে তিতুমীরের নেতৃত্বে এ আন্দোলন সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। "তিতুমীরের বিদ্রোহের কাহিনী থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, তাঁর মূল অভিপ্রায় ছিল প্রচলিত ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন।"[১৫]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলিম মানসের চিন্তা-ভাবনা ছিল মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাই সমাজ বলতে তারা মনে করতো মুসলমান সমাজকে। মুসলমান সমাজ বুঝেছিল সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করতে হলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে না পারলে তাদের উন্নতি হবে না। এর বিস্তারও মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই মাতৃভাষা নিয়েও বাঙালি মুসলমানকে চিন্তা করতে হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও পরবর্তীকালে এর মীমাংসার উপর গুরুত্ব দেয়। তখন এক শ্রেণীর মুসলমান যারা নিজেদেরেকে অভিজাত বলে মনে করতো, তারা বাংলা ভাষাকে অবহেলা করতে শুরু করে। পরে বাংলা ভাষার সাথে গভীর পরিচয় হলে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে ওঠে এবং তাদের চিন্তাশক্তি প্রসার লাভ করে। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালি মুসলমানেরা বুঝেছিল বাংলা ভাষাই তাদের মাতৃভাষা। 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' (১৯২৬) যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁরা ভেবেছিলেন সাহিত্য চর্চার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা সমাজের কাছে তুলে ধরবেন। সমাজ বলতে তারা মনে করতেন বাঙালি মুসলমান সমাজকে। তাই তাঁদের চিন্তাভাবনা ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজ নিয়েই।

'মুসলিম সাহিত্যসমাজ'কে শুধু বাংলা ভাষা নিয়েই ভাবতে হয়েছে তাই নয়—শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েও তাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজই প্রথম বুঝতে পেরেছিল যে, বাঙালি মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত করতে না পারলে শিল্প-সাহিত্য তাদের কাছে কোন অর্থ বহন করবে না।

নবাব আব্দুল লতীফ তাঁর 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'র মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষাগত দিক থেকে মুসলমান সমাজকে একটা শক্ত পটভূমির উপর দাঁড় করাতে। এই সোসাইটি বাংলা ভাষার চর্চা না করলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও চেতনার সঞ্চার করেছিলো। নবাব আব্দুল লতীফের মতো সৈয়দ আমীর আলীও বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চেতনার অভাব লক্ষ করে তিনি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ মনোভাবের জন্যে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ থেকে মুসলমানেরা বঞ্চিত হয়েছে। তবে বাঙালি মুসলমান সমাজের একটা অংশ যে রক্ষণশীল ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এরা ইংরেজি শিক্ষাকে মেনে নিতে পারে নি। আর এ না পারার প্রধান কারণ ধর্মীয় কুসংস্কার।

অবশ্য বিশ শতকের প্রথম দশকের একটি ঘটনা বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। এ ঘটনাটি হলো বঙ্গভঙ্গের ঘটনা। "১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা। কারণ বঙ্গ-ভঙ্গের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতির ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে যায়।"[১৬]

বিশ শতকের প্রথম দিকে কোন কোন মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেয়েছেন ইসলামের ইতিহাস, আদর্শ, ঐতিহ্য ও ধর্মনীতি থেকে। মুসলমান হিসাবে তাঁরা ভেবেছিলেন তাদের অস্তিত্বের কথা। তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের কথা। তাই তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই সচেনতার জন্য কেউ কেউ স্বাতন্ত্র্যের পথে পা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও হিন্দু -মুসলমানের মধ্যে মিলনের উপায় খুঁজেছেন।

> ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবরে সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সংগে উচ্চবিত্ত ভারতীয় মুসলমানের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। মহামান্য আগা খাঁ ছিলেন দলের নেতা। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের উপরে এঁরা খুব জোর দেন। ঐ বছরই ডিসেম্বরে এদের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় একটি শিক্ষা সম্মেলন। সম্মেলনের শেষেই জন্ম হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগে'র। এই সম্মেলনে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যবস্থা সমর্থিত হয় এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[১৭]

এ দেশে ইংরেজদের আগমনে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে তার প্রভাব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যে পিছিয়ে থাকার কারণ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করা। হিন্দুরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইংরেজ শাসকদের সাথে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছে। এ জন্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁরা মর্যাদার সাথে স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্যের যে বিচিত্র বিকাশ তা প্রধানত হিন্দু সাহিত্যিকদের জন্যেই হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের অতীতমুখী মন ওহাবী আন্দোলনের (১৮১৮) মানসিকতার জন্য 'দোভাষী' পুথির মধ্যেই সাহিত্যের স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করেছে।

পরবর্তীকালে ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের অসহযোগিতামূলক মনোভাব দূর হয় ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর। এটা সম্ভব হয়েছিলো স্যার সৈয়দ আহমদের আপোসমূলক প্রচেষ্টার ফলে। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা না করলে মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকবে। হিন্দুরা ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর মুসলমানেরা তা না করে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। তাই তিনি ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য মুসলমান সমাজে প্রচারণা চালিয়েছেন। তাঁর এ প্রচারণার ফলে মুসলমানেরা তাদের ভুল বুঝতে পারে। তারা ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অভিমান ছেড়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে।

তখনকার অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবী ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যেই 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি ' গঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। এবং তাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ে চিহ্নিত করা। এসব চেষ্টার ফলে দেখা যায় মুসলমানেরা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করে নিজেস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠে এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম সাহিত্যিকেরা যে ধারার প্রবর্তন করেন তা স্বাতন্ত্র্যধর্মী বলে পরিচিত। *সুধাকর* (১৮৮৯) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যাঁরা সাহিত্য সাধনা করেছিলেন তাঁরা আবার 'সুধাকর দল' নামেও পরিচিত। তাদের রচিত সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্যে বলেও অভিহিত করা যায়। তাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি থাকলেও তাঁরা কখনো সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। উনিশ শতকের শেষে হিন্দুদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের যে প্রেরণা এসেছিল তা মুসলমানের মধ্যেও দেখা যায়। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্যে যাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে মুনসী মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭) ও মুনসী জমিরুদ্দিন (১৮৭০-১৯৩০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্যে তাঁরা গ্রামে গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁদের পথ অনুসরণ করে যাঁরা সাহিত্যর মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন তারা 'সুধাকর দল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুধাকর দলের যাঁরা লেখক ছিলেন তাঁদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী মেয়ারাজ উদ্দিন আহমদ, পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) ও মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন (১৮৬২-১৯৩৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রচেষ্টায় *ইসলাম তত্ত্ব* (১৮৮৭) প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁরা ইসলামের আদর্শ ও মর্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) সমন্বয়ধর্মী ধারার প্রবর্তন করলেও তাঁর রচনার মধ্যে ইসলামী ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেন নি। উনিশ শতকের শেষ দিকে মুসলমান সাহিত্যিকেরা ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে সাধনা করলেও মীর মশাররফ হোসেন শুধু ধর্মের বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাহিত্য শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁর *বিষাদ- সিন্ধুতে* (১৮৮৫-৯০) ধর্মীয় চেতনার পরিচয় থাকলেও এর কাহিনী জীবন চেতনায় প্রাণবন্ত। এর কোন কোন চরিত্র ইতিহাসের কাহিনী ও পুঁথির পাতায় আবদ্ধ না থেকে আমাদের সমাজের রক্ত মাংসের মানুষের মাঝে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর এজিদ-জয়নব পুঁথির জগত থেকে বেরিয়ে এসে গভীর জীবনধর্মে জড়িয়ে মানব জীবনের ট্রাজেডিকে স্বীকার করে নিয়েছে।

স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকদের উদ্দেশ্যে ছিল মুসলমান জাতির অধঃপতন রোধ করা। তাঁরা বুঝতে পারেন মুসলমান জাতির উন্নতি করতে হলে মুসলমানদের অতীত ইতিহাস ও ধর্মীয় চেতানার প্রচার করা প্রয়োজন। তাই *মিহির* (১৮৯২), *মিহির ও সুধাকর* (১৮৯৫), *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯৯-১৯১০), *সুলতান* (১৯০৩-১৯০৮), *নবনূর* (১৯০৩-১৯০৭), *মোহাম্মদী* (১৯০৩-০৪), *বাসনা* (১৯০৮-০৯), *আল এসলাম* (১৯১৫-২০) প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমেই মুসলমান জাতির মানসগঠন সম্ভব হয়েছিল। সে কালের স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকের সাহিত্য সাধনাও ছিল প্রচারধর্মী। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জাতির কল্যাণ সাধন করা। তাই তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের অতীত গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরে সাহিত্য সাধনা করেছেন। এসব স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৪-১৯৬৪), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), মুনসী জমিরুদ্দিন (১৮৭০-১৯৩৭), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৫৯-১৯১৯) প্রমুখ। এঁদের আগে কোন কোন মুসলিম সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনা করলেও তা মুসলমানদের জাতীয় জীবনে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। মুসলমান জাতির নিজস্ব আদর্শ তুলে ধরতে এবং মুসলিম সাহিত্যের বিকাশে এদের অবদান অপরিসীম। জমিরুদ্দিনও মেহেরুল্লাহর মতই প্রচারক জীবনে যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর নিজের বিবৃতি থেকেই জানা যায় যে, তিনি তের হাজারের ও অধিক খ্রিস্টানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৮] এঁরা ছিলেন মূলত সমাজ সংস্কারক ও প্রচারক। তাঁরা ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমান সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের ইতিহাস, আদর্শ, ঐতিহ্য ও ধর্মনীতি যাঁরা রচনার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে সাহিত্য সাধনা করেন তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) ও মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি করা। এঁরা

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন রাজনীতি সচেতন ও স্বাতন্ত্র্যবাদী। ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আদর্শকে এঁরা রচনার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে এঁদের মধ্যে মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন প্রাচীনপন্থিদের তুলনায় প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী। বাঙালি জাতিকে এঁরা ইতিহাস সচেতন করে তুলেছিলেন। মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্যে তাঁরা কখনো বক্তার ভূমিকা, কখনো লেখকের ভূমিকা, আবার কখনো বা সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। এঁরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। এঁরা সবাই ছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী ও যুক্তিবাদী। এঁদের মধ্যে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ব্যাংকের সুদ প্রদানকে ধর্ম বিরুদ্ধ নয় বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। "তিনি সারা জীবন কেঁদেছেন পাগলের মত কি হবে আমাদের ভবিষ্যত? মুসলমানেরা লেখাপড়া শিখছেন না, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন না, খবরের কাগজ পড়েছেন না, আসছেন না রাজনীতি চর্চায়।"[১৯] ইসসাইল হোসেন সিরাজী স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক হয়েও ছিলেন প্রতিবাদী। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ *অনলপ্রবাহ* (১৯০০)-এ প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজের জাগরণের জন্যেই তিনি সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। তিনি সচেষ্ট ছিলেন মুসলমান সমাজের মাঝে নব জাগরণ আনতে। জ্ঞানে ও কর্মে মুসলমান জাতি উন্নতি লাভ করুক এটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করে মুসলমান জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠলে জাতীয় জীবনের উন্নতি হবে বলে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। "স্বাধীনতা অর্জনের তীব্র আকাঙ্খায় উদ্দীপ্ত হয়ে প্রথম জীবনে তিনি অগ্রসর হিন্দু শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে দ্বিধা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় পরাধীনতার শৃংখল ছিন্ন হোক।"[২০]

মোহাম্মাদ এয়াকুব আলী চৌধুরীও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে সাহিত্যর উপাদান সংগ্রহ করলেও তাঁর রচিত সাহিত্যে কোন সংকীর্ণতার পরিচয় নেই। "তিনি তাঁর সাহিত্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। মানব সমাজের কল্যাণ কামনা ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্মীয় বিষয় যে কত হৃদয়গ্রাহী হয় মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনাই তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এ উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্যে।"[২১] মাতৃভাষার প্রশ্নে তিনি বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তার মতে, মুসলমানদের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। *মানব মুকুট* (১৯২২) গ্রন্থে তিনি হযরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্য তুলে ধরলেও তা আলেমদের মতো ধর্মীয় আবেগে জড়িত নয়। তার পদ্ধতি ভিন্ন রকমের। "আনা বাশারুম মোযলেকুম' আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। হযরত মোহাম্মদের এই বাণীই তাঁর সমগ্র চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্র।"[২২] *মানব মুকুট* গ্রন্থে তিনি হযরতকে মানব জাতির সেবক ও পথ প্রদর্শক রূপে দেখেছেন। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষাকে তিনিই মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বিশেষ করে মুসলমান সমাজ ইসলামের প্রকৃত আদর্শ তাদের জীবনে প্রতিফলিত করুক এটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। *মানব মুকুট* গ্রন্থে তিনি হযরত মোহাম্মদের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন গভীর মানব প্রেম। *শান্তিধারায়* (১৩২৯) তিনি সুন্দর জীবন গঠনের কথা বলেছেন। সুন্দর জীবন গঠন করতে হলে ইসলামের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। "ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তাঁর বিষয়বস্তু হলেও সংকীর্ণ ঐতিহ্য গর্বের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন নি। বরঞ্চ সুষ্ঠু মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনায় তাঁর মৌলিক চিন্তা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।"[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি গভীর আকুতি। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকুলতা থাকলেও তাঁর রচনার মূলে ছিল প্রেম ও কল্যাণের প্রেরণা। মহৎ জীবনের বাণী প্রচারই ছিল তাঁর আজীবন সাধনা।

সেকালে *সুধাকর* পত্রিকার প্রধান কাজ ছিল ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করা। এ পত্রিকাই মুসলমান সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন করেছিল। সেকালে সুধাকর দলের লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের অধঃপতন রোধ করা। সুধাকর পত্রিকার লেখকরা বুঝেছিলেন মুসলমানদের জাতীয় জীবনে উন্নতির প্রেরণা জাগাতে হলে মুসলমানদের অতীত ইতিহাস ও ধর্মীয় চেতনার প্রচার করতে হবে। তাঁদের ধারণা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই জাতির মানস গঠন সম্ভব। এক কথায়, সেকালে সুধাকর পত্রিকার সাহিত্য প্রচেষ্টা ছিল প্রচারধর্মী। মুসলমান জাতির কল্যাণই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতির ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'সুধাকরদল'ই মুসলমানদের জাতীয় জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলমান জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বাঙালি মুসলমানের জাগরণে *শিখা* (১৩৩৩) পত্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । 'শিখাগোষ্ঠী'র লেখকগণের মধ্যেই আধুনিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিখা পত্রিকার লেখকেরা স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছিলেন। তাঁরাই মুসলমান সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন সমকালীন মুসলমান সমাজের অন্ধবিশ্বাসের মূলে আঘাত করার উদ্দেশ্যে *শিখার* লেখকেরা পীর পূজার কঠোর সমালোচনা করে মোল্লাদের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করে সমাজকে সচেতন করে তুলেন।

শিখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের পরিবর্তন সাধন। মুসলমান সমাজের জীবন ও তাদের চিন্তার পরিবর্তনই ছিল *শিখার* লক্ষ্য। *শিখার* লেখকগোষ্ঠী মুসলমান সমাজের কুসংস্কার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করেছিলেন। *শিখাই* মুসলমান সমাজের মধ্যে নবজাগরণ এনেছিলো। এর লেখকেরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। *শিখার* লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাজী আনোয়ারুল কাদীর (১৮৮৭-১৯৪৮), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) আব্দুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) প্রমুখ।

বাঙালি মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সন্ধান এবং যে সমস্যার সমাধানের প্রয়াস রয়েছে *শিখা* পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধে।

> সব সময় মনে রাখতে হবে লোকহিতই ধর্মের উদ্দেশ্যে। ধর্মকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় অকল্যাণ হচ্ছে, তবে বুঝতে হবে কোথাও কোন একটা গোলমাল হয়ে আছে। হয় ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি হয় নাই, নয়ত ধর্মের সে অংশের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বর্তমান অবস্থায় তা অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার মুসলমান সমাজ নিজেদের আত্ম পরিচয় 'বাঙালি' না 'মুসলমান' বলে প্রকাশ করবে সে সম্পর্কে ছিল দ্বিধাগ্রস্ত।

> মানুষের চরম বিকাশের প্রথম পথ হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি যাতে জগতের প্রয়োজন অনুসারে যুগধর্মের ইংগিত অনুসারে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে সহজ হয়। অতীতের কোন যুগ বিশেষের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যারা বর্তমানকে অস্বীকার করে তাদের মুক্ত বুদ্ধি নয়।[২৫]

শিখার লেখকগোষ্ঠী পর্দার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলা ভাষা। মুসলমান সমাজের উন্নতির কথা এঁরা চিন্তা করেছেন। মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার অভাব সম্পর্কে শিখার লেখকেরা ছিলেন সচেতন। পর্দা প্রথার খারাপ দিক সম্পর্কে তাঁরা সমাজকে সচেতন করে দেন।

> বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্ম শিক্ষা হতে পারে না। ধর্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধির অভাবে আজকাল আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়ামিই আমাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২৬]

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম মানসের চিন্তা-ভাবনা ছিল মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাই তাদের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে স্ব সমাজের উন্নতির উদ্দেশ্যে এবং এ-ক্ষেত্রে অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন। মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে না পারলে তাদের কোন উন্নতি হবে না এটা মুসলিম সমাজের অগ্রবর্তীগণ জানতেন। আর এ শিক্ষাও জ্ঞান বিস্তার ও প্রসার সম্ভব মাতৃভাষার মাধ্যমেই। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও পরবর্তীকালে তারা এর উপর গুরুত্ব দেয়। বাংলা ভাষার সাথে তাদের গভীর পরিচয় হলে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠে এবং তাদের চিন্তা শক্তি প্রসার লাভ করে। 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' যাঁরা গঠন করেন তাঁরা ভেবেছিলেন সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা সমাজের কাছে তুলে ধরবেন। 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ'ই সর্ব প্রথম বুঝতে পারেন যে, বাঙালি মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত করতে না পারলে শিল্পসাহিত্য তাদের কাছে কোন অর্থ বহন করবে না। জীবনকে জাগিয়ে তোলাই ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রধান লক্ষ্য। সমাজের অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মকে গোঁড়ামি থেকে, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম মানসের চিন্তাধারার বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা তখন সমাজ, জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সাহিত্য-শিল্প নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করেছেন। মুসলমান জাতির জাগরণে তাদের এ চিন্তা-চেতনা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাঁরা অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন যে সব চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাকে কয়েকটি উপ-শিরোনামায় বিবেচনা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজচিন্তা

সমাজ চলমান এবং চলমান সমাজ কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে নানা পরিবর্তন হয়। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের রীতি-নীতি ও চিন্তাধারারও পরিবর্তন হয়। এ পরিবর্তন কখনো ক্ষণস্থায়ী, আবার কখনো বা দীর্ঘস্থায়ী। সমাজের এ পরিবর্তন মানুষের জীবনযাত্রারই পরিবর্তনসূচক।

মানুষ সামাজিক জীব; এবং সে শুধু খেয়ে পড়েই বাঁচতে চায় না। সে চায় মানুষের মঙ্গল, চায়, সমাজের মঙ্গল। সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্যেই তার জন্ম। তাই সমাজ ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সমাজ না থাকলে মানুষের জীবন পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতো না। সামাজিক মানুষের জীবন প্রণালী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে নানা চিন্তার সমাবেশ। সমাজ, জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সাহিত্য-চিন্তা তার মনকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। বিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালি মুসলমান লেখকেরা স্ব-সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন, এর মধ্যে সমাজ চিন্তাই প্রধান। বাঙালি মুসলমারে মধ্যে যে সব ভাব-আন্দোলন দেখা দেয় তা ছিল ধর্ম জীবনের আদর্শ-মুখ্য। মুসলমান সমাজকে শিক্ষা ক্ষেত্রে সচেতন করার জন্যে নাবাব আব্দুল লতীফ আন্দোলন করেন। সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন তাঁর অনুসারী। তাঁরা উভয়েই মনোযোগ দিয়েছেন মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ এবং রাজনীতি মনস্কতার উপর। সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭) এর পর ইংরেজ শাসকমহল মনে করেছিল যে, মোঘল শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানেরা এ বিদ্রোহ ঘটিয়েছে, কিন্তু সৈয়দ আহমদ এর প্রতিবাদ করেন। পরবর্তীকালে নবাব আব্দুল লতীফ মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্যে 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন করে শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে সারা ভারতে মুসলমানদের মধ্যে নব জীবনের সুচনা করেছেন। বিচারপতি আমীর আলীর চেষ্টায় 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৮) নামে বাংলাদেশ আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সংগঠন মুসলমানদের জন্যে কলকাতায় একটি ইংরেজি কলেজ খোলার অনুরোধ জানায়। নবাব আব্দুল লতীফ তাঁর মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'র মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলেন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষাগত দিক থেকে মুসলমান সমাজকে এটা শক্ত পটভূমির উপর দাঁড় করাতে। 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' বাংলা ভাষার চর্চা না করলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও চেতনা সঞ্চার করে। আব্দুল লতীফের মত সৈয়দ আমীর আলীও বাঙালি মুসলমান সামজের জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

"বাঙ্গালি মুসলমান সামাজে যখন 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩) ও 'ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'কে (১৮৭৮) কেন্দ্র করে স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটছে ঠিক সে সময়েই বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব।"[২৭] মীর মশাররফ হোসেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্যায়ে হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করলেও পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে । তখন ধর্ম জীবনের মাহাত্ম্য বর্ণনাই ছিল তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। তিনি সমাজের অন্যায় অবিচার দেখে শংকিত হয়েছেন এবং প্রতিবাদের প্রেরণা অনুভব করেছেন। *জমিদার*

Dhaka University Institutional Repository

দর্পণ (১৮৭৩) নাটকে তাঁর এ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন একতা থাকলে জাতিতে জাতিতে হিংসা থাকে না, দেশের মঙ্গলের জন্যে সবাই এক সাথে কাজ করতে পারে, দেশকে সত্যিকার ভালবাসতে পারে। *গো-জীবন* (১৮৮৯) গ্রন্থে তিনি বলেছেন :

> এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু মোসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ট যে, ধর্ম ভিন্ন, কিন্তু ধর্মে ও কর্মে এক।.... এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যাহাদের সংগে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি ?[২৮]

মীর মশাররফ হোসেনের সমসাময়িক কায়কোবাদ ((১৮৫৭-১৯৫১) ও মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) চেয়েছেন মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরতে। "উভয়ের রচনায় মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা প্রাধান্য লাভ করলেও লক্ষণীয় যে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের প্রশ্নে তাঁরা ছিলেন বিদ্বেষমুক্ত।"[২৯]

ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য নিয়ে মোজাম্মেল হক সাহিত্য সাধনা করেন। কিন্তু তিনি সুধাকর দলের (১৮৮৯) মত আদর্শ প্রচার করতে পারেন নি। তিনি মুসলিম কৃষ্টি নিয়ে আদর্শ জীবনের কল্পনা করেছেন। মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের জন্যে তিনি অবরোধ ও পণপ্রথার বিরোধিতা করেছেন। বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) আরো বলিষ্ঠ কণ্ঠে সামাজিক কুসংস্কার ও সমাজ প্রচলিত পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি চেয়েছেন সমাজে নারীর স্বাধীনতা। নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতা কামনাই ছিল তাঁর রচনার প্রধান বিষয়বস্তু। ভারতীয় নারীর শিক্ষার জন্যে, সমাজে মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণার পরিচয় দিয়েছেন। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মুসলমান সমাজের জাগরণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছেন। তিনিও বেগম রোকেয়ার মত নারী মুক্তি ও নারী স্বাধীনতা কামনা করেছেন। কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) মুসলমান সমাজে অন্ধ পীর ভক্তি ও পর্দা প্রথার বিরোধিতা করেছেন। এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৪০) চেয়েছিলেন ইমলামের সত্যিকার আদর্শ মুসলমান সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দিতে। *শান্তিধারা* (১৯২৩) গ্রন্থে তিনি এসলামের আদর্শ তুলে ধরেছেন "এখানেও দেখি সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন গঠনের প্রেরণা রূপে তিনি দেখেছেন ইসলামকে। তার বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে গভীরতর অর্থ খুঁজে পেয়েছেন।"[৩০] মুসলমান সমাজ ইসলামের আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করুক এটাই ছিল তার স্বপ্ন। মোজাম্মেল হক, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭), মুনসী মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন (১৮৭০-১৯৩০) প্রমুখ লেখকেরাও ইসলামের আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত করার আহবান জানিয়েছেন।

বেগম রোকেয়া নারী সমাজকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসার জন্যে উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। শিক্ষা বলতে তিনি জাতি বিশেষের অন্ধ অনুকরণকে মনে করেন নি। *মতিচূর* (১৩৩৯) গ্রন্থের 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> যাহা হউক শিক্ষার অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতি বিশেষের অন্ধ অনুকরণ নহে, ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা (faculty) দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি (develop) করাই

Dhaka University Institutional Repository

> শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অল্পব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মন এবং চিন্তা শক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্তদ্বারা সৎকার্য করি, চক্ষু দ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন (বা observe) করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগপূর্বক শ্রবণ করি, এবং চিন্তা শক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।[৩১]

সামাজিক কুসংস্কার ও গতানুগতিক সমাজ-প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে বেগম রোকেয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজে নারীর স্বাধীনতা। নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি-কামনা তাঁর রচনার প্রধান বিষয়বস্তু। মুসলমান সমাজে আবরোধের নামে নারীত্ব ও মনুষ্যত্ব অবমাননার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন:

> ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন, অগ্রসর হউন। বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে আমরা জড়োয়ো অলংকার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ। আর কার্যতঃ দেখাও যে, আমরা সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক। বাস্তবিক পক্ষে আমরা সৃষ্টি জগতের মাতা, তোমরা নিজের দাবী দাওয়া রক্ষা করিবার জন্য নিজেরাই বিবিধ সমিতি গঠন কর।[৩২]

এখানে তিনি মুসলমান নারী জাতিকে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন। মুসলমান নারী সমাজকে তিনি জ্ঞানের পথে, মুক্তির পথে, প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে আসার জন্যে আকুল আহবান জানিয়েছেন। মুসলমান নারী সমাজে নব জীবনের অভ্যুদয় হলে নারী সমাজ স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে এটাই তিনি একান্তভাবে কামনা করেছিলেন।

বেগম রোকেয়ার সমাজ চিন্তা ছিল মুসলিম নারী সমাজের কল্যান কামনায় নিবেদিত। তাঁর *মতিচূর* ও *অবরোধ বাসিনী* (১৯৩১)-তে নারী সমাজের অবনতির কারণগুলো তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

> বেগম রোকেয়া রচিত সাহিত্যরাজি পাঠে তাঁর সমাজ চিন্তা সম্পর্কে আমাদের মনে সুস্পষ্ট ধারণার সৃষ্টি হয়। তাঁর সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য চর্চা একই স্রোতস্বতীর বেগবতী দুটি ধারা। পরাধীন বাংলায় মুসলমান জাতির সামগ্রিক কল্যাণের স্বার্থে নারী সামজের দুর্গতি মোচনের প্রতি তাঁর সজাগ দৃষ্টি।[৩৩]

তাঁর সমাজ চিন্তা ছিল উন্নয়নমুলক তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক উন্নয়নে নারী পুরুষের সমান অংশ গ্রহণেই সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব।

> বেগম রোকেয়ার সমাজ চিন্তা অনুসরণ করলে দেখা যায়, তিনি গভীরভাবে এই সত্যে বিশ্বাস করতেন যে, নারী ও পুরুষ সমাজ দেহের দুটি চক্ষু স্বরূপ। মানুষের দুটি চোখ। মানুষের সর্বাধিক কাজ কর্মের প্রয়োজনে দুটি চোখেরই গুরুত্ব সমান। তেমনি সমাজ দেহেরও দুটি চোখ নারী ও পুরুষ। একটি চোখ নষ্ট হলে যেমন মানুষের কাজ কর্মে নানা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। তেমনি সমাজ দেহের

Dhaka University Institutional Repository

> একটি চোখ নষ্ট হলে সমাজেরও উন্নতিমূলক কাজে নানা বিঘ্ন হয়। সমাজের এক অংশের জাগরণ ছাড়া অপরাংশের জাগরণ মোটেই সম্ভবপর নয়। বিভিন্ন দেশের সমাজ প্রগতির কারণসমূহ পর্যালোচনা করে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারী ও পুরুষের সমান ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমেই সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন সম্ভব।[৩৪]

তিনি চেয়েছিলেন মুসলিম নারী সমাজ জেগে উঠুক, তারা স্বাবলম্বী হোক। জ্ঞানে ও কর্মে তারা পুরুষের মত যোগ্যতা অর্জন করুক। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তারা পুরুষের মত অবদান রাখুক। 'স্ত্রী জাতির অবনতি' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "আমরা সমাজেরই অর্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে? কোন ব্যক্তির এক পা বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ আর ভিন্ন নহে – একই।"[৩৫]

তাঁর বিশ্বাস নারীরা পুতুলের মত জীবন বহন করার জন্যে সৃষ্টি হয় নি। সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তারা পুরুষের মত সমান অবদান রাখতে সক্ষম। মুসলিম নারী সমাজের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তারই ছিল তার সারা জীবনের স্বপ্ন। মুসলমান নারী সমাজকে অশিক্ষা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের পথ থেকে উদ্ধার করতে তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। সমাজের বিভিন্ন কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষা ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি বিদেশের শিক্ষা আন্দোলন ও সামাজিক সংস্কারকে সমর্থন জানিয়েছেন। পর্দা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব প্রকাশ করে 'বোরকা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> পর্দা অর্থে আমরা বুঝি গোপন হওয়া বা শরীর ঢাকা ইত্যাদি কেবল অন্তঃপুরে চারি প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে। এবং ভাল মত শরীর আবৃত না করাকেই বেপর্দা বলি। যাহারা ঘরের ভিতর চাকরদের সম্মুখে অর্ধনগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা ভালমত পোষাক পড়িয়া মাঠে বাজারে বাহির হন তাহাদের পর্দা বেশী রক্ষা পায়।[৩৬]

তাঁর সমাজচিন্তা নারীর মুক্তি ও নারী স্বাধীনতা এবং নারী জাগরণকেন্দ্রিক। নারী জাতির জাগরণে প্রয়োজন শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষা বলতে তিনি মানসিক ও শারীরিক উভয় শিক্ষাকেই বুঝিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সামাজিক অবিচার, অনাচার ও কুসংস্কার দূর করতে শিক্ষার প্রয়োজনই সবচেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে 'সুবেহ সাদেক' প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> শিক্ষা বিস্তারই এই সব অত্যাচার নিবারণের একমাত্র মহৌষধ। অন্ততঃপক্ষে বালিকাদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেই হইবে। শিক্ষা অর্থে আমি প্রকৃত সুশিক্ষার কথাই বলি, গোটা কতক পুস্তক পাঠ করিতে বা দু'ছত্র কবিতা লিখিতে পারা শিক্ষা নয়। আমি চাই সেই শিক্ষা যাহা তাহাদিগকে নাগরিক অধিকার লাভে সক্ষম করিবে, তাহাগিকে আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগিনী, আদর্শ গৃহিনী এবং আদর্শমাতারূপে গঠিত করিবে। শিক্ষা মানসিক এবং শারীরিক উভয়বিধ হওয়া চাই।[৩৭]

মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত করতে না পারলে শিল্প সাহিত্য তাদের কাছে কোন অর্থ বহন করবে না। তাই মুসলিম সাহিত্য সমাজের (১৯২৬) লেখক আবুল হুসেন শিক্ষার প্রকৃত

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

> মানুষের জীবন বিবিধ উপকরণ দ্বারা পুষ্ট হয়। সেই সকল উপকরণ সংগ্রহ করবার শক্তি অর্জন এবং মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্ত-পদাদি অঙ্গ-প্রতঙ্গের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক তাতে মানুষ আপনার শক্তি পরখ করে জগতের রহস্য অবগত হয়, সমাজের সংগে পরিচিত হয় এবং বিশ্বস্রষ্টার অপরূপ শক্তিতে আস্থাবান হয়ে তারি দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়।... এইরূপে মানুষের অন্তত সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে যে শিক্ষা দ্বারা, সে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক উন্নতি ও ঐশীগুণ সাধন।[৩৮]

তিনি বাঙালি মুসলমানের সার্বিক কল্যাণ কামনা করেছেন। তিনি মুসলমান সমাজে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিগুলো তুলে ধরেছেন। মুসলমান সমাজের বিপর্যয় তাঁর চেতনাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাই তিনি তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে এর কারণ ও প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করেছেন:

> মুসলমান সমাজ এত কঠোর বিধি নিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যে, এর মধ্যে চিত্তের বিবিধ ক্ষুধা নিবারণ করবার মত বেশী উপকরণ নাই। সে জন্য মুসলমান সমাজের চিত্ত আজ অন্য সমাজের রীতি-নীতি ও আচার ব্যবহার অবলম্বন করতে বাধ্য হচ্ছে। সহস্র বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও ধর্মবিধি পীড়িত মুসলমানদের শুষ্ক নীরস চিত্ত প্রতিবেশীর আনন্দের পানে উন্মুক্ত হয়ে উঠেছে – সেটা চিত্তের স্বভাব ধর্ম। যে আনন্দ ও রুচির বৈচিত্র্য স্ফুর্তি লাভ করে, নিষেধ তাকে বিড়ম্বনা করে মাত্র। মুসলমানের গৃহ নিরানন্দ – বিশেষত মুসলমানের নারী সমাজ নিতান্ত হতশ্রী, তার কারণ শিক্ষা ও পর্দায় কঠোর সংস্কার – যাতে করে মুসলমান নারী আনন্দ কি তার আস্বাদ পেতে পারে না।[৩৯]

তিনি মুসলিম নারী সমাজে পর্দা প্রথার কঠোর সমালোচনা করেছেন। এই পর্দা প্রথার জন্যেই মুসলিম নারী সমাজে কোন আনন্দ নেই। নারী সমাজের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হলে তারা জীবনের স্বাদ অনুভব করতে পারতো।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী চেয়েছিলেন দুর্দশাগ্রস্ত ও অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি। তিনি মুসলমান জাতিকে ইতিহাস সচেতন করে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। মওলানা আকরম খাঁও মুসলমান সমাজের উন্নতি কামনা করেছেন। ধর্মের গোঁড়ামি তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি ধর্মের গভীরে প্রবেশ করে ধর্মকে যুক্তিনির্ভর করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামানের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য: "তাই আকরম খাঁকে প্রাচীন পন্থীদের তুলনায় প্রগতিশীল এবং আধুনিকদের তুলনায় রক্ষণশীল বলা যায়।"[৪০]

ইসমাইল হোসেন সিরাজীও মুসলমান সমাজকে জাগাতে চেয়েছেন। সমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন। তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক ও প্রচারক। সমকালে তিনি স্বাধীনতার অক্লান্ত সৈনিক ও মুসলিম পুর্নজাগরণের কবি বলে অভিহিত হয়েছেন। মানব সমাজ, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের কল্যাণই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য। বেগম রোকেয়া

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও তিনি প্রধানত নারী স্বাধীনতা কামনা করেছেন। নারী সমাজকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্যে ডাঃ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন। কাজী ইমদাদুল হক রোকেয়ার মতো সমাজ সংস্কারক না হলেও তিনি ছিলেন প্রগতিশীল মানসিকতার অধিকারী।

মোহাম্মদ আকরম খাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি করা। মুসলমান সমাজের অবনতির কথা চিন্তা করে তিনি সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি তাঁর রচনার মাধ্যমে ইসলামিক চেতনা কখনো উগ্র জাত্যাভিমানে পরিণত করেন নি। তিনি ছিলেন যুক্তি নির্ভর। *মোস্তফা চরিত* (১৯২১) গ্রন্থে তিনি বলেছেন :

> স্বাধীনভাবে হয়রত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী রচনা করিতে হইলে আমাদিগকে সর্ব প্রথমে কোরআন শরীফের এবং সেই সংগে হাদীছ শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে।... তাহার মধ্যে নির্মম ও যুক্তি হিসাবে যাহা প্রমাণিত ও বিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপালিত হইবে তাহা সানন্দে গ্রহণ করিব। আর যাহা অপ্রমাণিক ভিত্তিহীন প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, সেটিকে আমরা ফেলিয়া দিব।[৪১]

কাজী ইমদাদুল হক মুসলমান সমাজের শিক্ষা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন। তিনি মুসলমান সমাজে বহু বিবাহের বিরোধিতা করেছেন। তিনি প্রগতিশীল মানসিকতার অধিকারী হলেও বেগম রোকেয়ার মত সমজ সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেন নি। *আবদুল্লাহ* (১৯৩৩) উপন্যাসে কাজী ইমদাদুল হকের প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে খোন্দকার সিরাজুল হকের মন্তব্য স্মরণীয় :

> *আব্দুল্লাহ* উপন্যাসে অন্ধ পীরভক্তি, আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দা প্রথা, সুদ গ্রহণ, মহাজন-ঘাতকের সম্বন্ধ, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের অবনতি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখকের যে বক্তব্য ও কটাক্ষ আছে তা থেকেই সমাজ সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল চেতনার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠে।[৪২]

সেকালে এক শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে অন্ধ পীরভক্তি ও পণ প্রথা প্রাধান্য লাভ করে। কাজী ইমদাদুল হক সমাজের এই রক্ষণশীল রীতি-নীতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেন। *আব্দুল্লাহ* উপন্যাসে পীর প্রথা সম্পর্কে তাঁর উক্তি :

> এই পীর মুরীদ ব্যবসাটা হিন্দুদের পুরুত গিরির দেখাদেখিই শেখা, নইলে হযরত নিজেই মানা করে গেছেন, কেউ যেন ধর্ম সম্বন্ধে হেদায়েত করে পয়সা না নেয়।[৪৩]

সেকালের সামাজিক সমস্যার মধ্যে আশরাফ-আতরাফ সমস্যাও প্রকট আকার ধারণ করে। এ সমস্যা মুসলমানদের মাঝে কী মূর্তি ধারণ করে তাও লেখক উদঘাটন করেছেন এ-উপন্যাসে। এখানে তিনি বলেছেন :

> মৌলভী সাহেব আবদুল্লাহর আরো কাছে আসিয়া ফিস ফিস করিয়া কহিতে লাগিলেন, খতাডা কি, বোজলেন নি দুলহা মিয়া? অরা হইলো গিয়া আতরাফগোর ফোলাপান, অরা এই সব মিয়াগেরের

Dhaka University Institutional Repository

হের হমান হমান চলতাম ফারে অরগো জিয়াদা, সবক দেওয়া মানা আছে, বোজলেন নি? কার মানা?

খোদ সাবের। তিনি আইসা দহলিজে বইস্যা হুনেন। সারের সি সবক দিনা দি। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, তা ওদের পড়তে আসতে দেন কেন? একবারেই যদি ওদের না পড়ান হয় সেই ভাল নয় কি? এই কথায় মৌলভী সাহেবের হৃদয় করুণায় উথলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, অহঃ হেডা কাম ভাল হয় না দুলহা মিয়া। গরীব তালবেলম, হিকবার চায়, এক্কেকালে নৈরাশ করলে খোদার কাছে কি জবাব দিমু? গরীবেরে এলেম দেওনে বহুত সওয়াব আছে, কেতাবে ল্যাহে।[৪৪]

বেগম রোকেয়ার মত লুৎফর রহমানও নারী সমাজকে শিক্ষিত করতে চেয়েছেন। নারীরা সমাজে মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত হোক, নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাক এটাই ছিল তাঁর ঐকান্তিক কামনা। "লুৎফর রহমান নারী সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'নারীতীর্থ' নামে একটি নারী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক এবং রোকেয়া ছিলেন সভানেত্রী। এই প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র রূপে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল মাসিক নারী শক্তি।"[৪৫]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) মনে করেন সামাজিক উন্নতির জন্যে প্রয়োজন বিদ্যা শিক্ষা। সমাজের সর্বস্তরের মানুষ লেখাপড়া না করলে সামাজিক উন্নতি অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে সমাজের উন্নতি প্রবন্ধে তিনি বলেন :

উন্নতির মূল লেখাপড়া ও বিদ্যাশিক্ষা। এই দুইটি জিনিসকে বাদ দিয়া উন্নতির চিন্তা করা একান্ত ভুল।... উন্নতি মানে কি? ধনে, আর এক উন্নতি জ্ঞানে। আমাদের বিশ্বাস, জ্ঞানের উন্নতি অর্থাৎ লেখাপড়া ও বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি না হইলে ধনের বা স্বাস্থ্যের বা অন্য কোন প্রকারের উৎকর্ষ লাভ সম্ভব নহে।[৪৬]

তিনি হিন্দু-মুসলমানে মিলন কামনা করেছেন। উদারতা ও সহিষ্ণুতার মাধ্যমেই এ মিলন সম্ভব। হিন্দুদের সংকীর্ণতা পরিহার করে উদার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসলেই হিন্দু মুসলমানের মিলন সম্ভব।

এদেশের সাম্পদায়িক মিলনের ভিত্তি হইল উদারতা ও সহিষ্ণুতা। অসহিষ্ণু মনোভাবের সম্মান করিবার দাবী করিলে এবং সেই দাবীকে মিলনের ভিত্তি মনে করিলে ভয়ানক ভুল করা হইবে।[৪৭]

তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষার উপরই সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে। যে সমাজ শিক্ষিত হয় না সে সমাজের কোন উন্নতি হয় না। সব উন্নতির মূলই হচ্ছে লেখাপড়া। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষার উপরই সমাজের সার্বিক উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভর করে।

উনিশ শতকের শেষার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান সাংগঠনিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাজ-সংস্কারে মনোনিবেশ করেছে। এ-সময় তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে যে, যাবতীয় কুসংস্কার, অশিক্ষা, গোঁড়ামিকে বিদূরিত করতে না পারলে মুসলমান সমাজে উন্নতি আসতে

Dhaka University Institutional Repository

পারে না। সে জন্যে সংগঠিত উপায়ে এ-সময় সংস্কারবাদী, উদার, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব লেখনি হাতে অগ্রসর হয়েছেন, সমাজকর্মী হিসেবে সাহিত্যকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। সাহিত্য হয়ে উঠেছে সংস্কার আন্দোলনের হাতিয়ার। তারা মুক্তবুদ্ধি, উদার ধর্মচেতনা এবং গণতন্ত্রায়নের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছেন। সেজন্যে মুসলিম মানস এ-পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা ও জ্ঞানানুশীলনে উদ্যোগী হয়েছে। ধর্মীয় চেতনাকে অস্বীকার না করেও কিংবা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও উদার সামাজিকায়নের পথে চলতে চেয়েছে। এ-জন্যে প্রয়োজন হয়েছে ধর্মের নবতর ব্যাখ্যা ও অনুশীলনের এবং ধীরে ধীরে মানবমুখী, সমাজনির্ভর অস্তিত্বভাবনা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে এর মধ্য দিয়ে। মুসলমান সমাজ উনিশ শতকীয় স্বাতন্ত্র্যবাদী বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে বৃহত্তর মানব-অভিজ্ঞতা স্রোতে মিশবার ব্যাকুলতাই এ-পর্যায়ের সমাজভাবনার মৌল বিষয়। সে জন্যে আত্মসমালোচনা যেমন প্রয়োজন হয়েছে, তেমনি প্রয়োজন হয়েছে ব্যক্তিশাসিত মুক্তবুদ্ধির।

ধর্মচিন্তা

বাংলাদেশে মুসলমান সমাজ ছিল প্রধানত ধর্মকেন্দ্রিক। ইংরেজ শাসন ক্ষমতায় এলে মুসলমান সমাজ ব্যবস্থায় ফাটল ধরে। বংশের আভিজাত্য ও ধর্মীয় সংস্কারই মুসলমান সমাজে প্রাধান্য লাভ করে। তখন সমাজের একটা বিরাট অংশ ছিল গোঁড়া ধার্মিক ও রক্ষণশীল। এরা ইংরেজ শাসনকে মেনে নিতে পারে নি। খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচারের ভয়ে বাঙালি মুসলমানেরা ধর্মকে আরো আঁকড়ে ধরে। তারা ধর্ম হারাবার ভয়ে ইংরেজি শিখতে এগিয়ে আসে নি। বাংলাদেশে মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল মনোভাবের কারণেই সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় হাজী শরয়িতুল্লাহর (১৭৮০-১৮৩৯) নেতৃত্বে। এ আন্দোলনই 'ফরায়েজি' (১৮১৮) আন্দোলন নামে পরিচিত।

মুসলমান সমাজের অশিক্ষা ও হতাশার কারণে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার জন্মলাভ করে। মুসলমানেরা তাদের অধিকার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে। মুসলমান সমাজকে ধর্ম সম্পর্কে সচেতন করার জন্যেই হাজী শরীয়তুল্লাহ 'ফরায়েজী' আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলন হিসাবে শুরু হলেও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার কৃষকসমাজই এ আন্দোলনের প্রধান সমর্থক।

উনিশ শতকের শেষ দিকে মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে ধর্মীয় আবেগ। তিনি ইসলামি আদর্শ ও ঐতিহ্য মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর সাহিত্যে শিল্প সৃষ্টির পরিচয় থাকলেও ধর্মচেতনাকে অস্বীকার করা হয় নি।

বিশ শতকের প্রথম দিকের লেখক বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক ও মোহম্মাদ লুৎফর রহমান ধর্মের আবেগকে প্রধান্য দেন নি। তাঁরা ধর্মের গভীরে গিয়ে ধর্মের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য

Dhaka University Institutional Repository

আবিষ্কার করেছেন। তাঁদের বিশ্বাস মানুষের মধ্যেই আল্লাহর অস্তিত্ব নিহিত। মোহাম্মদ লুৎফর রহমান তাঁর *মানবজীবন* (১৯২৭) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন :

> আল্লাহ কি? তাঁর কোন সিংহাসন নাই, কোন আসন নাই, রূপ নাই, অনন্তের সংগে তিনি মিশে আছেন। সুন্দর কল্যাণ এবং সত্যে তিনি আছেন।[৪৮]

ধর্মকে তিনি সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করেন নি। ধর্ম ও ইসলামকে তিনি সংস্কারমুক্ত ও উদার দৃষ্টি কোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যা কিছু সুন্দর ও কল্যাণময় সেখানেই স্রষ্টার অবস্থান। স্রষ্টা অনন্ত ও অসীমের সাথে মিশে আছেন। ধর্মের বাহ্যিক আচরণকে তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি ধর্মের গভীরে ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। *মানবজীবন* গ্রন্থে তিনি বলেছেন :

> জ্ঞানের দ্বারা মনকে চাষ না করতে পারলে ধর্ম পালন হয় না।... জীবনকে নির্মল সত্যময়, সুন্দর, ঈশ্বরের যোগ্য প্রেমময় নিষ্পাপ নির্দোষ করে তোলাই সমস্ত মানব জাতির একমাত্র ধর্ম।[৪৯]

এয়াকুব আলী চৌধুরী ও ইসলামের সত্যিকার আদর্শ মুসলমান সমাজের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। ইসলামের শিক্ষাকে তিনি মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মুসলমানেরা ইসলামের আদর্শ জীবনে প্রতিফলিতে করুক এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। *শান্তিধারা* (১৯২৩) গ্রন্থে তিনি ইসলামের আদর্শ তুলে ধরে বলেছেন :

> এখানেও দেখি সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন গঠনের প্রেরণারূপে তিনি দেখেছেন ইসলামকে, তার বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে গভীরতর অর্থ খুঁজে পেয়েছেন।[৫০]

শেখ আব্দুর রহিম, শেখ ফজলুল করিম, মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ মুসলমান লেখকেরাও ইসলামের আদর্শ তুলে ধরেছেন। এঁদের কাছে ধর্ম আবেগ নির্ভর ছিল না, ছিল যুক্তি নির্ভর। শেখ ফজলুল করিম তাই মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শেখ আব্দুর রহিমও ইসলামী আবেগে জীবন চরিত্র রচনা করেন নি। তিনি বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আত্মসচেনতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে ছিলেন প্রাচীনপন্থীদের তুলনায় প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী। তাদের উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি করা।

এমন সময় ছিল যখন শিক্ষা বলতে ধর্ম-শিক্ষাকেই বুঝাতো। তখন ধর্মের বন্ধনই ছিল সমাজের প্রধান বন্ধন। ধর্ম ছাড়া যে সমাজ থাকতে পারে একথা কেউ ভাবতে পারতো না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ ও কুসংস্কারকে অবলম্বন করে আরবি শিক্ষা এদেশে বিস্তার লাভ করে। কোরানের ভাষা হিসাবে আরবি শেখা মুসলমানেরা তাদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতো।

মুসলিম জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম সাহিত্যিকেরা স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাহিত্যের সূচনা করেন। তাদের সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্য বলে অভিহিত করা হলেও তা ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

আবেগনির্ভর ছিল না। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দিন গ্রামে গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। রিয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) ও শেখ আব্দুর রহিম ইসলামের আদর্শ ও মর্ম সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। উনিশ শতকের শেষ দিকে মুসলমান সাহিত্যিকেরা ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সাহিত্য সাধনা করলেও মীর মশাররফ হোসেন শুধু ধর্মীয় বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাহিত্য ও শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁর *বিষাদ-সিন্ধু* (১৮৮৫-৯০) ধর্মীয় চেতনার প্রকাশ থাকলেও এর কাহিনী জীবন চেতনায় প্রাণবন্ত। ইসলাম ধর্ম কেন্দ্রিক সাহিত্য চর্চার বিস্তার করেছিলেন 'সুধাকরদলে'র (১৮৮৯) লেখকেরা। তাঁরা ইসলামের আদর্শ প্রচার করে বিপথগামী লোককে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। এঁদের মধ্যে শেখ আব্দুর রহিম-এর ধর্মচিন্তা ছিল মুসলমান সমাজকে নিয়ে। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজ ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারায় জীবন গঠন করুক। তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলাম ধর্মে আছে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। ইসলাম ধর্মের আদর্শ মুসলমান সমাজ মেনে চললে সমাজে শৃংখলা ফিরে আসবে। ইসলামের পরিবর্তনশীল ভাবধারা তাঁকে আন্দোলিত করেছিল। *হযরত মুহম্মদের চরিত ও ধর্মনীতি* (১৮৮৭) গ্রন্থে এর পরিচয় আছে। এ-গ্রন্থে তাঁর যুক্তিনির্ভর বক্তব্য স্মরণীয় :

> যাহারা পূর্ব পুরুষগণের কৃত অনাচার অনুমোদন করিয়া চলে তাহারা ধার্মিক হিসাবে গোঁড়া, আবার যাহারা বুঝিয়াও না প্রকার বাধ্য বাধকতায় তাহা পরিত্যাগ করিবার সাহস পায় না, তাহারা দুর্বল চিত্ত। গোঁড়ামি ও চিত্ত দুর্বলতাই ধর্মহীনতা আনয়ন করে।[৫১]

কাজী ইমদাদুল হক মুসলমান সমাজে বহু বিবাহের বিরোধী ছিলেন। ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজের এক শ্রেণীর লোক কিভাবে বহু বিবাহ করে তাদের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর 'বহু বিবাহ' প্রবন্ধে বলেছেন :

> সাধারণ সমাজে যে অদ্যপি বহু বিবাহ প্রথা বর্তমান রহিয়াছে তাহার উৎপত্তি শাস্ত্রবিধান নহে। শাস্ত্র বিধানসমূহের বিকৃত অর্থকারী একদল স্বার্থপর পুরুষানুক্রমিক পুরোহিত ধর্মের নামে সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া বহুকাল অবধি আপন স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। যাহার যেমন প্রকৃতি, যাহার যেমন প্রবৃত্তি, তিনি তদানুসারে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে স্ব স্ব অপকর্মকে সিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ ও প্রচার করিয়াছেন এবং ক্রমে তাহা লোকাচরে পরিণত হইয়া ভবিষ্যতের চক্ষে আপনাকে শাস্ত্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে।... আমাদের সমাজে যে বাঁদী প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে তাহা একমাত্র তাহাদেরই সৃষ্টি এবং বহু বিবাহের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহাও তাহাদিগর সমুদ্যত।[৫২]

মুসলমান সমাজে বহু বিবাহ প্রথা চালু করেছে একশ্রেণীর সুবিধাবাদী। তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করেছে এবং লালসা চরিতার্থের জন্য এ-অপকর্ম বৈধ বলে সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। কাজী ইমদাদুল হক সচেতন পর্যবেক্ষকের মত অন্ধ পীর ভক্তির কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাঁর প্রগতিশীল মন ধর্মকে পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে চেয়েছিল। তিনি প্রগতিশীল মনসিকতার অধিকারী হলেও তাঁর ধর্মচিন্তা সংস্কারমূলক ছিল না। তিনি মুসলমান সমাজের দোষত্রুটি তুলে ধরেছেন। *আবদুল্লাহ* (১৯০৬) উপন্যাসে অন্ধ পীরভক্তি, পর্দাপ্রথা,

Dhaka University Institutional Repository

আশরাফ-আতরাফ সমস্যা ইত্যাদি তিনি নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। কিন্তু বেগম রোকেয়ার ধর্মচিন্তা ছিল সংস্কারমূলক। ধর্মের নামে চাপিয়ে দেয়া কোন বিধিই তিনি অন্ধের মত মেনে নিতে চান নি। তিনি ধর্মের কুসংস্কারকে মানতে চান নি। ধর্মের নামে অন্ধ অনুকরণও তিনি পছন্দ করেন নি। সাধনা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই মানুষ তার ভাগ্য গড়তে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন অনুশীলন ও সাধনা করে মানুষ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে। ধর্মের নামে নারীকে ব্যবহার করা, নারীর ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব খর্ব করা, জড়োয়া অলংকার রূপ লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ রাখার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ধর্মচিন্তাও ছিল সংস্কারমুক্ত। মুন্সী রেয়াজুদ্দিন বলেছেন যে, যে দেশে মুসলিম ছাড়া অন্য শাসন কায়েম আছে সেখানে ইসলাম ধর্ম প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। ইসলামবাদী চেষ্টা করেছেন মুসলমানদের মধ্যে আত্মচেতনা জাগ্রত করতে, তাদের ঐক্য গড়ে তুলতে। চিন্তা ও কর্মে তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত। তাই তাঁর ধর্ম চিন্তার কোন গোঁড়ামির পরিচয় পাওয়া যায় না। মুসলমান জাতির বিপদের দিনে সকল সংকীর্ণতাকে তিনি জাতির মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছেন। গঠনমূলক চিন্তা আর কাজের মধ্যেই তিনি সংস্কার চেয়েছেন। ধর্ম প্রচারের মধ্য দিয়ে তিনি মুসলমান সমাজকে জাগাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি অন্ধভাবে কোন কিছু গ্রহণ করেন নি। 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "ইহা মনে রাখা আবশ্যক, যে সকল হাদিস জ্ঞান ও যুক্তির প্রতিকূল সেই সকল প্রকৃত প্রস্তাবে হযরতের পবিত্র বাণী নহে।"[৫৩]

ইসলামাবাদী মনে প্রাণে ছিলেন সংস্কারবাদী। ধর্ম চিন্তায় যক্তির প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর সংস্কারের মূল কথা। এ প্রসংগে আনিসুজ্জামান বলেন, "এর আগে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী পীরদের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর সংস্কারবাদী চিত্ত বাবার দরগাহে মানসিক করা কিংবা বাতি দেওয়ার নিন্দা না করে পারে নি।"[৫৪]

তিনি নিম্ন শ্রেণীর মুসলমান ও সাঁওতালদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করে বেড়িয়েছেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন : 'তিনি খাসিয়া জাতির মধ্যে খৃস্টান মিশনারীদের কার্যের সফলতা দেখে সেখানে একটি ইসলাম মিশন কায়েম করার উদ্যোগী হন। তিনি আমাকে এ কর্যভার গ্রহণ করতে পত্র লিখেছিলেন।"[৫৫]

এভাবে ধর্ম প্রচার ও সংস্কার কর্মের আবেগ-অভিজ্ঞতা থেকেই রাজনৈতিক জীবনের সূচনা।

মোহম্মদ ওয়াজেদ আলীর (১৮৯৬-১৯৫৪) ধর্মচিন্তা ছিল সংকীর্ণতা মুক্ত। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন সাম্প্রদায়িক মিলনের ভিত্তি হলো উদারতা। প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় স্বা স্ব সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা দাবি করে এটাই স্বাভাবিক। কোন সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করাকে তিনি পছন্দ করেন নি। ধর্মীয় সংকীর্ণতা যে কত ভয়ংকর তা তিনি আরো স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর 'সাম্প্রদায়িক মিলন' প্রবন্ধে :

> আমি যতটুকু বুঝিতে পারি তাহাতে মনে হয় সকল রোগের মূল এই খানে। মুসলমানের সংকীর্ণতা যাহা কিছু আছে, তাহা সহজেই দূর করা যাইতে পারে। কিন্তু হিন্দু সংকীর্ণতা বড় ভয়ানক জিনিস।

Dhaka University Institutional Repository

> স্ব সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান এই সংকীর্ণতাকে আরো অধিক ভয়ানক করিয়া তুলিয়াছে। যাহার আচার ব্যবহার সংকীর্ণ, ধর্মীয় মাপকাঠি সংকীর্ণ, মানবতা জ্ঞান সংকীর্ণ, সে যদি সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়ায় তবে তাহার মত ভয়ংকর ব্যক্তি দ্বিতীয় আর একটা হইতে পারে না।[৫৬]

তাঁর বিশ্বাস ধর্মই এদেশে সাম্প্রদায়িক জীবনের ভিত্তি। সাম্প্রদায়িক সমাজই এখানে গড়ে তুলেছে ধর্ম। সমাজের অঙ্গ হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মন, চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করছে ধর্ম। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর বক্তব্য :

> সাম্প্রদায়িক মিলনের ভিত্তি হওয়া চাই উদারতা ও সহিষ্ণুতা। প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায় স্ব স্ব ধর্মমতের স্বাধীনতা দাবী করিবে, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই স্বাধীনতার অর্থ সকলকে পরিস্কারভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে।[৫৭]

ধর্মের গোঁড়ামিকে তিনি পছন্দ করেন নি। তাঁর ধর্মচিন্তা ছিল যুক্তিনির্ভর। ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে অসম্মান ও অবহেলা তিনি পছন্দ করেননি। 'নরনারী' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "গোঁড়া ধার্মিক বুদ্ধিতে নারীকে দেখা হয় পুরুষের হুকুমদার প্রাণী ও নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পত্তিরূপে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে স্ত্রী জাতিকে মানবতার পরিমাণে পুরুষজাতির চাইতে হীন জীব ভাবা হয়।"[৫৮]

ধর্মশিক্ষা বলতে তিনি কোরানের দু'এক পাতা রিডিং, বা মুখস্ত করা বুঝেন নি। এ ধরণের প্রতারণামূলক শিক্ষা আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'শিক্ষার কথা' প্রবন্ধে বলেছেন :

> ধর্মশিক্ষা – শিশুদের, অল্পবয়স্কদের ধর্মশিক্ষা এর মানে ভেবে পাওয়া .... আরবী কোরআনের দুই এক পাতা কোন রকমে রিডিং পড়তে শেখার নাম ধর্মশিক্ষা নয়, কেননা বস্তুতঃ তাতে ধর্মশাস্ত্র কিছুই শেখা হলো না। বৈদেশিক ভাষায় কয়েকটি মন্ত্র কণ্ঠস্থ করা হলো মাত্র। একে যারা ধর্ম শিক্ষা মনে করছেন তাঁদের ধর্মান্ততা সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে বিশেষ আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৫৯]

বেগম রোকেয়া ধর্মকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ধর্মের মূল হচ্ছে একতা। মানুষের মধ্যে একতার সম্পর্কই সবচেয়ে বড় ধর্ম, "একতা মহাশক্তি, একতা আমাদের ধর্মের মূল আমাদের সমুদয় ধর্মেই ঐক্য নিহিত আছে।... আমাদর ঘরে ঘরে আত্ম কলহ লাগিয়া আছে। যাহাদের ঘরে পিতা-পুত্রে বিবাদ, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ তারা সমস্ত সমাজটিকে আপন ভাবিতে পারিবে কিরূপে।"[৬০]

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর ধর্মচিন্তা ছিল গঠনমূলক। তিনি ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা, গোস্থান কমিটি গঠন, লাওয়ারিশ গোর দেয়া ইত্যাদি সেবামূলক কাজকেই ধর্ম বলে মনে করতেন। এক কথায় মানবতার সেবাকেই তিনি সবচেয়ে বড় ধর্ম মনে করতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি চট্টগ্রামের 'কদমমোবারক' মসজিদ সংলগ্ন এতিমখানা স্থাপন।

Dhaka University Institutional Repository

কাজী নজরুল ইসলামকে বিশেষ কোন ধর্মের অনুরাগী বলা না গেলেও তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেছেন। তাঁর কাছে মনের ধর্মই সবচেয়ে বড় ধর্ম। তাঁর বিশ্বাস মানুষের হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন 'কাবা-মন্দির' নেই। সব মনুষই এক আদমের সন্তান এবং পরস্পর ভাই ভাই। তিনি দেশ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকে সমান উদারতায় ভালবাসতে পেরেছেন। তিনি ছিলেন একান্তভাবে মানবনিষ্ঠ। তাঁর ধর্মও ছিল তাই মানবনিষ্ঠ। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষকে ভালোবাসার নামই আল্লাহর এবাদত। এ ভালোবাসার মধ্যে ন্যায় ও সত্যনিষ্ঠা থাকা প্রয়োজন। তাই আমরা দেখতে পাই, সত্য ও মানবতাকে তিনি সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। ধর্মে যেখানেই তিনি অন্যায় দেখেছেন সেখানেই তিনি রুখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করেছেন। বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তিনি নিঃসংকোচে প্রকাশ করেছেন তাঁর উপলব্ধ সত্যকে, তিনি নিজেই বলেছেন :

> আর যা অন্যায় বলে বুঝেছি, অত্যাচারকে অত্যাচার বলেছি, মিথ্যাকে মিথ্যা বলেছি, কারও তোষামোদ করি নাই, প্রশংসার এবং প্রাসাদের লোভে কাহারো পিছনে গোঁ ধরি নাই। আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই – সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করছে।[৬১]

তাঁর ধর্মচিন্তা ছিল কুসংস্কার মুক্ত। তিনি চেয়েছেন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তি। নির্যাতিত মানুষকে ব্যক্তি চেতনায় জাগানো এবং সত্তার মর্যাদা প্রতিষ্ঠাই ছিল তার ধর্ম। দেশের নিপীড়িত মানুষকে সমবেদনা জানাতে গিয়ে তিনি বিশ্বের নির্যাতিত মানুষের অন্যায় অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। মানুষের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসাই তাঁকে ধর্মের গোঁড়ামি ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থেকে রক্ষা করেছে। তিনি চেয়েছেন মানুষের মর্যাদা ; মানুষের ব্যক্তি মর্যাদার সাম্য। তাঁর ধর্মীয় চিন্তা ছিল সব মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, তাই সব মানুষই সমান। এখানে কেউ রাজা, কেউ প্রজা নয় – সব মানুষ একে অপরের ভাই। ইসলামে এ শিক্ষাই তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

> ইসলামের মানবতা ও সমাজ সংজ্ঞা তাঁর আদর্শের সম্পূর্ণ অনুকূল বলেই মানুষ নির্বিশেষে মিলন পীঠ, কাবার ছবি তাঁর বক্ষে অংকিত; মানবতা ও সাম্যের বাণী বাহক হযরত মোহাম্মদের (দঃ) নাম তার 'জপমালা'। এই জন্যেই মর্যাদার পূজারী-উন্নত শির কবির হৃদয়ে কলেমা 'লা ইলাহা ইলল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' আন্দোলন জাগায়। তাঁর এই ইসলাম প্রীতি ধার্মিকতা প্রসূত নয়, মানবতা ও ব্যক্তি নিষ্ঠাজাত। ধর্ম প্রাণতা নয়, আদর্শানুগ্যতা।[৬২]

মানুষের সার্বিক মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর ধর্ম। তাঁর কাছে মানুষের কোন ভেদাভেদ ছিল না। মানব ধর্মই ছিল তাঁর কাছে বড় ধর্ম।

ধর্মবোধ বাঙালি মুসলমানের অত্যন্ত দৃঢ়। কিন্তু অশিক্ষা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে তা কখনো গতিশীল, সাবলিল এবং মুক্ত জীবনের স্পর্শে উজ্জীবিত হয়নি। ধর্ম তাই প্রায়শ জীবন-বহিরস্থ কর্মকাণ্ড, মোহময় ইশারা কিংবা কিছু সংস্কারের বন্ধন মাত্র। ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা, তাকে

Dhaka University Institutional Repository

আত্মস্থ ও বাস্তব উপযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে সন্ধান করা উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের জীবনে ঘটেনি। উনিশ শতকের মুসলমান আত্মরতিমুগ্ধ, কিংবা আত্মরক্ষার জন্যেই ধর্মের ব্যবহারে উৎসাহী। মুসলমানরা মনে করতো ইংরেজরা তাদের শত্রু এবং ইংরেজদের কাছ থেকে সুবিধা নেওয়া হিন্দুরাও শত্রু। ফলে ধর্মের আশ্রয়-বলয়ে তারা স্বস্তি, শান্তি ও আত্মঅহংকারের তৃপ্তি সন্ধান করেছে। কিন্তু বিশ শতকে ধর্মকে সামাজিকায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, ধর্ম ও সামাজিক জীবনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে ধর্ম তখন কেবল অন্ধ মুগ্ধতার ব্যাপার নয়, তা হয়ে দাঁড়ালো সমাজ, রাজনীতি এবং মানব মূল্যায়নের হাতিয়ার। ধর্মের যাবতীয় কুসংস্কার, যা প্রগতির পক্ষে বাধাস্বরূপ, তার বিপরীতে বিজ্ঞানমনস্ক গতিশীল জীবন চর্চার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা নয়, মানব-বিশ্বায়নের পথে সম্পৃক্ত হওয়ার প্রচেষ্টাই এ-সময়ের ধর্মচিন্তার কেন্দ্রবিন্দু।

জাতিভাবনা

নিজের সম্পর্কে সচেতনতা এবং অপরের কথা ভাববার প্রেরণা থেকে প্রকাশ পায় স্বজাতি প্রীতি। এ সচেতনতা থেকেই মুসলমান লেখকদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে স্বাজাত্যবোধ। পাশ্চাত্য শাসন সভ্যতা ও সাহিত্য সংস্কৃতির ছায়ায় মুসলমান জাতির মধ্যে নতুন জীবনবোধের উন্মেষ ঘটে। আর এই নতুন জীবনবোধ মুসলমান সমাজে যে আলোড়ন আনে তার পরিচয় প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। নতুন জীবনবোধ ও স্বজাতির প্রীতি থেকেই মুসলমান সমাজে জাতিভাবনা বিকাশের পথ পেয়েছে।

উনিশ শতকের শেষ দিকে মুসলমান সাহিত্যিক গোষ্ঠী ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্য রচনা করলেও তাদের মূল ভাবনা ছিল মুসলমান জাতির উন্নতি সাধন করা। মুসলমান সমাজের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে তাঁরা সচেতন হন এবং সাহিত্যে তা প্রতিফলিত করেন। মুসলমানের দুঃখ দুর্দশাকে তাঁদের জাতীয় দুর্গতি বলে মনে করে তা পত্র পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এভাবে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চাকে তাঁরা জাতীয় কল্যাণের একমাত্র পথ বলে মনে করেন।

জাতিগত চিন্তা, জাতি ভাবনা ও কর্মের স্বাধীনতাই জাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। ধর্ম নিয়ন্ত্রিত জীবন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মূল্য দিতে পারে না। স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ না পেলে সমাজ ও জাতি উন্নতি ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারে না। যে সমাজে স্বাধীনতা নেই সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হয় না এবং উন্নত সামাজিক জীবনও গড়ে ওঠে না। ন্যায় ও সত্যের উপরই জাতির জীবন প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

বিশ শতকের প্রথম দিকে মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চেতনা দানা বেধে ওঠে। তাদের মনে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের স্বপ্ন জাগে। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার প্রেরণা অনুভব করে। অর্থনৈতিক কারণে পুরোপুরি সফল না হলেও তাদের মধ্যে জাতি ভাবনা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক যুগে মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর *গো-জীবন* (১৮৮৮) গ্রন্থে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ *গোজীবন* রচনার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলেও "একথা স্বীকার করতে হবে যে, মুসলমানের মিলন সাধন সম্পর্কে মশাররফ হোসেন যে মন্তব্য করেছেন তা যুক্তি ও বাস্তব বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত।"[৬৩]

তিনি শুধু হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনাই করেন নি, তাঁর আন্তরিক উদ্বেগ এ-গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা গিয়েছে। তিনি চেয়েছেন, মুসলমান জাতি ইসলামের আদর্শ অসুসরণ করুক। কায়কোবাদও হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছেন। মুসলমাদের অতীত গৌরব ও ঐতিহ্যের কথা তিনি বারবার স্মরণ করেছেন। তাদের পরাধীনতার গ্লানি স্মরণ করে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। *মহাশ্মশান* (১৯০৪) কাব্যে মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে তিনি বলেছেন :

> আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতে ছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্য-বীর্য সম্বলিত এমন একটি যুদ্ধ কাব্য লিখিয়া যাব যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ ও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, শৌর্য ও গৌরবের কোন অংশেই তাহারা জগতের অন্যকোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না, তাই তাহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীর্তিটুকু, যেথানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি তাহাই কবি তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকের চোখের সম্মুখে উপস্থিত করিযাছি এবং তাহাদের সেই অতীত গৌরবের স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে।[৬৪]

ভারতীয় মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা, তাদের বীরত্বের কথা তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মুসলমান জাতির পরাধীনতার গ্লানি তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। এক মুঠো ভাতের জন্য দুয়ারে দুয়ারে কেঁদে বেড়ানো এবং গোলামী করা তিনি পছন্দ করেন নি। মুসলমান জাতির পতনের জন্য যে বেদনাবোধ তা তাঁর সমাজ সচেতন মনের পরিচয়ই বহন করে। তিনি চেয়েছেন মুসলমান জাতি তাদের অতীত ইতিহাস ও গৌরবের কথা স্মরণ করে আবার জেগে উঠুক। মোজাম্মেল হক মুসলমান জাতির কৃষ্টি ও ঐতিহ্য নিয়ে আদর্শ জীবনের কল্পনা করেছেন। তিনি চেয়েছেন মুসলমান জাতি ইসলামের আদর্শ মনে গ্রহণ করে পরিপূর্ণ আদর্শ মানুষে পরিণত হোক এবং আদর্শ মানুষের মর্যাদা লাভ করুক। তাঁর *মহর্ষি মনসুর* (১৮৯৬) *তাপস কাহিনী* (১৯০০) প্রভৃতিতে অবাস্তব ও অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ থাকলেও এর মধ্যে তিনি জাতিকে কিছু কিছু সদুপদেশ ও নীতি জ্ঞান দান করেছেন।

মোহাম্মদ লুৎফর রহমান চেয়েছেন মনুষত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। তিনি মানুষের জীবনকে মহৎ করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। তিনি একটা আদর্শ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন। তিনি তাঁর *উন্নত জীবন* (১৯১৯) গ্রন্থে 'জাতির উত্থান' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেছেন :

> কোন জাতিকে যদি বলা হয় তোমরা বড় হও তোমরা বড় হও, তোমরা জাগ, তাতে ভাল কাজ হয় বলে মনে হয় না। একটা মানুষ নিয়েই এক একটা জাতি। পল্লীর অজ্ঞাত অবজ্ঞাত এক একটা মানুষের কথা ভাবতে হবে।[৬৫]

Dhaka University Institutional Repository

ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান এবং বেগম রোকেয়া চেয়েছেন নারী শিক্ষা ও নারীর সামাজিক মর্যাদা। মুসলমান সমাজে পর্দা প্রথাকে তাঁরা প্রবলভাবে বিরোধিতা করেছেন। মুসলিম নারী শিক্ষার জন্য বেগম রোকেয়া আজীবন সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু লুৎফর রহমানের কাছে সবকিছুর উর্ধ্বে মানুষ। মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, শেখ ফজলুল করিম মুসলিম জাতিকে ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এরা মুসলিম জাতিতে বিভিন্ন নীতি উপদেশ দিয়ে আদর্শ জীবন যাত্রার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। শেখ আব্দুর রহিম ও মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছেন। কিন্তু লুৎফর রহমান ধর্ম নিরপেক্ষ মানবিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী চেয়েছেন মুসলমান জাতির জাগরণ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করে মুসলমান জাতি এগিয়ে যাক-এটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তিনি মুসলমান জাতির মধ্যে আত্ম-সচেনতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। *তুর্কী নারী জীবন* (১৯১৩) গ্রন্থে তিনি তুর্কী নারীদের প্রগতির তুলনায় আমাদের দেশের মেয়েদের পশ্চাদপদতার কথা বলেছেন।[৬৬]

ইসমাইল হোসনে সিরাজীর মত মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মুসলমান জাতির জাগরণের আহ্বান জানিয়েছেন। বেগম রোকেয়ার মত তিনিও মুসলমান সমাজের কুসংস্কারের বিরোধিতা করেছেন। তিনি চেয়েছেন অনগ্রসর ও দুর্দশাগ্রস্থ মুসলমান জাতির উন্নতি করতে। মুসলমান জাতির সার্বিক উন্নতিই ছিল তাঁর একমাত্র কামনা। ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস থেকে ঘটনা নিয়ে লিখেছেন, *তুরস্কের সুলতান* (১৯০১) এবং মুসলমান জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য লিখেছেন, *ভারতে মুসলমান সভ্যতা* (১৯১৪), *মুসলমানদের অভ্যুত্থান* (১৯১৫) প্রভৃতি গ্রন্থ। বেগম রোকেয়ার মত তিনিও নারী জাতির মদ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। নারী জাতিকে জাগরণের আহ্বান জানিয়ে বেগম রোকেয়া বলেছেন, "কোন সাধু লোকটি অনায়াসে নিজ বক্তব্য বলিতে পারিয়াছেন? তাই বলি, সমাজের কথায় কর্ণপাত করিবেন না।... কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্তে জাগিতে হইবেই।"[৬৭] বেগম রোকেয়ার মতো কাজী ইমদাদুল হক মুসলমান সমাজের কুসংস্কার পরিহার করে হিন্দু জাতির ন্যায় শিক্ষা বিস্তারের আহ্বান জানিয়েছেন। 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন :

> হিন্দুরা শিক্ষা লাভ করে সমাজের কল্যাণ সাধন করেছেন, অন্যদিকে মুসলমানেরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে তাদের পতন ঘটেছে। সম্প্রতি হিন্দু সমাজের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অগ্রসর হয়েছেন। মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ করে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রচলন না হলে আমাদের কোন আশা নেই।[৬৮]

প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমানের জাতিভাবনা তার সমাজভাবনারই একটা অংশ। সকল সংকীর্ণতা ছিন্ন করে মুক্তির খোলা প্রান্তরে হাজির হওয়ার জন্যে তীব্র আকূতি বাঙালি মুসলমানের মধ্যে উনিশ শতকের শেষার্ধেই লক্ষ করা গেছে। বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং রাজনৈতিক মঞ্চভিত্তি সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বসমাজ ও জাতির কল্যাণ সাধন। জাতির ধর্মীয় জীবন, সামাজিক ও

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক জীবনকে মূল্যায়নের সূত্রে গতিশীল একটি জাতিসত্তার আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই সংস্কারবাদীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। যে কুসংস্কার ও অশিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে তার বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়েছেন। অবশ্য জাতি প্রশ্নে তাদের মধ্যে দ্বিধা ছিল – বাঙালি, কিংবা বাঙালি মুসলমানের নিয়ন্ত্রিত পরিচয়ে তারা তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। তবে আশার কথা – এর মধ্যেও তারা জীবনের দাবির কথা ভুলে যায় নি। তাদের কাছে শিক্ষা এবং ঐতিহ্য-মূল্যায়নই হলো জাতি-সচেতন কর্মকাণ্ড। কেবল মুসলমান জাতির কল্যাণ, অন্য কারো নয় – এমন ভাব সমকালে প্রকাশিত হয় নি। বরং সমন্বিত, সকল ধর্মমতের সরব উপস্থিতি নিয়ে গতিশীল হতে চেয়েছে সংস্কারবাদীরা। দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মের ভেতর শুদ্ধতা এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তাদের মহৎ জাতিভাবনার দিকে নিয়ে গেছে, যা কেবল জাতিগঠন কিংবা অস্তিত্ব বিকাশের কথা নয় – মানব মুক্তির কথা।

রাষ্ট্রচিন্তা

অতি প্রাচীন কালে রাষ্ট্র শব্দটি প্রচলিত না থাকলেও গ্রিক ও রোমান যুগে রাষ্ট্র বোঝাতে 'পোলিস' (Polis) ও 'সিভিটাস' (Civitas) শব্দ দুটি ব্যবহৃত হতো। রাষ্ট্র শব্দটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন ষোড়শ শতাব্দীর ইটালির প্রসিদ্ধ দার্শনিক মেকিয়াভেলি। তাঁর মতে, রাষ্ট্র হলো, একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত সমাজ। প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রচিন্তা যেমন নগর রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল, ঠিক তেমনি মধ্যযুগের রাষ্ট্র চিন্তা একদিকে গির্জা, অন্যদিকে সমাজতন্ত্রকে কেন্দ্র করে বিকাশ লাভ করেছিল। মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো গির্জা ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ। মধ্যযুগের রাজা ও গির্জার মধ্যে বিরোধ যখন তুঙ্গে এবং প্রত্যেকে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার প্রচেষ্টায় মত্ত, সেই সময়ে সমাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। সামন্ত প্রভুরা গোটা রাষ্ট্রকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে স্ব-স্ব এলাকায় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এক একটা এলাকার সার্বভৌম ক্ষমতা সামন্ত প্রভুরা প্রয়োগ করতেন। এইভাবে মধ্যযুগে সামন্ত প্রভুরা ছিলেন প্রকৃত শাসক। জনগণের সঙ্গে তাদের ছিল সরাসারি যোগাযোগ। রাজা বা গির্জার সঙ্গে জনসাধারণের কোন যোগাযোগ ছিল না। রাজা নামমাত্র শাসক প্রধান ছিলেন। প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালিত হত সামন্ত প্রভুদের দ্বারা।

সভ্যতার সূচনার সাথে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব গভীরভাবে জড়িতে। সভ্যজাতির ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সভ্যতার বিকাশের সাথে রাজনৈতিক চিন্তাধারারও বিকাশ ঘটেছে। সভ্যজাতির জন্য প্রয়োজন উন্নত সামাজিক জীবন, আর এই উন্নত সামাজিক জীবনের নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র রাষ্ট্র।

সমাজজীবনের প্রাথমিক যুগ থেকেই মানবসমাজ কোন না কোন রাজনৈতিক সংঘের অধীনে জীবন যাপন করে আসছে। এই রাজনৈতিক সংঘই রাষ্ট্র নামে পরিচিত। গ্রিক দার্শনিক আরিস্টটল

Dhaka University Institutional Repository

থেকে শুরু করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উইলসন পর্যন্ত রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল – নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত জনসমাজ, আইন-কানুনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংগঠিত জনসমাজকে রাষ্ট্র বলা যেতে পারে।

রাষ্ট্র একটা সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। মানুষ যুগ যুগ ধরে যে সব চিন্তা-ভাবনা করে আসছে তার মধ্যে রাষ্ট্রই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই মানুষের সামাজিক জীবনের সূচনা এবং এর মাধ্যমেই তার জীবনের গতি প্রবহমান। রাষ্ট্র বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার চিন্তাধারা ও মতামতের মুখোমুখি হয়েছে। রাষ্ট্র সম্পর্কে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামতকে আমরা রাষ্ট্রচিন্তা নামে অভিহিত করতে পারি।

মধ্যযুগে ধর্মই ছিল রাষ্ট্রের ভিত্তি। কিন্তু বর্তমান যুগে ধর্মের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে আত্মীয়তা। প্রাচীন কালে একই গোত্রের লোককে নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হলেও গোত্র প্রীতির প্রভাব এখনও রাষ্ট্রে গভীরভাবে অনুভূত হয়। তবে গোত্রপ্রীতি এখন আর রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরিহার্য নয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এখন আর গোত্রীয় ঐক্য নেই। এমনকি ধর্মগত ঐক্যেরও কোন প্রয়াজন নেই। আধুনিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করলেও তাদের মধ্যে কৃষ্টিগত ঐক্য, ভাষামূলক ঐক্য ও আদর্শমূলক ঐক্য সংযুক্ত হয়েছে। এসব ঐক্য জাতির জন্য অপরিহার্য। রাষ্ট্রের ভালমন্দ জাতির চরিত্র, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্তব্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। নাগরিকেরা যদি তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে তাহলে দেশে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আসে। নৈতিক উৎকর্ষ জাতিকে রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার পথে নিয়ে যায়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম লেখকেরা রাষ্ট্র সম্পর্কে নতুন কোন রাষ্ট্রদর্শন প্রবর্তন না করলেও তাদের এই বিষয়ে চিন্তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ কেউ রাষ্ট্রগঠনে ধর্মগত ঐক্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু বর্তমান যুগে আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে ধর্মগত ঐক্যর কোন প্রযোজন হয় না। আধুনিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে ধর্মীয় ঐক্যের চেয়ে এখন কৃষ্টিগত ঐক্য – ভাষা ও আদর্শমূলক ঐক্য প্রাধান্য লাভ করেছে।

উনিশ শতকে মুসলমান-সমাজ ধর্মসংস্কার আন্দোলনে যোগ দিয়ে সমাজের পরিবর্তন করতে চাইলেও সেই সমাজ আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে গভীর যোগ ঘটাতে পারে নি। তাদের রাষ্ট্রচিন্তা ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে নি। ওহাবী আন্দোলন (১৮৩১-৪৭)এর মধ্যদিয়ে মুসলমানদের মনে দেশপ্রেম জেগে উঠলেও সেই আন্দোলন প্রধানত ছিল ধর্মীয় আন্দোলন। হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের অবিচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন পরিচালিত। কিন্তু পরবর্তীকালে এ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ লাভ করে।

বিশ শতকের মুসলমান লেখকদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জাতির অধঃপতন রোধ করা। তাঁদের রাষ্ট্র চিন্তাও মুসলমান জাতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'সুধাকর দলে'র শেখ আবদুর রহিম, রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ মাশহাদী ও মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দিন আহম্মদ মুসলমান সমাজে ইসলামের আদর্শ

Dhaka University Institutional Repository

ও তত্ত্ব প্রচার করে বিপদগামী মুসলমানকে ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন। এক কথায়, রাষ্ট্র চিন্তা বলতে তারা বুঝত, মুসলমান জাতির কল্যাণ। মুন্সী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ (১৮৬১-১৯৩৭) ও মুন্সী জমির উদ্দিন (১৮৭০-১৯৩৭) ইসলাম ধর্ম প্রচারক হলেও মুসলমান সমাজকে বিভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তারা সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন।

সেকালে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলি পর্যালোচনা করে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন আহম্মদ মাশহাদী। তাঁর *সমাজ সংস্কারক* বইটি সেকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণা রূপে কাজ করেছিল। মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি কামনা করলেও এঁরা ছিলেন রাজনীতিক সচেতন, প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী। এদের মধ্যে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ব্যাংকের সুদ আদান প্রদানকে ধর্ম বিরুদ্ধ নয় বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুসলমান সমাজের মাঝে নব জাগরণ এনেছিলেন। তাঁর *অনল প্রবাহ* (১৯০০) গ্রন্থে প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন জ্ঞানে ও কর্মে মুসলমান জাতি উন্নতি লাভ করুক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করে মুসলমান জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠুক এবং জাতীয় জীবনের উন্নতিতে অবদান রাখুক।

দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে মুসলমান সাহিত্যিকেরা হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা করেছিলেন। মীর মোশাররফ হোসেন এর সূচনা করেন এবং পরবর্তীকালে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ মুসলিম লেখকদের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। মুসলমানদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ সৃষ্টির জন্য তৎকালীন ধর্মীয়, সামাজিক অবস্থা কার্যকর ছিল। তাই ধর্মভাবের মধ্যে দিয়ে তাদের মনে ইংরেজ শাসনবিরোধী মনোভাব সঞ্চারিত হয়। "বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম দশকে বাংলার মুসলমানদের একটা ক্ষুদ্র অংশে নতুন চেতনা জাগে।"[৬৯]

মুহম্মদ ইউসুফ সর্বপ্রথম মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধীকারের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করেন ১৮৮৩-তে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা 'শিক্ষা সম্মেলন' এর শেষে জন্ম হয় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের। এ সম্মেলনেই স্বতন্ত্র নির্বাচনের উপর জোর দেয়া হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টোর সংস্কার আইনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবি স্বীকৃত হয়।//

বিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ধর্মপ্রচার ও সংস্কার-কর্মের অভিজ্ঞতা থেকেই মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। পণ্ডিত মেরাজউদ্দিন ও পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন আহম্মদ মাশহাদীই ইসলামাবাদীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেন। সমাজসেবক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তিনি মুসলমান সমাজের দুর্দশার প্রতিকার করার জন্যে নানা পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে থাকেন। তিনি মুসলমান সমাজের আহ্বানে বলকান যুদ্ধের সময় এবং খেলাফত আন্দোলনে (১৯২০) জড়িয়ে পড়েন। তখন থেকেই কৃষকের দুর্দশা নিয়ে ভাবতে থাকেন। মুহম্মদ আব্দুল হাই মন্তব্য করেন, "তিনি ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক কর্মী, সমাজসেবক,

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বক্তা। ১৯২০ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কি করলে মুসলিম জাতি তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে সে চিন্তাই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনি কংগ্রেসের সভ্য হিসাবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণও করেছিলেন এবং কৃষক প্রজা আন্দোলনের সংগেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[৭০]

তাঁর রাজনীতি ছিল গ্রামের সাধারণ মানুষকে নিয়ে। তিনি আজীবন কৃষকের অবস্থার উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি মুসলমান সমাজকে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলার মুসলমান সমাজ জমিদার ও জোতদারদের অত্যাচারে নিষ্পেষিত। তাই সারা জীবন তিনি কৃষকের সার্বিক উন্নতি কামনা করেছেন এবং কৃষকের বিরুদ্ধে অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

ইসলামাবাদীর রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান সমাজের উন্নতি কামনা। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মুসলমান সমাজকে স্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা। দেশসেবাকে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ বলে মনে করতেন। জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর পদচারণা ছিল। বাঙালি মুসলমানের সার্বিক কল্যাণ কামনাই ছিল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার মূলকথা। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন চরমপন্থী। তিনি আমরণ কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন এবং অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেসে সহকারী সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং ১৯৩৭ সালে কৃষক প্রজা পার্টির মনোনয়ন লাভ করে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তিন বুঝতে পেরেছিলেন যে, কৃষকের উন্নতি ছাড়া জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই মুসলমান। তাই তিনি কৃষক প্রজা পার্টির কর্মী হিসাবে অনেক কাজ করার সুযোগ পান। দেশ সেবা ও রাজনীতি চর্চাকে তিনি কখনও আলাদা ভাবেন নি। গঠন মূলক সব কাজকেই তিনি দেশ সেবা মনে করতেন। তাঁর রাষ্ট্র চিন্তার মূল কথাই ছিল দেশের ও সমাজের সেবা করা। এক কথায় তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ছিল মুসলমানদের সমস্যা নিয়ে ভাবা এবং হিন্দু-মুসলমান উভয়ের সম্প্রতি কামনা করা। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তারাজি সমাজের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত স্পর্শ করেছিল। মুসলমান জাতির সার্বিক উন্নতি ছিল তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য।

রাজনীতি সমাজচিন্তারই অংশ। বাঙালি মুসলমান ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজসম্পৃক্ত হয় এবং সমাজসচেতনতাই তাদের রাজনীতিমুখী করে তোলে। স্বজাতি ও সমাজের কল্যাণ সাধনের সংকল্প কেবল সংস্কারবাদী আন্দোলনে স্তিমিত হয়নি। মূলত অধিকার সচেতন মধ্যবিত্তের হাতেই রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিংবা বঞ্চিতের বোধ রাজনীতিকর্মের উদ্দীপক শক্তি। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই বাঙালি মুসলমান অনুভব করছিল আত্মস্বাতন্ত্র্য এবং বঞ্চিত হওয়ার কারণ হিসেবে নির্দেশযোগ্য ছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন। সেজন্য ১৯০৬ সালে শিক্ষাসম্মেলন থেকে জন্ম নেয় মুসলিম লীগের মতো রাজনৈতিক সংগঠনের। এ-সময়ে ওহাবীও খেলাফত আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। মূলত মধ্যবিত্তের অপ্রাপ্তিবোধের সঙ্গে কৃষি-সমাজের ধর্মচেতনা যুক্ত হয়ে এ-আন্দোলন বেগবান হয়েছে। একাংশের মনোভঙ্গি ছিল জাতির

Dhaka University Institutional Repository

উন্নতির জন্যেই স্বতন্ত্র রাজনীতি এবং সমকালে তা প্রমাণ করতেও সচেষ্ট হয়েছে। তবে বাঙালি মুসলমানের রাষ্ট্রচিন্তা সামগ্রিক কল্যাণকামনারই রূপক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। সেখানে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর উপস্থিতি যেমন আছে, তেমনি আছে সাধারণ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। এর ফলে শেষ পর্যন্ত ধর্মের দাবি রাজনীতি থেকে মুক্ত না হলেও প্রধান হয়নি ; প্রধান দাবি হয়েছে এ-দেশের কৃষিজীবী মানুষের মঙ্গলের প্রচেষ্টা।

সাহিত্য ও শিল্পভাবনা

শিল্প-সাহিত্য জীবনসাধনার নামান্তর। মানুষের জন্যই সাহিত্য। সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ জীবনাদর্শের সাধনা। জীবনবোধের গভীরতার উপরেই সাহিত্যের মান নির্মিত হয়। মানুষের অনুভূতি থেকেই সাহিত্যের জন্ম। তাই সাহিত্য অনুভূতির অভিব্যক্তি। জীবনসাধনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে সাহিত্যের প্রয়োজন। তাই সাহিত্য জীবনের কথা বলে। সমাজও মানুষের কথা বলে। সাহিত্য চিন্তার মূল কথা হল সুন্দর ও মহত্বের পরিকল্পনা। সাহিত্যর উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। কিন্তু সাহিত্য যুগোপোযোগী না হলে তা সমাজ ও জাতিকে মঙ্গলময় ক্রমবিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারে না।

বিশ শতকের প্রথমদিকে কোন কোন মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেয়েছেন ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ধর্মনীতি থেকে। মুসলমান হিসাবে তাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদের অস্তিত্বের কথা, তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের কথা। নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে গিয়ে তাঁরা ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলিম লেখকেরা সমাজ বলতে মনে করতেন মুসলমান সমাজকে। তাঁরা বুঝেছিলেন সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করতে হলে শিক্ষার একান্ত প্রযোজন। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও পরবর্তীকালে তাঁরা এর উপর গুরুত্ব দেন। বাংলা ভাষার সাথে গভীর ভাবে পরিচয় হলে তাঁদের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে ওঠে এবং তাদের চিন্তাশক্তি প্রসার লাভ করে। তাঁরা বুঝেছিলেন বাংলা ভাষাই তাঁদের একমাত্র মাতৃভাষা। মুসলিম সাহিত্যসমাজ যাঁরা গঠন করেন তাঁরা ভেবেছিলেন সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই নিজেদের চিন্তাভাবনা সমাজের কাছে তুলে ধরবেন। মুসলিম সাহিত্যসমাজ সর্বপ্রথম উচ্চারণ করে যে, বাঙালি মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত করতে না পারলে শিল্প-সাহিত্য তাদের কাছে কোন অর্থ বহন করবে না।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমান সাহিত্যিকদের আগমন অনেক পরে হলেও মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। এদেশে ইংরেজ আগমনে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে তার প্রভাব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যে পিছিয়ে থাকার কারণ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করা। হিন্দুরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য শাসকদের সাথে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছে। এজন্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে তারা মর্যাদার সাথে স্থান করে নিয়েছে। অন্যদিকে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানেরা অতীতমুখী মানসিকতার জন্যে দোভাষী পুথির মধ্যেই সাহিত্যের স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করেছে।

সেকালে অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবী ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যেই নবাব আব্দুল লতীফ ১৮৬৩-তে মহমেডান লিটারেরি সোসাইটি নামে একটা সমিতি গঠন করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য মুসলমান ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করা স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন করা। এসব চেষ্টার ফলে দেখা যায় মুসলমানেরা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমান সাহিত্য সাধনায় নতুন ধারার সূচনা করে। উনিশ শতকের শেষ দশকে নতুন জীবনবোধ মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায় এবং এ সময় থেকেই তাদের মধ্যে সাহিত্যিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা তাদের চিন্তা ভাবনাকে সাধারণ মানুষের মনে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানেরা ছিল রক্ষণশীল। এ রক্ষণশীল মনোভাব এবং আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে বাঙালি মুসলমানেরা ইংরেজি ভাষা শিখতে পারেনি ফলে বঞ্চিত হয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পর্শ থেকে। এমন কি তাদের বাংলা ভাষাচর্চাও ছিল সংকীর্ণ। তাই দেশীয় সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষার সাথে তাদের গভীর যোগাযোগ ছিল না।

বিশ শতকের পরিবর্তিত পরিবেশে উন্নতমানের সাহিত্য সৃষ্টি করা মুসলমানের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগে মুসলমান সাহিত্যিকদের আগমন হয়েছে অনেক দেরিতে। মীর মশাররফ হোসেনের সমকালে যে সব সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনা করেছেন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের প্রচার। তাদের কাছে সাহিত্য মানেই ছিল ইসলাম ধর্ম ও আদর্শের প্রচার। কিন্তু এয়াকুব আলী চৌধুরীর কাছে সাহিত্য বিলাসের সামগ্রী নয়। তাঁর মতে, সাহিত্য সাধনা করে, আরাধনা করে অর্জন করতে হয়। সাহিত্যে থাকে প্রেমের সংযোগ, থাকে কল্যাণের সাধনা।

> সাহিত্য বিলাস পরিতৃপ্তি নহে; বিশ্রাম সময়ের বিশ্রম্ভালাপ নহে। সাহিত্য জীবনের সাধ – সাহিত্য সাধনা, সাহিত্য আরাধনার ধন। এ যে প্রেমের যোগ, কল্যাণের সাধনা। .... সাহিত্য জাতির জীবন রস, সাহিত্য স্ফূর্তি। চিরদিন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এবং সাধনায় জাতি উঠিয়াছে, এখনও উঠিবে।[৭১]

এয়াকুব আলী চৌধুরীর বিশ্বাস – সাহিত্য জাতির প্রাণে রস যোগায়। জাতিকে আনন্দ দান করে। সাহিত্যের চর্চায় জাতি বড় হয়। এর সাধনায় জাতি জেগে ওঠে। তাঁর মতে, সাহিত্য শান্তির উৎস। সাহিত্য জাতিকে জীবন রসে ভরিয়ে তোলে। তিনি মনে করেন সাহিত্য প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা বলে। এজন্যে সাহিত্য এক প্রাণ থেকে এার এক প্রাণে প্রেরণা ছড়িয়ে দেয়।

> সাহিত্য অমৃতায়মান শান্তির উৎস, শক্তির কল্পফলের রস; তাই এই চির আধি-ব্যাধি বিজড়িত, কর্ম তাপ তপ্ত নিরাশা-তুহিনাচ্ছন্ন সংসারে জাতি ইহা পান করিয়া মরণতন্দ্রার পরে বাঁচিয়া উঠে,

Dhaka University Institutional Repository

> অবসাদের মধ্যে শক্তি পায়। মাতৃদুগ্ধের অমৃতধারা মাতৃভাষার মধ্যে সঞ্চারিত আছে, তাই মার্তভাষার সাহায্যে সাহিত্যে যে ভাব-প্রবাহ ছুটে তাহা জাতির প্রাণের মধ্যে স্পন্দন জাগায়, তাহার প্রত্যেক শোণিত বিন্দু চঞ্চল ও অধীর করিয়া তোলে। সাহিত্য প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা কয়, তাই প্রাণে প্রাণে প্রেরণা ছুটায়।[৭২]

সাহিত্য মনের কথা, প্রাণের কথা বলে। সাহিত্য প্রাণে প্রাণে অনুপ্রেরণা জাগায়। এবং জাতির প্রাণে এভাবেই আনন্দ দেয়। সাহিত্য চর্চায় জাতি জেগে ওঠে।এবং জাতির প্রাণে ঝংকার তোলে। সাহিত্য জাতিকে কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে নিয়ে যায়। মোহাম্মদ লুৎফর রহমানও জীবনের, কল্যাণের কথাকে সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। যে কথায় মানুষের কল্যাণ হয়, যা শুনলে মানুষের মনে জ্ঞান জন্মায়, তাঁর মতে তা-ই সাহিত্য। কতকগুলো ছাপানো কাগজকে তিনি সাহিত্য বলে স্বীকার করেন নি।

> যে কথাগুলি মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, তথা অর্থপূর্ণ, যাহা শুনিলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহাই সাহিত্য। সাহিত্য অর্থে কতকগুলি মুল্যহীন অকেজো কাগজের স্তূপ নহে।[৭৩]

তাঁর মতে, সাহিত্য মানুষকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। সাহিত্যের মধ্যে প্রবীণের পরামর্শ পাওয়া যায়। তিনি বিশ্বাস করেন, মানুষের জীবনের ভাল কথাগুলোই সাহিত্য।

> প্রবীণের পরামর্শ, বন্ধুর আশা সাহিত্যের ভিতর পাওযা যায়।... মানুষের কথাই ত সাহিত্য। পৃথিবীতে যাহা আছে তাহাই সাহিত্য। তোমার জীবনটা সাহিত্যের একটা ধারা।[৭৪]

তিনি সাহিত্য বলতে জীবনকে বুঝিয়েছেন। তাঁর কাছে জীবন মানেই সাহিত্য। তিনি বিশ্বাস করেন সাহিত্য মানুষকে সৎ ও চরিত্রবান হতে শিক্ষা দেয়। মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্যই সাহিত্যের প্রাণ। সাহিত্য মানুষের মনকে স্নেহ-ভালবাসায় পূর্ণ করে তোলে। নারীকে আদর্শ সতী করতে চেষ্টা করে। মানুষকে সুখ-শান্তি ও কল্যাণ এনে দেয়। মানুষের জবিনের মঙ্গলের জন্যে, সুখের জন্যে যে সব কথা বলা হয় তা-ও সাহিত্য।

> মানুষের চরিত্র মহিমা, জ্ঞানীর জ্ঞান, হৃদয়ের উচ্চভাব লইয়াই সাহিত্যের প্রাণ গঠিত।... জীবনের কল্যাণের জন্য, মানুষের সুখের জন্য এ জগতে যিনি যত কথা বলিয়া থাকেন- তাহাই সাহিত্য।... পাপ, অন্যায় ও আঁধার হইতে সাহিত্য মানুষকে উদ্ধার করে।[৭৫]

তিনি বিশ্বাস করেন সাহিত্যের সাথে আত্মার গভীর সম্পর্ক। দেহ থেকে যেমন আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি সাহিত্যকেও আমরা জীবন থেকে আলাদা ভাবতে পারি না। সাহিত্য মানুষের মধ্যে আত্ম বোধ জাগায়। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে আত্মবোধ জাগিয়ে তোলাই সাহিত্যের লক্ষ্য। এয়াকুব আলী চৌধুরীর মতো লুৎফর রহমানও মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে, মাতৃভাষার উন্নতি ছাড়া পৃথিবীতে কোন জাতি বড় হতে পারে নি। মাতৃভাষার চর্চা ও সাধনায় জাতি বড় হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করেন, সাহিত্য মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়। তাকে জ্ঞান

Dhaka University Institutional Repository

ও দৃষ্টি দেয়। চিন্তা, জ্ঞান ও দৃষ্টি ছাড়া শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে জাতি বাঁচতে পারে না। তাঁর মতে, এক কথায়, সাহিত্য দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা করে। কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) মানুষের লিপিবদ্ধ চিন্তাভাবনাকে সাহিত্য বলে অভিহিত করেছেন। 'রস ও কবিত্ব' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন : "ব্যাপক অর্থে, মানুষের সমস্ত চিন্তাভাবনাকে সাহিত্য বলা যায়। কিন্তু সাধারণত আমরা বিজ্ঞানকে সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করি না।"[৭৬] কাজী আব্দুল ওদুদ সাহিত্য ও শিল্প বলতে ব্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন সাহিত্যও শিল্পের সমস্ত মাধুর্য নির্ভর করে ব্যক্তিত্বের উপর। তাঁর মতে ব্যক্তিত্বের নানারূপই সাহিত্য। তিনি মনে করেন সাহিত্যের বাণীতে মনোহারিতা ও মহাপ্রাণতা দু'টোই প্রয়োজন। "রস ও ব্যক্তিত্ব সাহিত্যকে পূর্ণতা দান করে। রস আর ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ রচনাকে রসময় করা আর তাতে ব্যক্তিত্বের স্পর্শ দান করা যাতে রচনাটি হয়ে ওঠে শুধু মধুর নয়, বিশিষ্ট।"[৭৭]

কাজী আব্দুল ওদুদ মনে করেন, সাহিত্য শুধু অনুভূতির প্রকাশ নয়, অনুভূতির সুপ্রকাশ-ক্ষেত্র। তাঁর মতে, সাহিত্য জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত।

> সাহিত্য জীবনের সংগে নিবিড়ভাবে যুক্ত। আবার তার থেকে এক হিসাবে স্বতন্ত্র।... জীবন থেকে সাহিত্যের জন্ম হলেও তার সংগে সাহিত্যের পার্থক্য এই যে, জীবনের মত অস্থির, অপূর্ণাঙ্গ ও মত পরিবর্তনশীল নয় বরং এই মত পরিবর্তনশীল জীবনের বুকে সে যেন এক অচঞ্চল স্বপ্ন, তা যত অল্পক্ষণের জন্যেই হোক।[৮]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমান আত্ম-আবিষ্কারে সচেষ্ট। এ-জন্যে সর্বত্রই উপযোগিতাবাদের বিজয়ী পতাকা উড্ডীন। প্রয়োজনের নিরিখেই মানবজীবনের কর্মপ্রক্রিয়া এবং শিল্প-সাহিত্যও তার বহির্ভূত নয়। সমাজের অশিক্ষা, কুসংস্কার, গোঁড়ামি বিদূরিত করার জন্যে সাহিত্যও অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সক্রিয় থেকেছে সমকালে। মুসলমানের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য রূপায়ণের মধ্য দিয়ে উজ্জীবিত জাতিগঠন ও সংস্কার মানসিকতা প্রায় সকল সাহিত্যিকের মধ্যেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি রক্ষার আন্দোলন হিসেবে সাহিত্য সমাজ সংস্কারের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে। সাহিত্য ব্যক্তি মানুষের শুদ্ধতার মধ্য দিয়ে শুদ্ধ জাতি-সমাজ গঠনে উৎসাহী। এজন্যে সাহিত্য বিলাস-কর্ম নয় ; সচেতনভাবে সমাজ-সংগঠনে সম্পৃক্ত হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। জীবনে অপূর্ণাঙ্গ, অসুন্দর রূপের সাক্ষাত পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাহিত্য সর্বদাই পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দরের চর্চা করবে এবং এ-চর্চার মধ্য দিয়েই সুস্থ সামাজিক দাবি পরিপূরণ সম্ভব।

তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা প্রেস, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৩, পৃ. ৩

২. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*, বাংলা একাডেমী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪, পৃ. ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

৩. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

৫. কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩, পৃ. ১২৫

৬. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৭. বিনয় ঘোষ, *বাঙলার নবজাগৃতি*, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃ. ১৮৮

৮. Nawab Abdul Lateef, *A short account of my humble efforts to promote Education, specially among the Mahamedans*, NBAL PP. 192-93

৯. The Indian Daily News, 1st March 1873 NBAL

১০. 'আধুনিক জনমতের উন্মেষ ও সাময়িক পত্রসাধনা', *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, রাজশাহী মিত্রসংখ্যা ১৯৬৮, পৃ. ৬৩

১১. গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, এ মুখার্জি এ্যাণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ ১৩৬০, পৃ. ৪

১২. ড. এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা-২, ১৯৫৭, পৃ. ২৭৩

১৩. *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১৪. Syed Amir Hossain, *A pamphlet on Mohamedan Education in Bengal*, Calcutta G.C. Bose & Co. 1880, PP. 20-24. দ্রষ্টব্য : মুসলিম সাহিত্যসমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম

১৫. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত পৃঃ-৫০

১৬. Sir Suruddra Nath Banerjee, *A Nation in Making*, 3rd impressiion, London Oxford University Press, 1927, P. 184

১৭. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১৮. শেখ হাবিবুর রহমান, *মুনসী মেহেরুল্লাহ*, কলিকাতা মুখদমী লাইব্রেরি, ১৯৩৪, পৃ. ৩২

১৯. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, 'মওলানা ইসলামাবাদী', মাহে নও, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ, পৃ. ২৫

২০. মুনীর চৌধুরী, *ইসমাইল হোসেন সিরাজী কয়েকটি জীবন* : ঢাকা, জাতীয় পুর্ণগঠন সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৬৬-৬৭

২১. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী*, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০, পৃ. ০১

২২. কাজী আব্দুল ওদুদ, *মানব মুকুট*, নব পর্যায়, কলিকাতা পবলিশিং হাউস, ১৩৩৩, পৃ. ২৫-২৭

২৩. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

২৪. আবুল হোসেন, 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা', *শিখা* ১ম বর্ষ ১৩৩৩

২৫. পূর্বোক্ত, *শিখা* ১ম বর্ষ, ১৩৩৩

২৬. কাজী আনোয়ারুল কাদির, বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ', *শিখা*, ১ম বর্ষ, ১৩৩৩

২৭. *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

২৮. *গো-জীবন*, মশাররফ রচনাসম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ. ৩১৬

২৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩১০

৩০. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, *শান্তিধারা*

৩১. *বেগম রোকেয়া রচনাবলী*, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

৩. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

৫. কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩, পৃ. ১২৫

৬. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৭. বিনয় ঘোষ, *বাঙলার নবজাগৃতি*, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃ. ১৮৮

৮. Nawab Abdul Lateef, *A short account of my humble efforts to promote Education, specially among the Mahamedans*, NBAL PP. 192-93

৯. The Indian Daily News, 1st March 1873 NBAL

১০. 'আধুনিক জনমতের উন্মেষ ও সাময়িক পত্রসাধনা', *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, রাজশাহী মিত্রসংখ্যা ১৯৬৮, পৃ. ৬৩

১১. গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, এ মুখার্জি এ্যাণ্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ ১৩৬০, পৃ. ৪

১২. ড. এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা-২, ১৯৫৭, পৃ. ২৭৩

১৩. *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজ চিন্তা ও সাহিত্য কর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১৪. Syed Amir Hossain, *A pamphlet on Mohamedan Education in Bengal*, Calcutta G.C. Bose & Co. 1880, PP. 20-24. দ্রষ্টব্য : মুসলিম সাহিত্যসমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম

১৫. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত পৃঃ-৫০

১৬. Sir Suruddra Nath Banerjee, *A Nation in Making*, 3rd impressiion, London Oxford University Press, 1927, P. 184

১৭. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

১৮. শেখ হাবিবুর রহমান, *মুনসী মেহেরুল্লাহ*, কলিকাতা মুখদমী লাইব্রেরি, ১৯৩৪, পৃ. ৩২

১৯. মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার, 'মওলানা ইসলামাবাদী', মাহে নও, ২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, মাঘ, পৃ. ২৫

২০. মুনীর চৌধুরী, *ইসমাইল হোসেন সিরাজী কয়েকটি জীবন* : ঢাকা, জাতীয় পুর্ণগঠন সংস্থা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১৬৬-৬৭

২১. খোন্দকার সিরাজুল হক, *মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী*, ঢাকা, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৭০, পৃ. ০১

২২. কাজী আব্দুল ওদুদ, *মানব মুকুট*, নব পর্যায়, কলিকাতা পবলিশিং হাউস, ১৩৩৩, পৃ. ২৫-২৭

২৩. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭

২৪. আবুল হোসেন, 'বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা', *শিখা* ১ম বর্ষ ১৩৩৩

২৫. পূর্বোক্ত, *শিখা* ১ম বর্ষ, ১৩৩৩

২৬. কাজী আনোয়ারুল কাদির, বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ', *শিখা*, ১ম বর্ষ, ১৩৩৩

২৭. *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজ চিন্তা ও সাহিত্যকর্ম*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

২৮. *গো-জীবন*, মশাররফ রচনাসম্ভার, কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ. ৩১৬

২৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩১০

৩০. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, *শান্তিধারা*

৩১. *বেগম রোকেয়া রচনাবলী*, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

৬০. 'বেগম রোকেয়া', *নবনূর*, ৩য় খণ্ড, ৯ম সংখ্যা, পৌষ ১৩১২, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী, (*বেগম রোকেয়া রচনাবলী*), পৃ. ২৩৬

৬১. 'রাজবন্দী', *নজরুল রচনাবলী* ১ম খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ৮৪ শান্তিনগর, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৯৬৬, পৃ. ৭২২

৬২. *নজরুল সাহিত্য*, সম্পাদনায় মীর আব্দুল হোসেন, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১ম প্রকাশ, ১৩৬৭, আহমদ শরীফ, 'নজরুল ইসলামের ধর্ম', পৃ. ৯৪

৬৩. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪

৬৪. কায়কোবাদ, *মহাশ্মশান কাব্য*, দ্বিতীয় সংস্করণের, ভূমিকা, ১৯১৭, পৃ.১

৬৮. *লুৎফর রহমান রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আব্দল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২, পৃঃ৩

৬৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, 'ধর্ম ও বিজ্ঞান', *নবনূর*, ভাদ্র, ১৩১২

৬৭. 'স্ত্রী জাতির অবনতি', *বেগম রোকেয়া রচনাবলী*, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ. ১৮

৬৮. কাজী ইমদাদুল হক, 'আমাদের শিক্ষা', *নবনূর*, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩১০

৬৯. কাজী আব্দুল ওদুদ, *বাংলার জাগরণ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

৭০. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৬, পৃ. ১৩৩-৩৬

৭১. *এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী*, আব্দুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৩৭০, পৃ. ৪১

৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৭৩. দ্রষ্টব্য 'সাহিত্য', *লুৎফর রহমান রচনাবলী*, পূর্বোক্ত

৭৪. দ্রষ্টব্য 'সাহিত্য', পূর্বোক্ত

৭৫. পূর্বোক্ত

৭৬. *কাজী আব্দুল ওদুদ রচনাবলী* ১ম খণ্ড, আবদুল হক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৪৫১

৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪

৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এস. ওয়াজেদ আলির প্রবন্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিপন্ন বিকৃত ও ক্ষয়িষ্ণু পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের সংক্রমণে বাংলা সাহিত্য যখন সমাজ ধর্ম এবং সত্তা বিচ্ছিন্নতায় আক্রান্ত; উচ্চারিত হচ্ছে ব্যক্তি অস্তিত্বের অভীপ্সা; ঘোষিত হচ্ছে বিবিধ অনাস্থার মেনিফেস্টো—এ পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যে এস. ওয়াজেদ আলির (১৮৯০-১৯৫১) আবির্ভাব। তিনি ছিলেন 'জীবনে Dynamic শ্রেণীর মানুষ' এবং সমকালীন আদর্শবিচ্যুত রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে সীমাবদ্ধ লক্ষ্যছিন্ন সাহিত্যকর্মে অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত। গতিশীল জীবনের প্রতীক এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্য সাধনা ছিল, মূলত বহমান সমাজ সভ্যতা ও আবেষ্টনী-অন্তর্গত উচ্চতর চৈতন্যমুখী মানবের জীবনসাধনা।[১]

লন্ডনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বার-এট-ল ডিগ্রি লাভের পর ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি বাল্য-অনুরাগ সত্ত্বেও বাংলায় লেখার অভ্যাস তাঁর ছিলো না। *সবুজপত্র* সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর উপদেশে প্রথম বাংলা লিখতে শুরু করেন। ১৯১৯ সালে *সবুজ পত্রে* তাঁর প্রথম বাংলা প্রবন্ধ 'অতীতের বোঝা' প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বহির্গত চাপই ক্রিয়াশীল ছিল। অথচ প্রথম লেখার এই ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী লেখক জীবনের যোগ অতি সামান্যই। ক্রমশ তিনি হয়ে উঠেন বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের কর্ণধার এবং ১৯২৫ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসমিতি'র সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আইনজীবী পরিচয়ের পরিবর্তে তাঁর সাহিত্যিক পরিচয়টিই প্রধান হয়ে ওঠে। পেশাগত পরিচয় তাঁর খ্যাতি ও অমরত্ব না দিলেও সাহিত্য প্রতিভা তাঁকে উপযুক্ত সামাজিক সর্যাদা ও মৃত্যু-উর্ধ্ব জীবন দান করেছে।

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের এই প্রাথমিক পর্বে স্বসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় শিক্ষা ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলি গভীরভাবে চিন্তা করেন। নিজ জ্ঞান-সীমাকে বিশ্ব পরিমণ্ডলে বিস্তৃত করে সম্প্রদায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি স্ব-সম্প্রদায়ের মঙ্গলচিন্তায় ব্যাপৃত হন। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয় লাভের ঘটনা আকস্মিক না হলেও অন্যের প্রবর্তনা সৃষ্ট। 'সবুজ পত্র' (১৯১৪) সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর উপদেশ এবং বন্ধু এস. খোদা বক্স ও সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণাতেই তিনি ইংরেজি ছেড়ে বাংলার চর্চা শুরু করেন। এস. ওয়াজেদ আলির সৃষ্টিশীল প্রতিভা হিসাবে আত্মপ্রকাশের নেপথ্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদানও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বলা যায়, তিনিই এস. ওয়াজেদ আলিকে ধরে পাকড়ে বাংলা লিখিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীরর মতো এস. ওয়াজেদ আলিরও খ্যাতি ও সিদ্ধি মূলত প্রবন্ধকার হিসাবে। প্রমথ চৌধুরীরর মতো স্বদেশ স্বজাতি ও নিজেস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-ধর্ম- সাহিত্য, শিল্প ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলিরও একটা নিজস্ব ধারণা ছিল। বর্তমানকে তিনি অস্বীকার করেন নি। আবার বৈদেশিক কোন

Dhaka University Institutional Repository

আদর্শ কিংবা কাঠামোর প্রতি তাঁর কোন প্রকার মোহান্ধ আকর্ষণ ছিল না। সচেতন প্রাবন্ধিক এস. ওয়াজেদ আলির *জীবনের শিল্প* (১৯৪১), *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* (১৯৪৩), *ভবিষ্যতের বাঙালী* (১৯৪৩), *সভ্যতা ও ইসলামের দান* (১৯৪৮), *আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা* (১৯৪৯), *ইবনে খালদুনের সমাজ বিজ্ঞান* (১৯৪৯) প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, ধর্ম, সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর পূর্ণাঙ্গ মতাদর্শের রূপটি সহজেই অনুধাবনযোগ্য।

সমাজচিন্তা

এস. ওয়াজেদ আলির সমাজ চিন্তা ছিল ধর্মীয় সংস্কারমুক্ত। সমাজ বলতে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজকেই বুঝিয়েছেন। হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে তিনি একতার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন। সমাজে রক্ষণশীলতাকে তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে, সে ধর্মের প্রশ্নেই হোক কিংবা দেশপ্রেমের ক্ষেত্রেই হোক। আজীবন তাঁর বক্তব্য ছিল: "গোঁড়া ধার্মিক প্রকৃত পক্ষে ধার্মিক নয়। সে হল ধর্মের একটা বিকৃত প্রতিচ্ছবি; ইংরেজিতে যাকে বলে Caricature। সে রকম গোঁড়া ভারতবাসী কিংবা গোঁড়া বাঙালিও প্রকৃত দেশপ্রেমিক নয়, সেও হল দেশপ্রেমিকের বিকৃত প্রতিকৃতি।"[২] এখানেই এস. ওয়াজেদ আলির জীবনদর্শনের বৃত্তবিন্দু হয়ে ওঠে চলিষ্ণু শ্রেয়বোধ পরিস্রুত মানব ধর্ম–মানববাদ: "আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। আমি ভারতবাসী বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ, আমি বাঙালি বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ।"[৩].

এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে সর্বদা মানবমুখী করার কথাই ভেবেছেন। মানবকল্যাণ ব্যতীত সাহিত্যের অন্য কোন লক্ষ্য থাকতে পারে এ বিশ্বাস তিনি করেন না। সমাজের জন্য বা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর এমন সাহিত্য রচনা থেকে বিরত থাকাকেই তিনি কর্তব্য বিবেচনা করেছেন। মানবহিতকেই তিনি সাহিত্যের লক্ষ্য হিসাবে সামনে রেখেছেন। সঙ্গত কারণেই তিনি সাহিত্যিকের কাঁধে চাপিয়েছেন আরও অনেক দায়িত্ব। তাঁর মতে, সাহিত্যিককে যেমন তাঁর নিজ সমাজের মানুষের মনকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তেমনি তাকে হতে হবে ভবিষ্যত দ্রষ্টাও। এ দুটি বিষয়ে কোন সাহিত্যিক দক্ষতার পরিচয় দিলে তার সাধনাও নিঃসন্দেহে সার্থক হয়ে উঠবে। আর এই সমগ্র বিষয়টিতে এস. ওয়াজেদ আলির দৃষ্টি সমাজকল্যাণের প্রতি নিবিষ্ট :

> সাহিত্যিকের কাজ হচ্ছে বেষ্টনীর দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করা, আর মানুষের মনের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সে সাহিত্যিকে রূপায়িত করা, অন্তর দৃষ্টির সাহায্যে সেই ছবিকে মনোহর রূপ দান করা। এই পথে চললেই সাহিত্যিকের সাধনা প্রকৃত সার্থকতা লাভ করবে। তবেই সমাজকে তিনি মঙ্গলময় ক্রমবিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারবেন। আজকাল এই দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতে গতানুগতিকভাবে পথ হচ্ছে ব্যর্থতার পথ, মৃত্যুর পথ। যে সাহিত্যিক ব্যর্থতা এড়াতে চান,

Dhaka University Institutional Repository

> মরণজয়ী সাধনা করতে চান, তাঁকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে নব সৃষ্টির কাজে আত্ম নিয়োগ করতে হবে।[৪]

এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যচিন্তায় সর্বত্রই ইতিহাস দৃষ্টির গভীরতা সহজলভ্য। সে কারণেই তিনি সাহিত্যিকের ঐকান্তিক সাধনার সঙ্গে জাতির কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নটিকে যথার্থভাবেই জড়িত করে ফেলেন। তাঁর মতে, মানবপ্রেমের এক মহান আদর্শ হবে সাহিত্যিকের চলার পথের পাথেয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঐক্যসাধন করে সমগ্র জাতিকে একটি সমন্বিত কল্যাণ পথে চালিত করা সাহিত্যিকের কর্তব্য। একটি সমাজের তথা জাতির মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে ওই জাতির শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভূমিকাই মুখ্য। সম্পূর্ণভাবে দলনিরপেক্ষ ও সম্প্রদায়-উর্ধ্ব মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়ে একজন সাহিত্যিক জাতি ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে এমন অবদান রাখবেন—যাতে আধুনিক যুগে মানুষ তাঁকে মধ্যযুগীয় ধর্ম প্রচারকের মতই শ্রদ্ধা করে। এ যুগের সাহিত্যিকগণকে এই গুরুদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এস. ওয়াজেদ আলি বলেন :

> প্রাচীনকালে ধর্ম প্রচারকেরা মানুষকে উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করতেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ দায়িত্ব সাহিত্যিকদের স্কন্ধে এসে পড়েছে। পূর্বে যে প্রেরণা মানুষ ধর্ম প্রচারকের কাছে পেতো, এখন সে প্রেরণা সে সাহিত্যিকের কাছে থেকে পায়। সাহিত্যের গুরুত্ব যেমন বেড়েছে, সাহিত্যিকের দায়িত্বও তেমনি বেড়েছে। ধর্ম প্রচারকেরা বিশেষ কোন ধর্মকে অবলম্বন করেই প্রচার কার্য চালান না। তারা প্রচার চালান সার্বজনীন রসধর্মকে আশ্রয় করে। সাহিত্যিক রূপকার, তাঁরা ভাবুক। মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্খা, মানুষের অন্তরের অন্তর্গত প্রেরণাকে রূপদান করাই তাদের কাজ। সুতরাং মানবতার ধর্মই সাহিত্যিকের স্বাভাবিক ধর্ম। এই মানবিক ধর্ম ও আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা রেখে সাধনা করলে, সাহিত্যিকেরা অবধারিত উদীয়মান জাতির এক মঙ্গলময় জীবনবেদী রচনা করতে পারবেন, এ আমার নিসংশয় প্রত্যয়।[৫]

সাহিত্যিককে এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে হলে তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে জাতির পথ প্রদর্শকের ভূমিকা। মানুষের মুক্তি পিপাসার আর্তিকে যদি তিনি তাঁর রচনায় শিল্পরূপ দিতে চান তাহলে জাতির স্বাধীনতার আকাঙক্ষার সঙ্গে অবশ্যই তাকে একাত্ম হতে হবে। এক্ষেত্রে সাহিত্যিকের মন যদি সম্প্রদায়-ভাবনার দ্বারা তাড়িত হয়, দৃষ্টি যদি হয় আচ্ছন্ন, তাহলে নিশ্চিতভাবে সমাজচিন্তা থেকে তিনি পিছিয়ে পড়বেন এবং স্বাভাবিকভাবে সমাজ ও জাতির স্বাধীন বিকাশের প্রশ্নটিকেও তিনি বড় করে দেখতে সক্ষম হবেন না। অতএব একজন সার্থক সাহিত্যিককে অবশ্যই সম্প্রদায় মানসিকতার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে সমাজ তথা জাতিভাবনাকে। সে জন্য দেশপ্রেম এবং স্বাতন্ত্র্যবোধের বিষয়টিও সাহিত্যিকের জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। মানবকল্যাণমুখী সাহিত্যের সেবক এস. ওয়াজেদ আলি ভারতবর্ষের সাহিত্য থেকে উদাহরণ উপস্থাপন করে দেখান যে সম্প্রদায়প্রীতি কিভাবে একজন মুসলিম সাহিত্যিককে দেশপ্রেম ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং পরিণতিতে তিনি সার্থকতার চূড়া স্পর্শ করতে অসফল হন। এস. ওয়াজেদ আলির ভাষায়:

> সাহিত্যিক হলো জাতির পথ প্রদর্শক– তার জীবন্ত জীবনের মুখপত্র এবং প্রতীক। সাহিত্যিক যখন মুক্তির বাণী প্রচার করে, তখনই তার লেখা থেকে জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ বের হয়, তার কথায় বৈদ্যুতিক

Dhaka University Institutional Repository

> শক্তি দেখা দেয়। উনবিংশ শতকে দুইজন ভারতীয় Sir Walter Scott অনুসৃত পথ অবলম্বন করে সাহিত্য সাধনা করেন। তাদের একজন হলেন বাঙালী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর একজন হলেন উর্দ্দু সাহিত্যিক আব্দুল হালিম শারর। প্রতিভা এবং সৃষ্টির দিক থেকে শারর বঙ্কিমের চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নন। পক্ষান্তরে শাররের লেখার মধ্যে যে উদারতা এবং সার্বভৌমিকতা পাওয়া যায়, বঙ্কিমের লেখায় তার অভাব একান্তভাবেই অনুভূত হয়। অথচ শাররের লেখার চেয়ে বঙ্কিমের লেখা দেশের জীবনে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে এবং এখনও করছে। এর কারণ হচ্ছে, বঙ্কিম ইংরাজী সাহিত্য থেকে Patriotism দেশপ্রেম জিনিসটাকে বাংলা সাহিত্যে আমদানী করেছিলেন, আর শারর তা করেন নি।[৬]

শাররের সাহিত্যে দেশপ্রেমের কেন অভাব তার কারণও অবশ্য এস. ওয়াজেদ আলি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, সামাজিক পরিস্থিতিই এর কারণ। যে অঞ্চলে তাঁর বাস, ওই অঞ্চলে শতকরা দশভাগের মতো লোক মুসলমান। ফলে মুসলমানেরা হিন্দু বিদ্বেষ থেকে দেশপ্রেমে অগ্রসর হয়ে দেশ শাসনের ভার হিন্দুদের ওপর ছেড়ে দিতে অনাগ্রহী। ফলে তাঁর সাহিত্যে দেশপ্রেমের অভাব। যে সময়ের উদাহরণ এস. ওয়াজেদ আলি উপস্থাপন করেছেন সে সময়ে ভারতবর্ষের মুসলিম সাহিত্যিকগণ উপরি উক্ত দেশপ্রেমের প্রশ্নে দ্বিধান্বিত। অথচ রেনেসাঁসের এক পরিপক্ব ফল হলো স্বাজাত্যবোধ এবং তা আধুনিকতারও নামান্তর। প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী একজন সাহিত্যিক, তিনি যে অঞ্চলেরই হোন না কেন, সেই দেশপ্রেমকে সংকীর্ণ সম্প্রদায় মানসিকতা দ্বারা উপেক্ষা করলে তার পরিণতি শুভ হয় না। এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন, এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকগণকে অবশ্যই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে যুগোপযোগী চেতনার সঙ্গে নিজেদের সংশ্লিষ্ট করতে হবে, অন্যথায় সার্থকতার চূড়াস্পর্শ সম্ভবপর নয়। এস. ওয়াজেদ আলি ছিলেন অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শের বিরোধী। স্মরণীয়, এ প্রবন্ধটি তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতির ভাষণ হিসাবে পাঠ করেন ১৯৩৯ সালে। তখনও 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপিত হয় নি। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর চিন্তা কত প্রাগ্রসর ও পরিণাম সঞ্চারী তা সহজেই বোধগম্য। তাছাড়া, এই আদর্শের মধ্যে তার সম্প্রদায় নিরপেক্ষ উদার মানসিকতাও গভীরভাবে ব্যক্ত হয়। বাংলাভাষী অঞ্চলের হিন্দু -মুসলমানের ঐকান্তিক নিবিড় বন্ধুত্ব তিনি কামনা করেন এবং কামনা করেন মনের উচ্চতা ও ঔদার্য। তবে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা কোনভাবেই ধর্মকে উপেক্ষা বা বিরোধিতা নয়। তাঁর মতে, সাহিত্যিককে সমাজের বিভিন্ন বিশেষত্বের দিকে লক্ষ রেখে উচ্চতর মানবতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। সাহিত্যিককে এরূপ দায়িত্ব পালন করতে হলে কেবল সমাজ জীবনের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলেই চলে না। সমাজ অভ্যন্তরে নানা ক্লেদ, গ্লানি, নানা অনাচার, কু-আচার, নানা দ্বন্দ্ব-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম ও তাকে চালাতে হয়। বৈষম্য জর্জর, ঔপনিবেশিক শক্তিশাসিত, দারিদ্র্যক্লিষ্ট একটি সমাজে সৎজীবনযাপন কিংবা সৎসৃষ্টির কাজটি কখনো অনায়াসে সাধ্য বা বিঘ্নমুক্ত নয়। পদে পদে বিভিন্ন বাধা তাকে অতিক্রম করতে হয়। একটি বড় বাধা এক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার। প্রচলিত ধারাকে উপেক্ষা করে নুতন চিন্তা, নতুন দৃষ্টি সমাজে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগকে সব সময় বাধাগ্রস্থ করে পশ্চাদপদ রক্ষণশীল মানসিকতা। সুতরাং সমাজে পথপ্রদর্শক হিসেবে বিবেচিত সাহিত্যিককে এসবের বিরুদ্ধে অর্থাৎ প্রাচীনপন্থা ও প্রথানুগত্যের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয় :

> ভাল সাহিত্য পড়তে হলে, সাহিত্যের সাহায্যে উচ্চতর মানুষ গড়তে হলে সমাজ জীবনেরও পাঠ করার প্রয়োজন। যে সব সংস্কার, যে সব সামাজিক অবস্থা, যে সব পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৎ সাহিত্যের সম্যক বিকাশের প্রতিকূলতা করে, সে সবের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করতে হবে, সে সবের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা কতে হবে, সে সবের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে হবে।[৭]

মানবকল্যাণধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য বাংলাভাষী এই অঞ্চলে কী কী বাধা রয়েছে তার ও একটি বিবরণ দিয়েছেন এস. ওয়াজেদ আলি। তাঁর মতে, বাঙালি মুসলমানের জীবনে হীনতাসূচক মনোবৃত্তি এমন গভীরভাবে মূলীভূত হয়ে আছে যে, তা বাঙালির উন্নতি বা বিকাশের পথে এক কঠিনতর বাধা। সাহিত্যিককে এই মানসিকতা দূর করার ব্যাপারে গবেষণা ও লেখনীর মাধ্যমে তৎপর হতে হবে। এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যিকের কাছ থেকে দাবি করেন অতিশয় জীবনঘনিষ্ঠ মানসিকতার। জীবনের সকলপ্রান্ত—তাঁর ধর্ম, তাঁর সংস্কৃতি, তাঁর জাতিসত্তা, তাঁর প্রাত্যহিক জীবনাচরণ থেকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সবকিছু সাহিত্যের অন্বিষ্ট হবে। তা হলেই একজনের পক্ষে সততার সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে মানবের ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন সম্ভবপর হবে।

ভাষাপ্রশ্নেও তাঁর বাস্তববুদ্ধি ও কল্যাণচেতনার স্ফুরণ লক্ষ করা যায়। ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় বঙ্গে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় এক জাতিসত্তার অধীন। উভয় সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু পাশাপাশি এ কথাও ঠিক, ধর্মীয় কারণে, এই দুই সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন ব্যবহার্য ভাষার মধ্যে অনেক পার্থক্যও সৃষ্টি হয়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থ, ধর্মীয় স্বীকৃতি প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়-সম্পর্ক এই ভিন্নতার সূচনা করেছে। বাংলা মাতৃভাষার উত্তরাধিকার সত্ত্বেও এই ভিন্নতার বিষয়টিও গুরুত্বহীন নয়। এস. ওয়াজেদ আলি এই উভয় বাস্তবতাকে স্বীকার করে অগ্রসর হওয়ার পক্ষপাতি। সে কারণে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের ভাষা সম্পর্কিত এই বাস্তবতাকে মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। তার মতে :

> বাঙলা হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা। বাঙ্গলাতেই আমাদের জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। অন্য কোন ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করলে সে চেষ্টা নিশ্চয়ই বিফল হবে। তবে একথা ভুললেও চলবে না যে এখন পর্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা এবং সাহিত্য হিন্দু সমাজের অঙ্কেই প্রতিপালিত হয়েছে এবং হিন্দু ধর্মের মানসিক এবং নৈতিক অমৃতেই পরিপুষ্ট হয়েছে। আমাদের ধর্ম্মের এবং সমাজের উপযোগী করবার জন্য এ ভাষাকে আমাদের দরকার মতো অনেকটা গড়ে নিতে হবে। এখন থেকে এ বিষয়ে theorise করে কিন্তু বিশেষ কোন লাভ নাই। ভাষা ভবিষ্যৎ তার্কিকের তর্কের উপর নির্ভর করবে না। সাহিত্যিকের সাধনার উপরেই নির্ভর করবে। আমি কেবল অপনাদের এই কথা বলতে চাই যে, ভাষাকে যে জাতীয় ছাঁচে ঢালবার দরকার আছে, সে কথা আপনারা ভুলবেন না। আর এই মূল কথাটি মনে রেখে যদি আপনারা আপনাদের সাহিত্যিক Instinct এর অনুসরণ করেন তা হলেই যথেষ্ট হবে।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি হিন্দু সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত ভাষা থেকে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন হবে। ১৯২৫ সালে যখন তিনি উপরি উক্ত প্রবন্ধটি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসমিতি'র বার্ষিক অধিবেশনে পাঠ করেন, তখন পর্যন্ত মুসলমান সাহিত্যিকদের ওই ভাষা গড়ে ওঠেনি। তিনি ওই ভাষার অভাব বোধ করেছেন এবং এ কারণেই তা সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন মুসলমানদের প্রতি। মুসলমান সাহিত্যিকদের ব্যবহারের জন্য ভাষার একটি জাতীয় কাঠামো নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও তিনি উপলব্ধি করেছেন। স্মরণীয় যে, এক্ষেত্রে তিনি মোটেই সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতার দ্বারা চালিত হন নি। তিনি মোটেই ভুলে যান না যে, তিনি বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত। তবে ভাষার প্রশ্নে, বিশেষত সাহিত্যসৃষ্টির উপযোগী ভাষার প্রশ্নে, এস. ওয়াজেদ আলির চিন্তাসূত্র আরো গভীরে প্রোথিত। এ ক্ষেত্রেও তিনি জনতার বোধগম্যতা ও জনতার কল্যাণাদর্শের প্রশ্নটিকে সর্বাগ্রে স্থান দেন। তিনি মনে করেন সাহিত্যের ভাষা হবে সহজ-সরল ও ব্যাপক জনগণের নিকট সুখপাঠ্য:

> আজকাল হিন্দু লেখকেরা সংস্কৃতবহুল সমাসাদিপূর্ণ পদের ব্যবহার ত্যাগ করে সোজাসুজি চলিত বাঙ্গালাতেই সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন। আমাদের সাধারণ মুসলমান লেখকেরা কিন্তু ভাষাকে জটিল করে তোলাকে এই Democratic যুগেও সাহিত্য শিল্পের চূড়ান্ত নিদর্শন বলে মনে করেন। এই কুনীতির অনুসরণ করাতে তাঁদের অনেকের লেখার মধ্যে একটা প্রাণহীন আড়ষ্টতা দেখতে পাওয়া যায়, যা সাহিত্যের পক্ষে প্রকৃতই মারাত্মক। আশা করি তাঁরা শরৎচন্দ্র প্রভৃতি লেখকদের অনুসরণ করে ভাষাকে যতদুর সম্ভব সরল এবং স্বচ্ছ করে তুলবার চেষ্টা করবেন। এতে তাঁদের ভারের মধ্যে প্রাঞ্জলতা আসবে, আর তাঁদের ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটে উঠবে।[৯]

ভাষাকে অহেতুক জটিল করে তোলা সুনীতির পরিচয় নয় বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। ভাষাকে জটিল করলে ভাষা নিস্প্রাণ ও গতিহীন হয়ে পরে। এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন ভাষাকে সজীব প্রাণবন্ত ও গতিময় করে তুলতে হলে সহজ সরল ভাষার আশ্রয় নিতে হবে। ভাষার প্রশ্নে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের একটি সমস্যার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎকালীন সমাজে যারা প্রতিষ্ঠিত পুরুষ, আর্থিক দিক থেকে সচ্ছল এবং নানা কারণে সমাজে নেতৃস্থানীয় তাদের ভাষা এবং সাধারণ মানুষের ভাষা এক ছিল না। উভয়ের ভাষা উভয়ের কাছে ছিল দুর্বোধ্য। ভাষা প্রশ্নে সমাজের একই সম্প্রদায়ভুক্ত দুটি অংশের মধ্যে এই যে ব্যবধান তা ওই সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে শুভ ফল বয়ে আনতে পারে না— এটাই এস. ওয়াজেদ আলির বিশ্বাস করতেন এবং এ ক্ষেত্রে সমাধান হিসাবে সহজবোধ্য ভাষা চর্চার ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন।

> আমাদের নেতারা বাংলা জানেন না, আর সাধারণ মুসলমানেরা উর্দু কিংবা ইংরেজি জানে না। তারা যা বলেন সাধারণ লোকে তা বুঝে না এবং সাধারণ লোকে যা বলে বা ভাবে তাঁরা তা বুঝেন না তাঁদের মধ্যে আর সাধারণ মুসলমান সমাজের মধ্যে ভাবের বিনিময় নাই, কোন আন্তরিক সম্বন্ধ নাই। ফলে আমাদের নেতারা আজ ফৌজহীন সর্দার হয়ে দাঁড়িয়েছেন, আর আমাদের জনসাধারণ সর্দারহীন ফৌজে পরিণত হয়েছে। এরূপ সমাজের ভবিষ্যৎ যে, বিপদসঙকূল তাতে কার সন্দেহ থাকতে পারে?

Dhaka University Institutional Repository

> এই ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হলে আমাদের ছোট বড় সকলকেই মনোযোগের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষার চর্চা করতে হবে। বাঙ্গলা সাহিত্যের আদর করতে হবে আর সংবাদপত্রের প্রচলনের জন্য দৃঢ়সংকল্প হয়ে লাগতে হবে। এই নীতির অনুসরণ করলে আমাদের সাহিত্যিকরাও উৎসাহিত হবেন, আর তখন তাঁদের আবেগময় চেষ্টায় আমাদের সমাজ অল্পকালের মধ্যেই সাহিত্য সম্বন্ধে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। বাঙ্গলার মুসলমান তখন উন্নতির সোপানে স্থির হয়ে দাড়াতে পারবে।[১০]

সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্য এস. ওয়াজেদ আলি নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুর মঙ্গলামঙ্গল, সুখ-দুঃখ, স্বভাব-চরিত্র এবং স্বাস্থ্য যেমন তার মায়ের উপর নির্ভর করে তেমন আর কারো উপর করে না। জন্মের পর থেকে শিশুর জীবন তার মার ওপরই নির্ভর করে। মা শিশু পালনে অজ্ঞ হলে ছেলের নানারূপ অসুখ-বিসুখ হয় এবং এর ফল তাকে সারা জীবন ধরে ভোগ করতে হয়। মায়ের কাছ থেকেই শিশু তার নীতি ও ধর্ম শিক্ষা করে। আর মায়ের আদর্শই তার জীবনের আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। "সুতরাং মা-ই হচ্ছেন সমাজ সৌধের প্রধান শিল্পী। কাজটা যে কীরূপ দায়িত্বপূর্ণ সেটা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, আর এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ যার হাতে, তাকে এই কাজের সর্বরূপে উপযুক্ত করা আমাদের সামাজিক আত্মরক্ষার জন্যে একান্ত আবশ্যক।"[১১] নারীদের এ কাজের উপযুক্ত করতে এস. ওয়াজেদ আলি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর লক্ষ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, নারীর সুস্বাস্থ্যের উপরও সমাজের মঙ্গল নির্ভর করে।

> জাতীয় স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দরকার মেয়েদের Hygiene (স্বাস্থ্য) সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী মোটামুটিরূপে শিক্ষা দেওয়া। এই শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হলে সমাজ যে কত রকম অসুখ বিসুখের হাত থেকে বাঁচতে পারে তা বলে শেষ করা যায় না। আমাদের দেশে যত মারাত্মক ব্যাধি আছে, সেগুলির সবই প্রায় সংক্রামক। আর সামান্য চেষ্টা করলে তাদের যে দূরে ঠেলে রাখা যায়-এ কথাও ঠিক।... মেয়েদের Hygiene সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মানো দরকার। প্রত্যেক পাঠশালায় এবং বালিকা বিদ্যালয়ে এসব বিষয়ে শিক্ষার সুব্যবস্থা হওয়া উচিত।[১২]

এস. ওয়াজেদ আলির মতে নারীর সামাজিক মর্যাদার উপর সমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। পুরুষ ও নারীর শিক্ষার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকার উপরও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর যে সম্বন্ধ তা কতকটা প্রেমের ওপর, কতকটা স্বার্থের ওপর আর কতকটা সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহ-প্রবণতার উপর সংস্থাপিত। পরস্পরের জ্ঞান, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, আদর্শের একত্ব এবং উভয়ের সমতার উপরই সম্পদের সার্বিক কল্যাণ নিহিত বলে এস. ওয়াজেদ আলি বিশ্বাস করতেন। "স্ত্রী যদি প্রথম শতাব্দীর সংস্কারে পরিপূর্ণ হয়, আর পুরুষের মন যদি বিংশ শতাব্দীর ভাব সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে মনের মিল অন্তত সখ্যভাবে সংস্থাপিত হওয়া কঠিন। সাহিত্য শিক্ষা দু'জনকে অনেকটা একই ভাবের দিতে হবে। তবে ব্যবসায়িক শিক্ষার কথা স্বতন্ত্র। মেয়েদের কেবল ধর্ম কথা শেখালে চলবে না; তাদের নতুন জ্ঞানের মধ্যেও প্রবেশ করাতে হবে।"[১৩]

সমাজের অবরোধ প্রথার কঠোরতা নারীকে সামাজিক সুখ থেকে বঞ্চিত করেছে। সমাজের কল্যাণে অবরোধ প্রথা তুলে দেয়ার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন। নারীরা সৌন্দর্যপ্রিয়। তাদের এই

Dhaka University Institutional Repository

সুকুমার বৃত্তিকে বিকশিত করতে পারলে সমাজ সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। সৌন্দর্য উপভোগের শক্তি তাদের পুরুষের চেয়ে কম নয়। সামাজিক জীবন পুরুষের ন্যায় তাদেরও কাম্য। "এই রক্তমাংস, ক্ষুধা, বাসনা আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-প্রেরণা বিশিষ্ট নারীকে খাঁচার মধ্যে, সে খাঁচা সোনারই হোক, আর যারই হোক, বন্ধ করে রাখলে চলবে না। এই সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা পৃথিবী কেবল নরেরই উপভোগ্য নয়, নারীরও উপভোগ্য। এ অধিকার তাদের জন্মগত। এ থেকে তাদের বঞ্চিত করে রাখবার অধিকার আমাদের নাই। আমাদের বর্তমান এই সমাজপ্রথা পাশবিক বলের উপর, অন্ধ স্বার্থের উপর এবং পুরোহিতদের ভণ্ডামীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রথাকে আমরা যতদিন দেশ থেকে তাড়াতে না পারবো, ততদিন আমাদের মুখে সাম্যের কথা এবং স্বাধীনতার কথা বিড়ালের মুখে তপস্যার কথার মতই ঘৃণ্য এবং অশোভন।"[১৪]

মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলাই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। এস. ওয়াজেদ আলির মতে যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে গড়ে তুলতে পারে না, সে সমাজ কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। যে শিক্ষা মানুষের মনে ভাল মন্দের বিচারের ক্ষমতা জাগায় না, সে শিক্ষা সমাজ ও জাতির জন্যে মঙ্গলজনক নয়। সে সমাজে শিক্ষা মনের মধ্যে জ্ঞানের বাতি জ্বালাতে পারে না, সৌন্দর্যের বোধ জাগায় না এবং যে শিক্ষা মানুষের মনে মনুষ্যত্বের ফুল ফোটাতে পারে না, সে শিক্ষা কখনো সমাজের সার্বিক কল্যাণ করতে পারে না।

> শিক্ষার চরম ও মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা। ছেলেদের মনের মধ্যে কেবল তথ্যের বোঝা চাপিয়ে দিলে চলবে না, তাকে নীতির অনুশীলন করাতে এবং শেখাতে হবে। ছেলের মনে ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতা জাগিয়ে দেওয়া দরকার; তার চেয়ে বেশী দরকার, তার মনে ন্যায়ের নির্দেশ মত চলবার এবং কাজ করবার ক্ষমতা সৃষ্টি করার।[১৫]

এস. ওয়াজেদ আলির মতে মানুষের চরিত্র ও আচরণই সমাজকে বড় করে তোলে এবং জাতিকে গৌরবান্বিত করে। সমাজের মঙ্গলের জন্যে এস. ওয়াজেদ আলি ধর্ম শিক্ষার বিরোধিতা করেন নি। তবে গোঁড়ামিকে দূরে রেখে তিনি ধর্ম শিক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন। ধর্মে যে নীতির অংশটুকু আছে তার উপরই তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে সব ধর্মই এক মহাধর্মের রূপান্তর। ধর্মের সেই মহান ভাবকে জাগিয়ে তুলতে পারলেই সমাজ সুখ-শান্তিতে ভরে উঠবে।

এস. ওয়াজেদ আলি সামাজিক উন্নতিকল্পে তরুণ সমাজকে তাদের স্বভাব-ধর্মের অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। তরুণেরা স্বাভাবিক প্রেরণায় চলতে পারলেই সমাজ মঙ্গলের পথে এগিয়ে যায়। সমাজের কল্যাণের জন্যে তরুণদের সুকুমার প্রয়াসগুলিকে সমর্থন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। যে সমাজের প্রবীণেরা তরুণদের যুব সুলভ ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করে না সে সমাজ উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। প্রবীণদের প্রবীণজনোচিত গাম্ভীর্য ও তাদের অযৌক্তিক মনোবৃত্তি সমাজের কোন মঙ্গল আনতে পারে না এবং মঙ্গলময় ক্রমবিকাশের পথেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। "সমাজের তরুণদের উদ্যম, উৎসাহ এবং কর্মপ্রেরণার অভাবের বিষয়ে দুঃখ প্রকাশ করা আর পর সমাজের তরুণদের মধ্যে এ সব গুণের প্রাচুর্য দেখে নিরাশায় অভিভূত হওয়া আমাদের একটা বাতিক

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা কি একবার ভেবে দেখি যে, তরুণদের এই কর্ম্মবিমুখতার জন্য আমরাই মুখ্যত দায়ী।"[১৬] সমাজে তরুণদের কর্মবিমুখতার জন্যে লেখক প্রবীণদের দায়ি করেছেন। তরুণেরা তাদের তাজা প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণায় কোন না কোন কার্যের সঙ্গে জড়িত। সমাজের প্রবীণেরা যদি তাদের প্রতি সহানুভূতি না দেখিয়ে তাদের কর্মপ্রয়াস ব্যর্থ করে দেয় তা হলে সমাজে অমঙ্গল নেমে আসবে। জোর করে তরুণদেরকে প্রবীণদের নির্দেশিত পথে চালালে সমাজ-পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে ব্যর্থ হবে এবং সমাজে দুর্দশা নেমে আসবে।

তরুণদের আমাদের মত চলতে বলা, আর এক বছরের শিশুকে অশিতিপর বৃদ্ধের মত পরলোকের চিন্তায় মশগুল থাকতে বলা, ঠিক একই কথা। এ ধরনের কথায় আর কোন ফল হয় না; কেবল আমাদের বুদ্ধিহীনতা আর কল্পনার দৈন্যই সুপ্রকট হয়ে উঠে!... তরুণদের আমরা যদি তাদের তাজা প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণার অনুসরণ করতে দিই, তাহলে তাদের উদ্যামহীনতার জন্য আমাদের আর হা হুতাশ করতে হবে না। দু'দিনেই দেখতে পাবো-তাদের জীবন নানা কাজের মধ্যে, নানা উদ্যমের মধ্যে, নানা আনন্দের মধ্যে, নানা উপলব্ধির মধ্যে, নিত্য নূতন বিচিত্রতার সঙ্গে ফুটে উঠছে। তাদের জীবনের অসাড়তা তখন আমাদেরকে আর নৈরাশ্যে অভিভূত করবে না; তাদের চঞ্চল কর্মঠ মূর্ত্তি সমস্ত অবসাদ আমাদের মন থেকে দূর করে দেবে, আর আমাদের প্রাণে নূতন আশার, নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করবে।[১৭]

মানুষ সামাজিক জীব। সে শুধু খেয়ে পরেই বাঁচতে চায় না। তার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যও থাকে। মানুষের জীবন পরিণত হয় সমাজে, অন্য কোথাও নয়। এস. ওয়াজেদ আলির মতে সভ্যতা আমাদের সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমাজ না তা থাকলে কখনো সম্ভবপর হতো না। "আমাদের আত্ম প্রকাশের প্রধান উপায় ভাষা। এই ভাষাই হল আমাদের সভ্যতার ভিত্তিপাথর। ভাষার সাহায্যেই আমরা প্রাণিজগতে এত উচ্চস্থান অধিকার করেছি। ভাষা না থাকলে এখনও আমরা বাঁদর হনুমানের মত গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াতাম। আমাদের আর উচ্চশ্রেণীর জন্তুদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতো না। এই মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি কি সামাজিক জীবন না থাকলে সম্ভবপর হতো?"[১৮]

এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন, তরুণরাই সমাজের আশা-ভরসা। তরুণদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষের উপর সমাজের ভবিষ্যৎ একান্তভাবে নির্ভর করে। তাঁর বিশ্বাস সমাজ না থাকলে দয়া-মায়া সহানুভূতি, বিনয় ও সৎসাহস প্রভৃতি গুণাবলির প্রকাশ হতো না। সমাজের ঘাত প্রতিঘাতেই ব্যক্তির সদগুণরাজির বিকাশ হয়। ব্যক্তির এই শক্তি বিকাশের আর কোন পথ নেই। মানব জীবনের উৎকর্ষের জন্যে এবং ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের জন্যে সমাজের প্রয়োজন। সমাজ না থাকলে মঙ্গলময় ক্রমবিকাশের পথে এগিয়ে যেতে পারতো না। এস. ওয়াজেদ আলির মতে মঙ্গলময় অনুভূতিই সমাজের কল্যাণ বয়ে আনে। সমাজকে প্রাণের গভীরে ভাল না বাসলে সমাজ কল্যাণের পথে, মঙ্গলের পথে এগিয়ে যেতে পারে না।

সমাজের মঙ্গলকে সব কাজের, সব অনুষ্ঠানের কষ্ঠিপাথর রূপে ব্যবহার করাই হচ্ছে সমাজপ্রীতি। যে কাজের সামাজিক মূল্য আছে, সেই কাজই সমাজপ্রেমিকের পক্ষে বৈধ, আর যে কাজ সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

পক্ষে অনিষ্টকর তাই তার কাছে অবৈধ। এই সমাজ মঙ্গলের মাপকাঠি Criterion দিয়ে পরখ করলে অনেক প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানকে বর্জন করতে হবে, আর এমন অনেক বৈদেশিক আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করতে হবে, যাদের নামও এখন আমরা শুনতে নারাজ। প্রকৃত সমাজপ্রেমিক কিন্তু তার কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হবে না। কেননা, সমাজের মঙ্গলই হচ্ছে তার একমাত্র লক্ষ্য, আর সেই মহামঙ্গলের জন্য সে সব করতে প্রস্তুত।[১৯]

এস. ওয়াজেদ আলি সমাজের গতানুগতিক ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন একমাত্র শিক্ষাই শুধু পারে সমাজকে পরিবর্তন করতে। সমাজে শুধু পুরুষকে শিক্ষিত করলেই সমাজ শিক্ষিত হয় না। সমাজে নারীকেও উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে না পারলে জগত ও জীবন সম্পর্কে তার কোন গভীর ধারণা হবে না। তাঁর মতে সমাজসেবাই ধর্মসাধনের একমাত্র পথ। যে সমাজ পরিশ্রমী সেই সমাজই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকে। এস. ওয়াজেদ আলি সমাজে প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে চেয়েছেন। তাঁর ধারণা প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন। সামাজিক পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা শিক্ষার অনুকূল হলে সেই সমাজেই প্রতিভার বিকাশ হয়। প্রায় একশ বছর আগে আমাদের দেশে বাঙালি হিন্দুর প্রতিভা যেভাবে বিকাশ লাভ করেছে বাঙালি মুসলমানের প্রতিভা সেভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে নি। তাঁর মতে যে সমাজে স্বাধীনতা নেই সে সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হতে পারে না এবং উন্নত সামাজিক জীবনও সেখানে গড়ে ওঠে না। "যে সমাজে কর্মের স্বাধীনতা নেই, সে সমাজের কোন উন্নতি নেই। কর্মের স্বাধীনতাই হচ্ছে সমাজ ও জাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। ব্যক্তি চিন্তা এবং কর্মের স্বাধীনতাই হচ্ছে জাতির সর্বাধিক উন্নতির শ্রেষ্ঠতম উপায়। যে সমাজে সে স্বাধীনতা নাই, সেখানে জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের বিকাশ হতে পারে না, সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হতে পারে না। উন্নত সমৃদ্ধ সামাজিক জীবনও সেখানে সম্ভবপর নয়।"[২০] পরিবর্তিত সমাজের সাথে মুসলমানেরা তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি বলেই তারা হিন্দুদের মতো উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি এবং সামাজিক অগ্রগতিকেও তারা ধরে রাখতে পারে নি। তাঁর ধারণা পাশ্চাত্য সমাজের উন্নতির প্রধান কারণ হচ্ছে নারীর স্বাধীনতা। নারীকে গৃহবন্দি রেখে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে নি। তাই এস. ওয়াজেদ আলি সমাজের মঙ্গলের জন্যে পর্দা প্রথা বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। "পর্দ্দা প্রথার একটা মারাত্মক দোষ হচ্ছে সে প্রথা জাতির মধ্যে Physical degeneracy আনে, জাতিকে প্রাণী হিসাবে দুর্বল করে দেয়। ফলে জাতি সৌন্দর্যের হিসাবে, স্বাস্থ্যের হিসাবে, চরিত্রের হিসাবে, ধী শক্তির হিসাবে নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে নামতে থাকে। সুতরাং জাতির মঙ্গলের জন্য এই পর্দ্দা প্রথা বর্জ্জন ছাড়া আমাদের উপায়ন্তর নাই।"[২১] ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১) ও বেগম রোকেয়াও (১৮৮০-১৯৩২) নারী জাতির স্বাধীনতা কামনা করেছেন। নারী জাতিকে ঘরে আটকে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বেগম রোকেয়াও মুসলিম নারীসমাজে 'বোরকা' পরার কঠোর সমালোচনা করেছেন। মুসলমান পরিবারে অবরোধের নামে নারীর ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব কতটা খাটো করা হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর *অবরোধবাসিনী* (১৯৩০) গ্রন্থে।

Dhaka University Institutional Repository

বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীসমাজের স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। অবরোধ প্রথায় নারীর স্বাধীনতা থাকে না, পর্দা প্রথা নারীকে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে নিতে পারে না, ঘোমটা ফেলে তাই তিন মুসলিম নারীসমাজকে জ্ঞানের পথে, মুক্তির পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু এস. ওয়াজেদ আলি সমাজে পর্দা প্রথার বিরোধিতা করে বেগম রোকেয়ার চেয়ে প্রাগ্রসর চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর মতে, পর্দা প্রথা জাতিকে দুর্বল করে দেয়। সমাজ ও জাতির সার্বিক মঙ্গলের জন্যে তাই তিনি পর্দা প্রথা বর্জনের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি এখানে বেগম রোকেয়ার মতো কেবল মুসলিম নারীজাতির মুক্তির কথা বলেন নি। তিনি সমগ্র মানবজাতির সার্বিক মঙ্গলের কথা বলেছেন। এখানে এস. ওয়াজেদ আলির চিন্তা যুগোত্তর মহিমা লাভ করেছে। পরিবর্তনশীল সমাজের সাথে তাল রেখে তিনি বিকাশমান জীবনকে গ্রহণ করার কথা বলেছেন। এক কথায়, যে পথে জগত চলছে সেই পথেই আমাদের উন্নতির চাবিকাঠি।

এস. ওয়াজেদ আলির মতে যে সমাজ মাতৃভাষার চর্চা করে না, সে সমাজ উন্নত হয় না এবং সে জাতি পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তাঁর ধারণা বাংলার মুসলমানেরা বাংলা ভাষার চর্চা করে নি বলেই তারা আজ পিছিয়ে রয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি অবহেলা ও অবজ্ঞাই এর প্রধান কারণ। এ অবহেলা ও অবজ্ঞা সমাজে যতদিন থাকবে ততদিন সমাজের কোন উন্নতি হবে না। তাঁর বিশ্বাস সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিহিত থাকে সাহিত্য সাধনার মধ্যে। সমাজ ও জাতির কল্যাণও সাহিত্য সাধনার ওপর নির্ভরশীল। "আপনারা যদি সমাজের কল্যাণ চান, সন্তান-সন্ততির কল্যাণ চান, আর মুসলমান জাতির কল্যাণ চান, তাহলে একাগ্র মনে সাহিত্যের প্রচারে আত্মনিয়োগ করুন। মুসলমান যুবকদের সামনে তাদের ধর্মের এবং তাদের নিজস্ব সভ্যতার জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রকাশ করুন, তাদের গৌরবময় ইতিহাসের কাহিনী তাদের শ্রবণে ধ্বনিত করুন, তাদের পূর্ব পুরুষদের কীর্তি তাদের চোখের সামনে সাহিত্যের তুলিকায় প্রস্ফুটিত করে তুলুন। দেখবেন তাদের মনের বিকার দূর হয়ে যাবে, তারা আর অসাড় থাকবে না। তাদের কর্ম জীবনের দ্রুত স্পন্দন তখন জগতকে মোহিত ও চমৎকৃত করবে।"[২২]

ধর্মচিন্তা

এস. ওয়াজেদ আলি বিশ্বাস করতেন সমাজসেবাই হচ্ছে ধর্মসাধনের একমাত্র পথ। তাঁর অভিমত, অতীত হচ্ছে মানবসভ্যতার শৈশব। অতীতকে ভালবাসা যায়, কিন্তু তার নিকট অবনত ও অবরুদ্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। জীবনসংগ্রামে যে জাতি নিত্য কালোপযোগী প্রথার উদ্ভাবন করতে পারে সে জাতিই টিকে যায়। অন্যেরা লোপ পায়। তাঁর মতে ধর্মকে প্রত্যেক যুগে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। নব নব সমস্যার নব নব সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে নবযুগের আশার সঙ্গে, আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে তাকে সংযোজিত করে দিতে হবে। তা যদি করতে না পারা যায়, তাহলে ধর্ম কতকগুলি

Dhaka University Institutional Repository

অর্থহীন বিধি নিষেধের তালিকায় পর্যবশিত হবে। এ কারণে সমাজ সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধর্মনিরপেক্ষ জাতি ও রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে, এস. ওয়াজেদ আলি নির্দ্বন্দ্ব সুস্থির :

> ভারতীয় পক্ষে– তথা বাঙালীদের পক্ষে, ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই একমাত্র সম্ভবপর এবং বাঞ্ছনীয় আদর্শ।... ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ সম্মুখে রেখেই আমাদের জীবন-পথে অগ্রসর হতে হবে।
>
> তবে দার্শনিক তত্ত্বের দিক থেকে এ কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ইসলাম রাষ্ট্রের উন্নতির পথে, রাষ্ট্রের নিজস্ব আদর্শের উপলব্ধির পথে, কোন বিঘ্নের সৃষ্টি করে না।[২৩]

একদা ধর্মকেই মনে করা হতো একমাত্র আত্মিক মুক্তি এবং সামাজিক বন্ধনের উপায় হিসেবে, ফলে শিক্ষা ছিল ধর্মশিক্ষার নামান্তর। ধর্ম ব্যতীত সমাজ ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু উনিশ শতকের পর থেকে মানব মনস্তত্বে ধর্ম নবতর তাৎপর্যে ধরা দেয়। "এখন সেদিন আর নেই। এখন জীবনের প্রত্যেক খুটি-নাটি কাজে লোকে ধর্ম বিধানের অনুসন্ধান করে না। নিজেদের ব্যক্তিগত এবং অভিজ্ঞতার দ্বারাই তারা জীবনকে পরিচালিত করবার চেষ্টা করে।"[২৪]

এস. ওয়াজেদ আলি ধর্মের বাইরে আচার-অনুষ্ঠানের চেয়ে তার অর্ন্তর্নিহিত সত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যারা ধর্মের বহিরঙ্গ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য দেখতে পায় না। আল্লা-রসূলের নাম সর্বদাই তাদের মুখে থাকে কিন্তু তার আদর্শের কথা কখনো ভাবে না। ইসলাম ধর্মের অমূল্য আদর্শকে তারা মুসলমান সমাজের আদর্শরূপে দেখে এবং ইসলামকে তারা মুসলমানের ধর্মরূপে দেখে। কিন্তু ইসলামকে তারা বিশ্বমানবের ধর্মরূপে দেখে না এবং আরব দেশকেই তারা মুসলমানের তীর্থ বলে মনে করে; অন্তরের চিরন্তন আরব দেশকে তারা মানুষের তীর্থরূপে গ্রহণ করে না। ইসলামের দেহটাকেই তারা বড় করে দেখে, তার অন্তরকে ও অন্তর্নিহিত সত্য তারা দেখতে পায় না। এস. ওয়াজেদ আলি কখনো ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে পছন্দ করেন নি। তাঁর ধর্মচিন্তা ছিল গোঁড়ামিমুক্ত। মানব কল্যাণ ও সমাজ সেবাকেই তিনি ধর্ম সাধনের একমাত্র পথ বলে মনে করেন। গোঁড়ামি দূরে রেখে তিনি ধর্ম শিক্ষা দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আজীবন তাঁর বক্তব্য ছিল:

> গোঁড়া ধার্মিক প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক নয়, সে হল ধর্মের একটি বিকৃত প্রতিচ্ছবি। ইংরেজিতে যাকে বলে Caricature। সে রকম গোঁড়া ভারতবাসী কিংবা গোঁড়া বাঙালীও প্রকৃত দেশপ্রেমিক নয়। সেও হল দেশপ্রেমের একটা বিকৃত প্রতিকৃতি।[২৫]

তাঁর মতে সব ধর্ম এক মহাধর্মেরই রূপান্তর। মানুষ যখন চিরন্তন আত্মা ও অন্তরের উৎস অস্বীকার করে আচার এবং অনুষ্ঠানের কাছে আত্মসমর্পন করে, হৃদয়ের নিষেধকে অবহেলা করে ধর্মের আক্ষরিক ও বৈয়াকরণিক অর্থের আলোচনায় যেতে চায় তখনই ধর্মে আসে গ্লানি। মানুষকে এসব বাইরের জিনিসকে ছেড়ে নিজের অন্তরে ফিরে যেতে হবে। কেননা মানুষের অন্তরই হলো সৃষ্টিকর্তার আশ্রয়স্থল। তাঁর বিশ্বাস ধর্মের সঙ্গে গোঁড়ামির সম্পর্ক বিদ্যমান। গোঁড়ামিকে দূরে রেখে তিনি ধর্ম শিক্ষার পরামর্শ দিয়েছেন। ধর্মকে প্রত্যেক যুগে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। নবযুগের আশার সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

নিবিড়ভাবে ধর্মকে তিনি সংযোজিত করতে চেয়েছেন। তা না হলে ধর্ম কতকগুলি অর্থহীন বিধিনিষেধের তালিকায় পর্যবশিত হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন ব্যক্তিগত সাধনার উপরই ধর্মের সমৃদ্ধি। ধর্মে যে নীতির অংশটুকু আছে তারই উপর বিশেষ করে জোর দিতে হবে। মানবের একতা সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মে যে নানারূপ কথা উপকথা আছে, সেগুলিকে উচ্চারণ ও অনুশীলনে আনতে হবে। জাতি এবং শ্রেণী বিভেদ যে বাহ্যিক মাত্র, সেই সত্য সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের বুঝিয়ে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করছেন এস. ওয়াজেদ আলি এবং সব ধর্মই যে, এক মহাধর্মের রূপান্তর, সেই মহান ভাবকে তাদের অন্তরে স্পষ্টভাবে জাগিয়ে দিতে তিনি সচেষ্ট।

> ... ছেলেদের তোতা পাখির মত বই আওড়াতে শেখালেই চলবে না। তাদের মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। তাদের হিন্দু কিম্বা মুসলমান বানালেও চলবে না, তাদের Indian (হিন্দুস্থানী) করে তুলতে হবে, বাঙ্গালী করে তলতে হবে। স্বদেশভক্তি, স্বজাতিপ্রীতি তাদের মনের মধ্যে সজাগ করে দিতে হবে। আর এই জাতি এবং দেশের পথ বেয়ে বিশ্বপ্রেমের দিকে তাদের মনকে নিয়ে যেতে হবে। তাদের শেখাতে হবে যে, মানব প্রেমই হচ্ছে সব ধর্মের সার, আর মানবের সেবাই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত।[২৬]

এস. ওয়াজেদ আলির সমকালে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্বাচিত কিছু প্রবণতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু ধর্মকে তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র শর্ত বলে মানেন নি। তাঁর মতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়। তিনি নিজেই ব্যক্তিগতভাবে গভীর ধর্মবিশ্বাসকে নিজের অন্তর্মূলে বহন করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি স্মরণীয় :

> ধর্মে আমি একান্তভাবে আস্থা রাখি, আর ধর্মকে আমি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলেই মনে করি। তবে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের কোন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। নিছক ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার উপরই ধর্মের পূর্তি ও পুষ্টি বলা যায়।[২৭]

এস. ওয়াজেদ আলির মতে প্রকৃত ধর্মের ভিত্তি হলো ত্যাগ, সংযম আর পবিত্রতা। তিনি বিশ্বাস করেন ধর্মে যেমন শাশ্বত সত্য আছে তেমনি এমন অনেক জিনিস আছে, যাকে আপেক্ষিক সত্য (Realative truth) বলা যেতে পারে। "ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়— যারা প্রকৃত ধার্মিক, তাঁরা ধর্মের শাশ্বত অংশের উপরেই ধর্মসাধন ভিত্তি স্থাপন করেন; আর ধর্মের আপেক্ষিক অংশগুলিকে যুগ এবং স্থাপনোযোগী ক'রে নিবার চেষ্টা করেন। পক্ষান্তরে, যাঁরা ধর্মের প্রকৃত আদর্শের সঙ্গে সংস্রব রাখেন না, অথচ ধর্মকে উপলক্ষ্য করে ধর্মতের আদর্শের অনুসরণ করতে চান, তাঁরা ধর্মের শাশ্বত এবং চিরন্তন আদর্শগুলিকে বর্জ্জন করেন এবং তার আপেক্ষিক অংশগুলিকে অবলম্বন করে প্রকৃত ধার্মিক ও সত্যসাধকের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করেন।"[২৮]

এস. ওয়াজেদ আলির মতে, আনুষ্ঠানিক ধর্ম অতীতমুখী। আনুষ্ঠানিক ধর্ম মানুষকে অতীতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অতীত জগতে ফিরে যাবার জন্যে তাকে আহ্বান করে। আনুষ্ঠানিক ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিলে প্রগতির সর্ববিধ পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। আনুষ্ঠানিক ধর্মই মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করে এবং মানুষের উন্নতির প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেয়। "আনুষ্ঠানিক ধর্মের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, তার প্রকৃতি হল মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করা, মানুষকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বিভক্ত করা এবং সেই গণ্ডীগুলিকে ধর্মের আকার দিয়ে চিরস্থায়ী করে তোলা। পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্ম এই পথে গিয়েছে। ফলে সর্বত্র এমন এক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে, মানুষের পক্ষে ব্যাপকভাবে একত্রে কোন কাজ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মিলনের সর্বজনমান্য কোন আদর্শ কায়েম করতে আনুষ্ঠানিক ধর্ম কোথাও সমর্থ হয় নি।"[২৯] ধর্মের সংরক্ষণের জন্যে এস. ওয়াজেদ আলি উপযুক্ত আলেম সমাজের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধর্ম শিক্ষকের মধ্যে শিক্ষার, জ্ঞানের এবং চরিত্রের দৈন্য দেখা দিলে সমাজে অরাজকতার সৃষ্টি হয়। অযোগ্য আলেমদের দরুন ধর্ম রসাতলে যায়। এর প্রতিকারের উপায় হিসাবে তিনি ধর্ম যাজকদের ভণ্ডামি বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

ধর্ম্ম তখনই বিপন্ন হয়, যখন ধর্ম্মযাজকেরা এবং প্রচারকেরা মুখে নীতিকথা, সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব ধরনের নীতিকথা প্রচার করেন; আর প্রকৃত জীবনে সাধারণ সংসারী লোকের চেয়ে হীনতর নীতির অনুসরণ করেন। ধর্ম জীবনের এই যে বিকৃতি সাধারণ ভাষায় একে ভণ্ডামি বলা হয়। এই ভণ্ডামীর দরুণই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ফরাসী বিপ্লবের সময় ক্ষীপ্ত হয়েছিল এবং অশেষ লাঞ্ছনার সঙ্গে ধর্ম্মকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। ধর্ম্ম যাজকদের ভণ্ডামীর জন্যই রাশিয়ার সোভিয়েতবাদীরা ধর্ম্মকে লাঞ্ছিত করে দেশ থেকে তাড়িয়েছে এবং NO God (খোদা নাই) নামক অদ্ভুত আন্দোলনের সৃষ্টি করছে। ধর্ম্ম যাজকদের ভণ্ডামীর জন্যই কামাল পাশা প্রমুখ নব্য তুর্কেরা ধর্ম্ম যাজকদের উপর কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন এবং পীর মোর্শেদ প্রভৃতিকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিলেন। আমাদের দেশের একদল তরুণের মধ্যে যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, তারও প্রধান কারণ হচ্ছে ধর্ম্মযাজক এবং প্রচারকদের ভণ্ডামী। সময়ে যদি এর প্রতিকার না করা যায়, তাহলে ইসলাম যে একদিন ভারতবর্ষে বিপন্ন হয়ে পড়বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মুসলিম জাতির অস্তিত্বটাই যে বিপন্ন হয়ে পড়বে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই।"[৩০]

এস. ওয়াজেদ আলির মতে ধর্ম সাধনার অর্থই হচ্ছে মানবের কল্যাণসাধন। মানবের সেবাই ধর্ম সাধনার প্রকৃষ্টতম পথ। ধর্ম প্রকৃতপক্ষে মানুষের সেবা ছাড়া আর কিছুই নয়। তসবিহ্ গণনা, আর জায়নামাজে বসে প্রার্থনা করাকে প্রকৃত ধর্ম বলে গণ্য করা যায় না। ধর্মের ভান করাকে এস. ওয়াজেদ আলি পছন্দ করেন নি। ধর্মের জন্য ত্যাগ স্বীকার করাই হলো প্রকৃত মানুষের কাজ। "প্রকৃত পক্ষে জনসেবাই হচ্ছে ইসলামের অন্তর্নিহিত আদর্শ।... ... বিশ্ববাসীর সেবা ছাড়া ধর্ম্ম আর কিছুই নয়। পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রার্থনা করাকে ধর্ম্ম বলে না। আল্লার উপর বিশ্বাস করা, পরলোকের উপর বিশ্বাস করা, আর খোদার প্রেমের প্রেরণায় নিজের ধন সম্পত্তি দরিদ্র আত্মীয় স্বজন, অনাথ বালক-বালিকা নিঃস্ব-দুঃস্থজন এবং রাহি মোসাফেরদের মঙ্গলের জন্য এবং দাস-দাসীর মুক্তির জন্য ব্যয় করার নামই হচ্ছে ধর্ম্ম।"[৩১] তাঁর মতে ধর্মকে প্রত্যেক যুগে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে। নবযুগের আশার সঙ্গে নিবিড়ভাবে তাকে সংযোজিত করে দিতে হবে। তা যদি করতে না পারা যায় তা হলে ধর্ম কতকগুলো অর্থহীন বিধি নিষেধের তালিকায় পর্যবশিত হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিগত সাধনার উপর ধর্মের সমৃদ্ধি। এ প্রসঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলি বলেন :

> রাজ্যের সংরক্ষণের জন্য যেসব রাজকর্মচারীদের প্রয়োজন, ধর্মের সংরক্ষণের জন্যও তেমনি উপযুক্ত ধর্মযাজকদের, উপযুক্ত আলেম সমাজের প্রয়োজন। রাজকর্মচারীদের মধ্যে যদি শিক্ষার, জ্ঞানের এবং চরিত্রের দৈন্য এসে উপস্থিত হয়, তাহলে যেমন রাজ্যের মধ্যে অরাজকতা দেখা দেয়, তেমনি ধর্ম শিক্ষকদের মধ্যে যদি শিক্ষার, জ্ঞানের এবং চরিত্রের দৈন্য এসে উপস্থিত হয়, তাহলে সমাজেও অরাজকতা এসে দেখা দেয়। অযোগ্য রাজকর্মচারীদের দরুণ রাজ্য রসাতলে যায়; অযোগ্য আলেমদের দরুণ ধর্মও রসাতলে যায়।[৩২]

এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন অযোগ্য রাজকর্মচারী হলে যেমন রাজ্য ধরে রাখা যায় না, তেমনি অযোগ্য আলেম হলেও ধর্ম নষ্ট হয়ে বিকৃত হয়। তাই তিনি সমাজের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ধর্মের প্রতি, খোদার প্রতি এবং সমাজের প্রতি অন্তরের ভালবাসা জাগিয়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন এবং এই ভালবাসাকে কর্মের পথে সাধনার পথে ও সেবার পথে চালিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। আলেম সমাজ কোরানের শিক্ষাকে এবং রসুলের আদর্শকে তাদের জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেন না। তাঁরা ধর্ম সাধক রূপে উপদেশ না দিয়ে ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে যে উপদেশ দেন, যে কথা বলেন তা তাঁদের নিজেদের জীবনে তাঁরা প্রয়োগ করেন না। স্বাধীনভাবে জীবিকা লাভের চেষ্টা না করে তারা ধর্ম প্রচারকেই জীবিকা লাভের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেন। এস. ওয়াজেদ আলি আলেম সমাজের এই মনোভাব পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়েছেন। আলেম সমাজ এই পরাশ্রয়ী মনোভাব পরিবর্তন না করলে অদূর ভবিষ্যতে আলেমদের প্রভাব সমাজ থেকে বিলুপ্ত হবে। আলেম সমাজকে তিনি পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জন করার এবং জ্ঞান সাধনা করে ধর্ম প্রচারের পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে ধর্ম তখনই বিপন্ন হয়, যখন ধর্মযাজকেরা মুখে নীতিকথা প্রচার করেন, কিন্তু যা তারা বলেন তা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করেন না। তাঁদের কথার সাথে কাজের কোন মিল নেই। ধর্ম জীবনে তাদের এই বিবৃতিকে তিনি 'ভণ্ডামী' বলে অভিহিত করেছেন। এস. ওয়াজেদ আলি ধর্মের অন্তঃসত্যকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাই তিনি ধর্মের শাশ্বত অংশের উপরই ধর্ম সাধনের ভিত্তি স্থাপন করার পরামর্শ দেন। তাঁর মতে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও সাধনার ওপরই ধর্ম পূর্ণতা লাভ করে।

> ধর্মের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্যকে জনসাধারণ সহজে বুঝতে পারে না। সে বিষয়ে সাধারণত তারা মনে ভ্রান্ত ধারণাই পোষণ করে থাকে। সে সব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ধর্মের শাশ্বত সত্যের দিকে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করেন, তারা তাঁদের ধর্মের শত্রু মনে করে লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত করে। আর যে সব সংকীর্ণমনা স্বার্থসেবী তাদের কুসংস্কারে প্রশ্রয় দেয়, তাদের তারা ধর্মের এক একটি ধুরন্ধর মনে করে, প্রকৃত ধর্মাত্মাদের লাঞ্ছনায় তাদেরই নির্দেশ এবং ইঙ্গিতের অনুসরণ করে।[৩৩]

এস. ওয়াজেদ আলির মতে আনুষ্ঠানিক ধর্মের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। তাই আনুষ্ঠানিক ধর্ম সার্বজনীন কোন আদর্শ কায়েম করতে পারে নি। তিনি আচার নিষ্ঠ

Dhaka University Institutional Repository

ধার্মিককে পছন্দ করেন নি। তিন মনে করেন যারা শুধু ধর্মের বাহ্যিক নিয়ম পালন করে তারা প্রকৃত ধার্মিক নয়। গোঁড়া ধার্মিক সম্পর্কে তার বক্তব্য :

> গোঁড়া ধার্মিকের প্রাণ কিন্তু পাথরের মত কঠিন। তার উপর মাটি ফেলে, সার ছড়িয়ে ছোট ছোট গাছ জন্মান যায় বটে, কিন্তু কোন ছায়ালো গাছ সেখানে শিকড় গাড়তে পারে না।[৩৪]

তাঁর মতে ধর্মবাদীরা জীবনকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পায় না। তারা জীবনের একটা বিশেষ অংশের প্রযোজনীয়তা অনুভব করে। অশিক্ষিত ও অনুসৃত সমাজে ভণ্ড ধর্ম-ব্যবসায়ীদের প্রভাব খুব বেশি। ধর্ম ব্যবসায়ীরা জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী। তাই ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্যে তিনি শিক্ষিত ও বিবেকবান মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধর্মের জন্যে সাধনা করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম এবাদত। এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন মানুষের যেমন রাষ্ট্র না হলে চলে না, তেমনি ধর্ম না হলেও চলে না। রাষ্ট্রের কারবার হলো মানুষের নশ্বর জীবনকে নিয়ে। আর ধর্মের কারবার হলো তার অবিনশ্বর জীবনকে নিয়ে। চিরন্তন আত্মাকে নিয়ে মানুষের স্রষ্টাকে নিয়ে এবং সত্যকে নিয়ে। এস. ওয়াজেদ আলি সর্বপ্রকার রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে ছিলেন বলেই মানবধর্মকে সবচেয়ে বড় বলে মনে করেছেন। তাই তিনি বিশ্বাস করতেন-সমাজ ও জাতির সেবাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ধর্মসাধনের একমাত্র পথ।

জাতিভাবনা

স্বদেশ, স্বজাতি ও নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলির একটি নিজস্ব ধারণা বিদ্যমান ছিলো। বর্তমানকে তিনি অস্বীকার করেন নি, আবার বৈদেশিক কোন আদর্শ কিংবা কাঠামোর প্রতিও তাঁর কোন প্রকার মোহজাত আকর্ষণ ছিল না। ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ঐতিহ্যই ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস, আর সেই ঐতিহ্যে শিকড়সঞ্চারী ও বাস্তবতার নিরিখে প্রয়োজনীয় বিদেশি ধন সংগ্রহের মাধ্যমেই তিনি তাঁর জাতিসত্তা নির্মাণ করতে চেয়েছেন। এস. ওয়াজেদ আলির জাতি বিষয়ক ধারণা তাই বায়বীয় কিংবা কোন কৃতঋণ অবকাঠামোর পুনঃনির্মাণের প্রেরণা সম্ভূত নয়। জাতি গঠন সম্পর্কে কোন নতুন ধারণা প্রবর্তন না করলেও তাঁর জাতি বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা ছিল আধুনিক ও প্রাগ্রসর এবং এর মাধ্যমে এস. ওয়াজেদ আলির বিশ্বপ্রসারী সচেতনতা ও অধ্যয়নের পরিচয়ই উৎকীর্ণ হয়েছে।

এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন ব্যক্তিগত চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতাই হচ্ছে জাতির উন্নতির একমাত্র পথ। যে সমাজে সে স্বাধীনতা নেই, সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ হয় না এবং উন্নত সামাজিক জীবনও সেখানে গড়ে ওঠে না। আজীবন তাঁর বিশ্বাস ছিল, যা সত্য তা চিরকালই সত্য। জাতি যখন সত্যের অনুসরণ করে তখন সে বড় হয়। আর যখন সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয় তখন তার পতন ঘটে। জাতির জীবনে উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হলে সমাজ জীবনে কখনো সুখশান্তি আসতে পারে না। ন্যায় এবং সত্যের উপরই জাতির জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাঁর বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে এক অবিরাম জীবন সংগ্রাম চলছে। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন এ সংগ্রাম চলবে এবং সংগ্রাম থেমে গেলে জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। জাতিকে টিকে থাকার জন্যে অবিরাম জীবন সংগ্রাম তাই অনিবার্য। অনিবার্য জীবন সংগ্রামের ফলেই মানুষের বুদ্ধি বাড়ে, শক্তি ও সংহতি বাড়ে। বিপদের মধ্যেই জাতি বড় হয়, তাঁর জীবনের বিকাশ হয় এবং শক্তির স্ফুরণ ঘটে। যে জাতির মধ্যে জীবন সংগ্রাম নেই, সে জাতি পরাধীন হতে বাধ্য। যে জাতি আত্মরক্ষার জন্যে সাধনা করে না, সে জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণশীল জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। "যে জাতির জন্য সংগ্রাম শেষ হয়, যে জাতি পরাধীন হয়, যে জাতির জীবন -মরণ পরের উপর নির্ভর করে, যে জাতির আত্মরক্ষার জন্য সাধনার প্রয়োজন হয় না, সে জাতি দ্রুত নিম্নপথগামী হয়।"[৩৫]

এস. ওয়াজেদ আলির ধারণা পরাধীন জাতির মধ্যে স্বাধীনতার আগ্রহ দেখা দিলে জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে স্বাধীন জাতির গুণাবলি বিকাশ হতে থাকে এবং জেগে ওঠে ত্যাগের মহিমা। এস. ওয়াজেদ আলি ছিলেন বাঙালি জাতিসত্তায় বিশ্বাসী। তাঁর মধ্যে ছিল আধুনিককালের জাতীয়তাবাদী চেতনা। তাঁর জাতীয়তাবোধ জাতিকে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ কিংবা বৈদেশিক—কোন বিষয়েই হস্তক্ষেপ করতে শেখায় না। এ আদর্শ জাতিকে সচেতন করে তোলে। তাঁর জাতীয়তাবোধের একটা ভৌগোলিক রূপ আছে। রাষ্ট্রের পরিধির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। জাতীয়তাবোধের এই ভৌগোলিক পরিচয় উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

> দেশপ্রেম বললে দেশের প্রতি প্রেম, কোনখানে তার সীমানা, কোনটা বিদেশ, দেশের মানুষ কারা, কারা প্রতিবেশী, কারা প্রতিবেশী নয়, এই সব প্রয়োজনীয় বিষয়ের সুস্পষ্ট ধারণা মানুষের মনে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে, আর তার ভাব ও অনুভূতিকে বিশেষ একটা রূপ দিতে, তার প্রয়াসকে সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।[৩৬]

এস. ওয়াজেদ আলির জাতীয়তাবাদী চেতনা কয়েকটি লক্ষ্যে নিবেদিত। তাঁর জাতীয়তাবাদ সাধনার এবং বৈধতার ও অবৈধতার সহজবোধ্য এবং প্রমাণ সাপেক্ষ একটা মানকাঠি (Standard) আদর্শ নাগরিকদের সামনে তুলে ধরে। ফলে তাদের মধ্যে বিচারবোধের সৃষ্টি হয়। তখন তারা দেশের কল্যাণ ও অকল্যাণ, মঙ্গল ও অমঙ্গল, কারা দেশের উপকার করেছে, কারা দেশের অনিষ্ট করছে— সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ও বাস্তবনিষ্ঠ ধারণা লাভ করে। জাতীয়তাবোধ আধুনিক বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার চর্চায় নাগরিকদের উৎসাহী করে। ফলে তাদের সৃষ্টিশীলতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রকৃত অর্থেই অনুধাবন করতে পারে যে, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার ব্যতীত জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হয় না। আর সেই বিকাশ ও অগ্রগতি অর্জিত হলে অধিবাসীদের পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তখন মানুষ ধর্মে বিশ্বাস করে কি করে না, দেবতাদের বিষয়ে কি কি ধারণা মনে পোষণ করে, পরকাল বিশ্বাস করে কিনা, সে চিন্তাকে প্রাধান্য দেয় না। এস. ওয়াজেদ আলির জাতীয়তাবোধ জনসমিতিকে বিভেদের পথে নিয়ে না গিয়ে ঐক্যের এবং সম্প্রীতির পথে নিয়ে যায়। তাই যে সব বিষয়ে মতভেদের সম্ভাবনা অল্প এবং যে সব বিষয়ে মতদ্বৈধতার সম্ভাবনা আছে- এমন সব বিষয়ে ঐক্য স্থাপন করে। "এই জাতীয়তার আদর্শ মানুষের সর্ববিধ সামবায়িক

Dhaka University Institutional Repository

সাধনার প্রসস্ততম ক্ষেত্রের সন্ধান দেয় বলে এ পথে মানুষ সহেজেই দেশপ্রেমিকের সহযোগিতা লাভ করতে পারে এবং সাধনাকে সার্থক করে তুলতে পারে।"[৩৭] তাঁর জাতীয়তাবাদের আদর্শ মানুষের দৃষ্টিকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে। অতীতের আনুগত্য তখন তার দৃষ্টিকে অন্ধ এবং তার সাধনাকে পঙ্গু করে না। জাতির মঙ্গল চিন্তা ও ভবিষ্যত ভাবনা তখন বিজ্ঞান বোধ দ্বারাই পরিচালিত হয়। জাতীয়তাবোধ মানুষকে তার নিজের কর্মের সামাজিক মূল্য অনুধাবনে সাহায্য করে। এ প্রসঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলি বলেন :

> তাঁর কাজ থেকে সমাজের উপকার হবে কিনা, কতটা উপকার হবে, তার কাজে অনিষ্টের আশঙকা আছে কি না, তার কাজে ইষ্টের সম্ভাবনা বেশী, কি অনিষ্টের আশংকা বেশী, এসব বিষয় জাতীয়তার আদর্শ থেকে বিচার করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এবং মতের ঐক্যস্থাপন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ।[৩৮]

এস. ওয়াজেদ আলির জাতীয়তাবোধ নাগরিকদের মধ্যে বিচারবোধের সৃষ্টি করে। ফলে তারা ভালমন্দের ধারণা লাভ করে। জাতীয়তাবোধের "আদর্শ সেবার এবং সাধনার নিত্য নূতন পথে যেতে মানুষকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করে। দেশের মঙ্গল যখন আদর্শ, তখন কিসে সে মঙ্গল সাধন করা যেতে পারে, সে দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, অন্য কোন অবান্তর কথা ভাবার তার সময় থাকে না এবং সেই মঙ্গল সাধনের জন্য মানুষ স্বাভাবিকভাবেই নিত্য নতুন পথে অগ্রসর হয়। কেন না, সে বোঝে যে, অতীতের অভিজ্ঞতার উপর নূতন পন্থা প্রাচীন পন্থার চেয়ে ভাল। প্রাচীন পন্থীদের মতামত, সমর্থন বা অসমর্থন তার সহজ বুদ্ধিকে বিকৃত কিংবা লক্ষ্যভ্রষ্ট করে না।"[৩৯]

এস. ওয়াজেদ আলি বিশ্বাস করতেন জাতীয়তাবোধ আধুনিক বিজ্ঞান ও মানব বিদ্যার চর্চায় নাগরিকদের উৎসাহিত করে। ফলে তাদের সৃষ্টিশীলতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। তারা প্রকৃত অর্থেই অনুধাবন করতে পারে যে, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নতি সাধিত হয় না। আর সেই বিকাশ ও অগ্রগতি অর্জিত হলে অধিবাসীদের পরস্পর শ্রদ্ধাবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং তার জাতীয়তাবোধ তাকে ঐক্যের পথে নিয়ে যায়। আর এ পথেই মানুষ দেশপ্রেমিকের সহযোগিতা লাভ করতে পারে এবং তার সাধনাকে সার্থক করে তুলতে পারে। এস. ওয়াজেদ আলির জাতীয়তাবাদের আদর্শ মানুষের দৃষ্টিকে ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত করে। জাতির মঙ্গল চিন্তা ও ভবিষ্যতের ভাবনা তখন বিজ্ঞান বোধ দ্বারাই পরিচালিত হয়। জাতীয়তাবোধ মানুষকে তার নিজের কর্মের সামাজিক মূল্য অনুধাবনে সাহায্য করে। এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে একতার মধ্য দিয়ে। একতার বন্ধনই জাতিকে শক্তিশালী করে তোলে। তাঁর বিশ্বাস, যে জাতির জীবনে বৈচিত্র্য নেই, সে জাতির জীবনে একতা আসে না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিয়েই জাতির জীবন বিকশিত হয় এবং তাদের অবলম্বন করেই জাতি আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। জাতীয় একতার জন্যে তাই তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

> দশজনের সম্মিলিত শক্তি একজনের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী। সেই জন্য যে সব জাতি মিলিত ভাবে কাজ করতে পারে, তাদের শক্তি যে সব জাতি মিলিতভাবে কাজ করতে পারে না, তাদের চেয়ে অনেক বেশী। এই জন্য জাতীয় শক্তির সম্যক বিকাশের জন্য আমাদের মধ্যে অসংখ্য সংঘের

Dhaka University Institutional Repository

এবং অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন; যেখানে মিলিতভাবে কাজ করতে আমরা অভ্যস্ত হতে পারি। এতে আমাদের শক্তি বাড়বে।[৪০]

এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন যে জাতি প্রকৃতির ওপর যত বেশি আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে, সে জাতি তত সভ্য। প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের নামই হচ্ছে সভ্যতা। তাঁর মতে, দাসত্ব সভ্যতার ভিত্তি নয়। যে সমাজে দাসত্ব আছে তার জীবনে বর্বরতার বীজও আছে। দাসত্বের মাধ্যমে সমাজে সভ্যতা আসে না। প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও কালচার থাকলেও তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু মুসলমানকে একটি জাতিতে পরিণত করতে। তিনি বিশ্বাস করতেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা আনতে পারলেই যথাসময়ে তারা একটি জাতিতে পরিণত হবে। জীবন সংগ্রামে যে জাতি সামনে এগিয়ে যেতে পারে সে জাতিই টিকে থাকে। মানুষের মধ্যে আছে বিশ্বজনীন সত্তা। আর এই বিশ্বজনীন সত্তা মানুষের মধ্যে আছে বলেই এক জাতির মানুষ অন্য জাতির মানুষের ভাব ও ভাষা বুঝতে পারে।

রাষ্ট্রচিন্তা

এস. ওয়াজেদ আলির রাষ্ট্র বিষয়ক প্রবন্ধগুলিতে কোন নতুন রাষ্ট্রদর্শন প্রকাশ না পেলেও তাঁর রাষ্ট্রবিষয়ক চিন্তা আধুনিক ও প্রাগ্রসর। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে চারটি উপাদান– নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসাধারণ, সরকার ও সার্বভৌমত্বের সমবায়ে এবং জনসাধারণের পরস্পর নির্ভরশীলতা ও সুহমর্মিতার মাধ্যমে। এস. ওয়াজেদ আলি সম্ভবত রাষ্ট্রের এই সংগঠন বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নন, একজন সাহিত্যপ্রাণ সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব। ফলে তাঁর রাষ্ট্র সাধনার মধ্যে কোথাও উপরি কিংবা অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপিত হয় নি। তিনি তাঁর অন্তর্গত সংবেদনা, মানবপ্রেম ও স্বাদেশিকতা বোধ দ্বারাই পরিচালিত হয়েছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে আত্মীয়তা। অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রগঠনের জন্যে অঙ্গীকারবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত না হলে আধুনিক কোন রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে না। কিন্তু সেই চেতনায় ও অবস্থায় উন্নীত হবার জন্যে আবার রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে সুগভীর ঐক্যচেতনা আবশ্যক। একতাবোধের পরিচয়, তার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে এস. ওয়াজেদ আলি চারটি ঐক্যের কথা বলেছেন। এগুলি হচ্ছে: (১) কৃষ্টিগত ঐক্য, (২) ভাষামূলক ঐক্য, (৩) স্বার্থসম্বন্ধীয় ঐক্য এবং (৪) আদর্শমূলক ঐক্য। এ বিবেচনায় তিনি ধর্মীয় ঐক্যেরও উল্লেখ করেছেন। কেননা, আধুনিক অধিকাংশ রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। কিন্তু তারা অভিন্ন জাতি, একই রাষ্ট্রীয় সত্তার পরিচয়ে। তাই শুধু ধর্মগত ঐক্য রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র শর্ত হতে পারে না। এস. ওয়াজেদ আলি এ সত্য অনুধাবন করেছিলেন এবং এ বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত উচ্চারণেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। "রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে আত্মীয়তা। একই গোত্রের লোককে নিয়ে সুদূর কোন অতীত যুগে মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন আরম্ভ হয়েছিল। গোত্রপ্রীতির প্রভাব এখনও প্রত্যেক রাষ্ট্রে গভীরভাবে অনুভূত হয়। তবে গোত্রীয় ঐক্য এখন আর রাষ্ট্রীয় জীবনে অপরিহার্য নয়। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি উন্নতশীল রাষ্ট্রে

Dhaka University Institutional Repository

কোনরূপ গোত্রীয় ঐক্য নাই। বর্তমান যুগে ধর্মগত ঐক্যেরও প্রয়োজন দেখা যায় না।"[৪১] তাঁর মতে পূর্বোক্ত ঐক্যগুলির সঙ্গে "ভৌগোলিক ঐক্যের বন্ধন জুড়ে দিলেই একটি আধুনিক জাতির সৃষ্টি হয়।"[৪২]

রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এস. ওয়াজেদ আলি রাষ্ট্রের সুরক্ষা ব্যবস্তা, রাষ্ট্রের অন্তর্বিপ্লব, রাষ্ট্রের ভাঙন ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যচেতনার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সুরক্ষা এর মানচিত্র। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের কথা ভাবলেই দেখা যায় যে, ভৌগোলিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই রাষ্ট্রগুলি স্থাপিত হয়েছে। সেনাবাহিনীর তুলনায় প্রকৃতিই উৎকৃষ্ট ভাবে রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। এ প্রসঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলি ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। "ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে সহজেই বোধগম্য হয় যে, আকারে বড় হলেও, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে প্রকৃতিদেবী একটি অখণ্ড দেশ করেই সৃষ্টি করেছেন। আত্মরক্ষামূলক সীমান্তের কথা তুললেই আমাদর দৃষ্টি পড়ে খাইবার গিরিবর্তের দিকে, হিমালয়ের অভ্রভেদী প্রাকার শ্রেণীর দিকে, আসামের দুর্গম পার্বত্য ভূমির দিকে, আর দক্ষিণের অন্তহীন সমুদ্রের দিকে। এই সবই হ'ল প্রকৃতি রচিত সেই আত্মরক্ষার কৌশল যাদের দরুণ ভাতরবর্ষ এশীয় মহাদেশের অন্যান্য অংশ থেকে স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। এদের সাহায্যেই ভবিষ্যতের ভারতবাসী বৈদেশিক শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার সহজ এবং কার্যকরী ব্যবস্থা করতে পারে।"[৪৩] ভারতীয় প্রাকৃতিক ভূগোল কিভাবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করে জনসাধারণের নিরাপত্তা বিধান ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যকে সংহত করেছে সে বিষয়েও এস. ওয়াজেদ আলি প্রয়োজনীয় আলোকপাত করেছেন:

> ভারতবাসীর পক্ষে বৈদেশিক শত্রুকে খাইবার গিরিপর্বতের মুখে ঠেকিয়ে রাখা ভারতের অন্য কোন স্থানে তার গতিরোধের চেয়ে অনেকখানি সহজসাধ্য কাজ। তারপর ভাতবর্ষের বিভিন্ন অংশের লোকদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করলে সত্যই মনে হয় প্রকৃতি দেবী যেন ভারত রক্ষার সমস্যার কথা ভেবেই দেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে সেই সব দুর্ধর্ষ যুদ্ধকৌশল জাতিকে স্থাপিত করেছন— যাদের বাহুবল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে এদেশের রক্ষাকবচ হয়ে আছে। সবদিক থেকে বিচার করলে মনে এ ধারণা অতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক কুশলতার দিক থেকে ভারতবর্ষ এক অখণ্ড দেশ।[৪৪]

কিন্তু জনসাধারণের ঐক্য, সংহতি কিংবা সহমর্মিতার ব্যত্যয় ঘটলে কোন সুরক্ষা ব্যবস্থাই রাষ্ট্রকাঠামোকে রক্ষা করতে পারে না। রাষ্ট্রের অধিবাসীরা পরস্পর সন্দেহপরায়ণ, বিশ্বাসহীন ও অনাত্মীয় চেতনাকে লালন করলে বল প্রযোগ করেও রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখা যায় না। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের ভৌগোলিক মানচিত্রের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষায় এস ওয়াজেদ আলি তাই সর্ব প্রকার সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিরোধী :

> সামরিক বিশেষজ্ঞরা যাই বলুন, রাষ্ট্রের সবচেয়ে মজবুত আয়তন রক্ষার উপায় হ'ল রাষ্ট্রবাসীদের অন্তরের স্নেহ, প্রীতি এবং ভালবাসা। সাধারণ রাজনীতিকেরা এই মহাসত্যকে উপেক্ষা করেন বলেই রাষ্ট্রে অন্তর্বিপ্লব এসে দেখা দেয়, আর তার ফলে আত্মরক্ষার বিধি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও, পরীক্ষার

Dhaka University Institutional Repository

> বেলায় রাষ্ট্র ভেঙ্গে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। সর্বদেশের সর্বমানব পরস্পরের প্রেম আর ভালবাসার ভিত্তিতে যদি এই পৃথিবীতে এ অখণ্ড বা রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে, তাহলে সেই হত আমাদের আদর্শ রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান। সে রাষ্ট্রে দ্বেষ-হিংসা, কলহ যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি অপ্রীতিকর জিনিস কিছুই থাকত না। পরস্পরের মঙ্গল সাধনের জন্য, পরস্পরের সাহায্যদানের জন্য সকলেই উদগ্রীব থাকত; মানুষের সেবা করতে পারলে, মানুষ নিজেকে ধন্য মনে করত; বিশ্বময় বিরাজ করত সুখ আর শান্তি; প্রেম আর প্রীতি; সেবা আর কৃতজ্ঞতা। এই পৃথিবীই তা হলে স্বর্গ হয়ে যেত।[৪৫]

এ প্রসঙ্গে তিনি মধ্যযুগের 'অখণ্ড ভারতীয় সাম্রাজ্য' বা কাঠামোর উল্লেখ করেছেন। জাতিগুলির অন্তরে অখণ্ড রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নি বলেই সাময়িক শক্তির ওপর নির্ভর করে যে কৃত্রিম ও চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থার প্রবর্তন সেকালে করা হয়েছিল সে ব্যবস্থার গভীরেই ভাঙনের বীজ নিহিত ছিল। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হওয়ার সঙ্গেই জাগতো অসন্তোষ, বিদ্রোহ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে: "যে অন্তরের ঐক্যের উপরে একটি রাজ্যের স্থায়ীত্ব নির্ভর করে, সে ঐক্য অখণ্ড ভারতবর্ষে কখনও দেখা দেয় নি। আর তাই কেন্দ্রীয় শক্তি যখনই দুর্বল হয়েছে, স্বাভাবিক ঐক্যের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রগুলি তখনই মাথা তুলেছে।

ভারতবর্ষে স্থায়ী রাষ্ট্র সংগঠন করতে হলে দুটি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখা আর রাষ্ট্র জীবনে তাদের উভয়বিধ প্রয়োজন পরিপূরণের সুব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। চতুঃসীমানার প্রাকৃতিকি সীমান্তের দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষ্টিগত (কালচার), ভাষাগত মিল ও ঐক্যের ভিত্তির উপর দেশে বিভিন্ন খণ্ড রাষ্ট্রের বা উপরাষ্ট্রের সৃষ্টি করা দরকার। এইভাবে অগ্রসর হলে ভারতের ভবিষ্যত রাষ্ট্রে আমরা সাম্রাজ্যের শক্তি আর জাতীয় জীবনে সুখ-শান্তি নৈতিক বল এবং আত্মিক প্রেরণা উভয়বিধ সুবিধাই লাভ করতে পারব। একের মধ্যে বহুত্ব, আর বহুর মধ্যে একত্ব এই উভয়বিদ মঙ্গলের সমাবেশে আমাদের জাতীয় জীবন অভিনব ঐশ্বর্য লাভ করবে।"[৪৬]

কিন্তু অতীতে ব্যর্থ হলেও ভবিষ্যতে যে ভারতবর্ষকে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে আনা যাবে না— এ জাতীয় কোন সংশয়াত্মক চিন্তা এস. ওয়াজেদ আলিকে স্পর্শ করে নি। এ ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আশাবাদী এবং এ কালের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অন্তর্গত ব্যবস্থা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন। তাঁর মতে সবার জন্যে একটি অভিন্ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হলে জনসাধারণের মধ্যেও একটি মৌলিক বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের জন্ম হওয়া প্রয়োজন। একের মধ্যে বহুত্ব ও বহুর মধ্যে একত্ব এই উভয়বিধ মঙ্গল চিন্তায় জনসাধারণ ও রাষ্ট্র নায়কেরা উদ্দীপিত হলে নিজের বৈচিত্র্য ও বৈষম্য সত্ত্বেও তাদের পক্ষে একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীতে পরিণত হওয়া সম্ভব। এস. ওয়াজেদ আলির এ ধারণার সঙ্গে স্পষ্টতই আধুনিক কালের জাতীয়তাবাদী চেতনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়। 'রাষ্ট্রের রূপ' প্রবন্ধেও তিনি জাতীয়তাবাদকেই আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের অনিবার্য দর্শন হিসাবে উল্লেখ করেছেন:

> এক কথায় বলতে গেলে জাতীয়তাবাদের (Nationalism) আদর্শ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুবিধাজনক এক ভৌগোলিক পরিবেশ বা এলাকার মধ্যে মূর্ত্ত করে তোলা; সেই ভৌগোলিক পরিবেশের প্রতি মানুষের ভক্তি, প্রেম ভালবাসা জাগিয়ে তোলা; তার সেবায়, তার মুক্তি এবং

Dhaka University Institutional Repository

> মঙ্গলের সাধনায় মানুষের সর্ববিধ শক্তি এবং প্রয়াসকে পরিচালিত করা এবং সেই ভৌগলিক পরিবেশকে সর্বপ্রকার সামবায়িক জীবনের স্নায়ুবিক কেন্দ্রে পরিণত করা। এইভাবেই বর্তমান জগতের বিভিন্ন জাতীয়তামূলক রাষ্ট্র তন্ত্র গড়ে উঠেছে, আর তারাই এখন মানব জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইউনাইটেড স্টেটস, জাপান প্রভৃতির কথা কে না জানেন।[৪৭]

এস. ওয়াজেদ আলি সমকালে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্বাচিত কিছু প্রবণতা লক্ষ করেছেন। কিন্তু ধর্মকে তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র শর্ত বলে মানেন নি। তাঁর মতে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়। তিনি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে গভীর ধর্মবিশ্বাসকে নিজের অন্তর্মূলে বহন করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর দ্বিধাহীন স্বীকারোক্তি স্মরণীয়:

> বর্ত্তমান যুগের রাষ্ট্রীয় জীবনের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় যাঁদের আছে, তাঁরা জানেন–রাষ্ট্রের কারবারই হল এ যুগে সবচেয়ে বড় কারবার। এরূপ অবস্থায় ধর্ম্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক না করলে, ধর্ম্ম আর ধর্ম্মই থাকে না, বড় একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়; এবং ধর্ম্ম ব্যবসায়ে পরিণত হওয়ার মানেই হল তার মৃত্যু। কেননা, সে অবস্থায় ধর্ম্মের নামে যে সব-জীগীর ছাড়া হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের বুলি নয়, স্বার্থের উদ্বমন।[৪৮]

মানুষের ধর্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের মধ্যে এস. ওয়াজেদ আলি তাই মৌলিক ও গুণগত পার্থক্য লক্ষ করেছেন। রাষ্ট্রকে তিনি ইহজাগতিক স্বার্থ চরিত্রের উপায় রূপে বিবেচনা করেছেন। "রাষ্ট্রের কারবার হ'ল ইহজীবনের স্বার্থ এবং সুবিধা নিয়ে; ব্যক্তিগত স্বার্থ-সুবিধা, বংশগত স্বার্থ সুবিধা, শ্রেণীগত স্বার্থ-সুবিধা, জাতিগত স্বার্থ-সুবিধা এইসব স্বার্থ-সুবিধা নিয়েই রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কারবার।'[৪৯] সে ক্ষেত্রে ত্যাগ, সংযম আর পবিত্রতাকেই তিনি প্রকৃত ধর্মে ভিত্তি বলে বিশ্বাস করেছেন। ধর্মকে রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে অঙ্গীভূত করতে তাই তিনি চান নি। তাঁর মতানুসারে সে ব্যবস্থা গৃহীত হলে তা জনসাধারণ ও রাষ্ট্র—কারোর জন্যেই সুখকর হয় না। এ প্রসঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত স্পষ্ট :

> ধর্ম যেখানে রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা লাভ করেছে, সেখানেই শাশ্বত সত্যের বিরুদ্ধে, প্রকৃত ধর্মাত্মাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের অভিযান চালিত হয়েছে; আর তার ফলে উন্নতির পথ ছেড়ে সমাজের অধোগতি হয়েছে, ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অন্ধকুসংস্কারের সঙ্গে দুর্ব্বার রাষ্ট্র শক্তি যোগ দিয়েছে, অর উভয়ে মিলে সত্যকে পদদলিত করেছে।[৫০]

এস. ওয়াজেদ আলির মতে, রাষ্ট্র পরিচালনায় অনেক সময় ধর্মের ধুরন্ধর ব্যক্তিরা প্রকৃত ধার্মিক ও সত্য সাধকদের সঙ্গে তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু সেই সংগ্রামে কপট কর্মচারীরাই জয়যুক্ত হয়েছে। আর যিশুখ্রিস্টের মতো 'প্রকৃত ধার্মিকগণ ক্রশ-কাষ্ঠে' দেহ ত্যাগ করেছেন।

বস্তুত, এস. ওয়াজেদ আলির রাষ্ট্রচিন্তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রধারণার সমান্তরাল নয়। তিনি রাষ্ট্র বলতে পরস্পর আত্মীয়তার সূত্রে গড়ে ওঠা এবং জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ একটি জনসমষ্টি ও

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতির দ্বারা সুরক্ষিত একটি ভূখণ্ডকে বুঝিয়েছেন। সরকার পদ্ধতির প্রশ্নে তিনি গণতন্ত্রবাদী। রাষ্ট্রের উন্নতি সাধন ও স্থায়ীত্ব তাঁর মতে অধিবাসীদের উপরই নির্ভর করে। তাঁরা ঐক্য চেতনাকে লালন করলেও ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হলেই রাষ্ট্রে কোন প্রকার অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি হয় না। রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখতে তিনি সামরিক শক্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতে সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে কোন রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে না। এই জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থায় অধিবাসীদের মধ্যে ঐক্য চেতনা গড়ে ওঠে না। সামরিক শক্তির প্রাধান্য হ্রাস পাওয়ার সঙ্গেই তাই দেখা দেবে অন্তর্বিপ্লব। জাতিগুলি তখন হয়ে পড়বে বিচ্ছিন্ন। ধর্মকে এস. ওয়াজেদ আলি রাষ্ট্রীয় ও জাতিগত ঐক্য প্রতিষ্ঠার শর্ত বলে গ্রহণ করেন নি। ধর্মকে মানুষের ব্যক্তিগত, আত্মিক উন্নতির উপায় বলেই তিনি মনে করেছেন। রাষ্ট্রচিন্তায় ধর্মকে স্থান দিলে ধর্মের মাহাত্ম্য খণ্ডিত হয়ে পড়ে বলেই তাঁর বিশ্বাস। এক কথায়, একটি ধর্মনিরপেক্ষ, উদার নৈতিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই এস. ওয়াজেদ আলি সবার জন্যে কামনা করেছেন।

সাহিত্য ও শিল্পভাবনা

গতিশীল জীবনের প্রতীক এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্য শিল্প সাধনা ছিল মূলত বহমান সমাজ সভ্যতা ও আবেষ্টনী-অন্তর্গত উচ্চতর চৈতন্যমুখী মানবের জীবনসাধনা। তাঁর সাহিত্য ও শিল্পনীতি ছিল বাঙালি জাতির সার্বিক কল্যাণ চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সাহিত্যকে তিনি জীবন থেকে আলাদা করে ভাবেন নি। এ জন্যেই তাঁর কাছে শিল্প সাহিত্য হয়ে উঠেছে জীবনসাধনার নামান্তর। এ প্রসঙ্গে ওয়াজেদ আলির উচ্চারণ ছিল স্পষ্ট:

> (১)... Art for art's Sake, কথাটা ঠিক নয়। কেননা আর্টের কারবার ভাবকে নিয়ে, আর ভাবের মূল্য নির্ভর করে তার বিষয় বস্তুর উপর। আমাদের বলা উচিত Art for humanity's sake, অর্থাৎ মানুষ শিল্পের জন্য নয়, শিল্প হচ্ছে মানুষের জন্য।
>
> (২) আর্টের জন্য আর্ট নয়; জীবনের অভিব্যতিক্তর জন্য, ভাবের অভিব্যক্তির জন্য, আদর্শের অভিব্যক্তির জন্য আর্ট। বর্তমান জগতে বিশেষ করে, আমাদের এই বাংলাদেশের আর্টের মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে সে একটা তুচ্ছতা, একটা Decadentism এসে দেখা দিয়েছে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে শিল্পী লেখাকে তার গৌণ উদ্দেশ্য মনে না করে তাকেই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেন।
> ...
>
> আর্টের জন্য জীবন সাধনা করলে সাহিত্য হয় না। জীবন সাধনাকে রূপ দেবার জন্য সাহিত্যের সাধনা করলে ভূল হয়, জীবন ধারণের জন্য লড়াই করতে হয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা তাই করেছেন।[৫২]

Dhaka University Institutional Repository

(৩) মানুষের মঙ্গলই হবে সাহিত্যের লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য সাহিত্যিককে শ্রেষ্ঠতম উপকরণ নির্ব্বাচন করতে হবে, আর যথাসম্ভব তারই ব্যবহার করতে হবে। উচ্চতম আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠতম উপকরণের সাহায্যে বিমল আনন্দের পরিবেশন– এই হল সাহিত্যিকের কাজ!

মানুষের মঙ্গল আর বিমল আনন্দের পরিবেশন, এই হল সাহিত্যের কাজ। তাই যদি হয়, তা হলে শ্রেয়ের সঙ্গে, কাম্যের সঙ্গে সাহিত্যিককে পরিচিত হতে হবে।[৫৩]

এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন, মানুষের প্রয়োজনের জন্যে সাহিত্য। তিনি বিশ্বাস করেন সাহিত্যের সাধনা প্রকৃত অর্থে জীবনাদর্শের সাধনা। মানুষের প্রয়োজন তথা জীবনের প্রয়োজনের ব্যাপকতার সঙ্গে সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে যুক্ত করে দিলে তা মহৎ অভিব্যঞ্জনাকেই স্পষ্ট করে তোলে। যে সাহিত্যিকের জীবনবোধ অতি উন্নত, তাঁর রচিত সাহিত্য ও তত উন্নত ও মহৎ। এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যিকের কাছে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে এক মহৎ জীবন ভাবনাই দাবি করেছেন। আর সে কারণে শিল্পের উদ্দেশ্য তাঁর কাছে আরো ব্যাপক।

সাহিত্য এবং আর্টের মূল হচ্ছে সুন্দরের পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনাকে কোন না কোন উপায়ে প্রকাশ করা হচ্ছে মানুষের স্বভাবধর্ম। আর তা থেকে জন্মলাভ করে তার সাহিত্য, তার আর্ট, তার ধর্ম, তার সবকিছু। যার অন্তরের অনুভূতি যত সুন্দর, তার সৃষ্টি সাহিত্য এবং আর্টও তত সুন্দর।

সাহিত্য অনুভূতির অভিব্যক্তি। মানুষের বিভিন্ন রকম অনুভূতি থেকেই সাহিত্য জন্ম লাভ করে। এস. ওয়াজেদ আলির মতে, সাহিত্য জীবনের কথা বলে, সমাজ ও মানুষের কথা বলে। তাই তিনি বিশ্বাস করেন, সাহিত্য মানুষের জন্য। এর লক্ষ্য মানুষের মঙ্গল। এই জন্যে জীবন সাধনাকে রূপদেয়ার জন্যে তিনি সাহিত্য সাধনার পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কাছে সাহিত্য শিল্পের মূল কথা হলো সুন্দর ও মহত্ত্বের কল্পনা। হৃদয়ের অনুভূতি চিন্তা ও আবেগ যার যত সুন্দর ও মহৎ, তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও তত সুন্দর, মহৎ ও আবেদনবাহী। মানুষকে, মানুষের জীবনকে, অন্তর দিয়ে গভীরভাবে ভালবাসার মাধ্যমেই প্রকৃত সাধক নিজ প্রাণধর্মকে শুচিস্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ ও উদার করতে সমর্থ হন। যিনি মহৎকে ভালবাসেন, তাঁর আবেগ অনুভূতিতেও তার প্রভাব হয়ে ওঠে অনিবার্য এবং সে কারণে তাঁর রচনা মহৎগুণে গুণান্বিত হয়। এস. ওয়াজেদ আলি তাই সাহিত্যিকের কাছে মহৎকে ভালবাসা, মহৎ চিন্তা করা এবং মহৎ সৃষ্টিরই আবেদন রাখেন। তাঁর বিশ্বাস সাহিত্যকদের সাধনার সার্থকতাও এই পথে সম্ভব। তুচ্ছতা ও সংকীর্ণতাকে পরিহার করে সত্য-সুন্দরের সাধনায় ব্যাপৃত থাকা, সীমা থেকে অসীমে উত্তীর্ণ হওয়া এবং ক্রমশ ক্ষুদ্র থেকে ব্যাপকতার মধ্যে অবগাহনই সিদ্ধির শর্ত।

আমাদের সাহিত্য সাধনা সার্থক করতে হলে শ্রেয়ের সন্ধানে, সত্যের সন্ধানে, সুন্দরের সন্ধানে আমাদের অভিযান করতে হবে। সে অভিযান যিনি যত আগ্রহের সঙ্গে, যিনি যত নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারবেন, সাহিত্য সাধনা তার তত সার্থক হবে। জীবনে তুচ্ছতাকে যিনি যত বর্জন করতে পারবেন, সাহিত্য তাঁর ততই তুচ্ছতা বর্জিত হবে। সাময়িক উত্তেজনা ছেড়ে যিনি যত শাশ্বতের দিকে , চিরন্তনের দিকে যেতে পারবেন, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য ততই শাশ্বত, ততই চিরন্তন হবে।[৫৫]

Dhaka University Institutional Repository

এস. ওয়াজেদ আলির বিশ্বাস সাহিত্য সত্য, সুন্দর ও কল্যাণ-অভিমুখী। এ কথা বলতে গিয়েই তিনি জীবনের গভীরতর অস্তিত্ব উপলব্ধির কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন। মানব জাতির, মানব সভ্যতার অন্তহীন পথযাত্রায় ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব একান্তই ক্ষণিকের— জীবনের এই সুগভীর মর্মের কথা যদি আমরা বিস্মৃত না হই তাহলেই আমাদের শিল্পসাধনা ক্ষুদ্রকে বর্জন করে মহত্তরকে আপন বলে গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। সে কারণেই তিনি সাহিত্য শিল্পের উদ্দেশ্য আলোচনার সঙ্গে জীবনের নিগূঢ় রহস্যকে বারবার বিজড়িত করে ফেলেন। তিনি আরো বলেন, সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্য দিয়েই শিল্পীর উদ্দেশ্য শেষ হয়ে যায় না। মহেত্ত্বের দিকেও তাকে দৃষ্টি দিতে হয়।

শিল্পী সাহিত্যিকের সৃষ্টি প্রণা তাই দুটি উদ্দেশ্যে নিবেদিত : প্রথমত, সুন্দর; দ্বিতীয়ত, মহত্ত্ব। এই সূত্রেই এস. ওয়াজেদ আলি শিল্পের দুটি শ্রেণী বিভাগের কথাও বলেন। প্রথমত বাস্তবতামূলক শিল্প, দ্বিতীয়ত, আদর্শমূলক শিল্প। তাঁর মতে, বাস্তবতামূলক শিল্প জীবনকে বাস্তব রূপে উপস্থাপন করে। আর আদর্শমূলক শিল্প শিল্পীর সৃষ্টিকর্মে পরিস্ফুটিত করে তাঁর আদর্শকে। এস. ওযাজেদ আলি এই আদর্শমূলক শিল্পকেই জীবনের শিল্প বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে যে শিল্পে সাহিত্যিকের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত হয় সেই শিল্প সর্বাংশে ও সর্বত্র সত্য ও শ্রেয়কে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী হয়। ফলে জীবন শিল্প ও আদর্শমূলক শিল্পের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। জীবনশিল্পীর কর্তব্যকে তাই তিনি অনেক বড় করে ভাবেন :

> জীবন-শিল্পী তাঁর বেষ্টনীর মধ্যে অন্তরের প্রেরণাকে মূর্ত করে তোলবার চেষ্টায় সতত ব্যস্ত থাকেন। কেবল নিজের জীবনকে সত্য, মহৎ এবং সুন্দর করে তিনি সন্তুষ্ট হন না। পরন্তু, তাঁর বেষ্টনীর সকলের জীবনেই এই আদর্শত্রয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ তিনি কাজ করে যান। তাঁর ব্যাপক অন্তরে কোন ক্ষুদ্র স্বার্থ, কোন সংকীর্ণ উদ্দেশ্য স্থান পায় না। নীতিদর্শনের বিভিন্ন আদর্শের সত্যাংশ তিনি গ্রহণ করেন এবং অসত্যাংশ বর্জন করেন। সৃষ্টিই হচ্ছে তার আদর্শ। সৃতরাং বিশ্বকর্মারই মত, জীবনে যা কিছু সত্য, যা কিছু মহৎ, যা কিছু সুন্দর তিনি দেখতে পান, সে সমস্তকেই তাঁর সৃষ্ট শিল্পে সংযোজিত করতে তিনি যত্নবান হন। তাঁর ব্যাপক, শান্ত এবং সুগভীর প্রাণে বিভিন্ন নীতির বিরোধ দূরীভূত হয়, আর তাঁর সঞ্জীবনী স্পর্শে বিভিন্ন আদর্শের নিত্য নূতন সমন্বয়ে বিশ্ব সম্পদশালী হয়ে উঠে।[৫৬]

সাহিত্য-শিল্পীর সঙ্গে বিশ্বস্রষ্টার, সৃষ্টিগত প্রেরণার দিক থেকে, অভিন্নতা খুঁজে পেয়েছেন এস. ওয়াজেদ আলি। গুপ্তরত্ন বিশেষ স্রষ্টা যেমন নিজেকে প্রকাশ করা বা জানাবার উদ্দেশ্যে বিশ্বসৃষ্টি করেন তেমনি শিল্পীও তাঁর অন্তরের প্রেরণাকে বাহ্যিক রূপদানের লক্ষ্যে সৃষ্টি সাধনায় ব্যাপৃত। উভয়ের এই অভিন্নতাই উভয়কে করে মহৎ উদার ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন।

এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যের উদ্দেশ্যকে মানবমুখী করার কথাই ভেবেছেন। মানবকল্যাণ ব্যতীত সাহিত্যের অন্য কোন লক্ষ্য থাকতে পারে,– এ তিনি বিশ্বাস করেন না। সমাজের জন্যে বা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর এমন সাহিত্য রচনা থেকে বিরত থাকাকেই তিনি কর্তব্য বিবেচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট :

> সাহিত্যের লক্ষ্য কি? সাহিত্যিকেবই বা আদর্শ কি? প্রাচীন আলংকারিকেরা রসের সৃষ্টিকেই সাহিত্যের লক্ষ্যরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। সাহিত্যিকের কাজ সে হিসাবে হল রসের সৃষ্টি ও তার পরিবেশন। তবে রস বিভিন্ন রকমের হয়, আর বিভিন্ন রসের পরিবেশনে বিভিন্ন ফল সমাজে দেখা দেয়। যে রসের ফল অনিষ্টকর হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সে রসের পরিবেশন আমরা সমর্থন করতে পারি না। পক্ষান্তরে যে রস থেকে আসে বিমল আনন্দ, উচ্চ আদর্শের প্রেরণা, কল্যাণপ্রসূ চিন্তাধারা, সেই রসের পরিবেশনই হল সাহিত্যিকের প্রকৃত কাজ।[৬০]

মানব কল্যাণকেই তিনি সাহিত্যের লক্ষ্য হিসেবে সামনে রেখেছেন। প্রসঙ্গত তিনি সাহিত্যিকের কাঁধে চাপিয়েছেন আরও অনেক দায়িত্ব। তাঁর মতে সাহিত্যিকে যেমন তাঁর নিজ সমাজের মানুষের মনকে অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে, তেমনি তাকে হতে হবে ভবিষ্যৎদ্রষ্টাও। এ দুটি বিষয়ে কোন সাহিত্যিক দক্ষতার পরিচয় দিলে তাঁর সাধনাও নিঃসন্দেহে সার্থক হয়ে উঠবে। আর এই সমগ্র বিষয়টিতে এস. ওয়াজেদ আলির দৃষ্টি সমাজকল্যাণের প্রতি নিবিষ্ট। মানুষের মনের চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে ভবিষ্যত জগতের ছবি অঙ্কন করে সমাজকে সার্বিক কল্যাণের পথে, মঙ্গলময় ক্রমবিকাশের পথে এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে নব সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করাই সাহিত্যিকের কাজ। সাহিত্যিককে যুগের দাবি ও চাহিদার প্রতি অবশ্যই তাঁর শিল্পীসুলভ অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে হবে। সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে যুগের মর্মযন্ত্রণা উপলব্ধিও আবশ্যকীয় এবং এ ক্ষেত্রে যুগের মন, তার গতি-প্রকৃতি, তার ভাববিহ্বলতা —এই সবকিছুকে অনুধাবন করতে হবে অতি নিবিড়ভাবে। কেননা, এস. ওয়াজেদ আলি মনে করেন, ক্ষণিকের ভাবোচ্ছ্বাস বা সৃষ্টিচঞ্চলতা দ্বারা সাহিত্যিক সার্থক হতে পারেন না। শিল্পসিদ্ধির জন্যে তাঁকে হয় সাধকের মতো ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু, ধ্যানগম্ভীর ও স্থির প্রাজ্ঞ :

> সাহিত্যিকের একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। পরের ধর্ম অবলম্বন করে খুঁড়িয়ে বাঁচার চেয়ে স্বধর্মে বীরের মত মরাও ভাল। সাহিত্য হলো বড় রকমের একটা সাধনা। এ সাধনা সার্থক করতে হলে সাহিত্যিককে দলাদলির উর্ধ্বে উঠতে হবে; সত্য, শ্রেয় সুন্দরের অনাবৃত রূপ দেখতে হবে; অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের যথাযোগ্য দাবীর সুবিচারের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে; আর সার্থক তুলিকার সাহায্যে সে পথকে বিচিত্র রং এ সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হবে।[৫৮]

সাহিত্যিক যদি তাঁর অনুভূতি প্রকাশের অন্তর্তাগিদকে সাধক সুলভ নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত করেন তাহলে ভাষাভঙ্গি, মনোভঙ্গি প্রভৃতি সবদিক থেকেই তিনি হয়ে উঠবেন নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র। সাহিত্যিকের এই স্বাতন্ত্র্যচেতনাকেই প্রকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁকে করে তোলে যুগোপযোগী এবং সমকাল-সংলগ্ন। আর অগ্রসরতা ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উপকরণও যে রূপান্তরিত হয়, সে বিষয়টিও এস. ওয়াজেদ আলির দৃষ্টি এড়ায় নি। জীবন বহমান এবং সে কারণে মানব সভ্যতা, মানবীয় মূল্যবোধ, সমাজ বৈশিষ্ট্য নিয়ত পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মানব জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

রূপকার শিল্পীকেও তাই পরিবর্তশীলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হয়। সাহিত্যের উপকরণ সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলির বক্তব্য তাই ইতিহাসবোধে নিবিড় হয়ে ওঠে :

> প্রাচীনকালে সমাজ বলতে বোঝা যেতো রাজা, মহারাজা, বাদশা, নবাব প্রভৃতি উচ্চস্তরের শাসকশ্রেণী। তখন এঁদের নিয়েই সাহিত্য রচিত হত, আর সেই সাহিত্য আপামর সকলকে শিক্ষা এবং আনন্দ দান করতো। তারপর ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল। সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন এবং জীবনাদর্শ নিয়েই সাহিত্য রচিত হ'ল। মানুষ সেই সাহিত্য থেকেই আনন্দ এবং শিক্ষা আহরণ করতে লাগলো। বিগত অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্য সাধারণত এই শ্রেণীরই সাহিত্য। ইউরোপের প্রভাব ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলাদেশেও এসে দেখা দিল। গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল, তা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন এবং জীবনাদর্শ নিয়েই রচিত হয়েছিল। দরিদ্র জনসাধারণ এবং নিম্নশ্রেণীর কৃষক মজুর প্রভৃতির স্থান সে সাহিত্যে ছিল না বললেই চলে। এই শ্রেণীর লোকেরা সধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন কাহিনীমূলক সাহিত্যই পড়তো আর তা থেকেই তারা জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতো।[৫৯]

এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্য চিন্তায় সর্বত্রই ইতিহাসদৃষ্টির গভীরতা সহজলভ্য। যে করণেই তিনি সাহিত্যিকের ঐকান্তিক সাধনার সাথে জাতির কল্যাণ-অকল্যাণের প্রশ্নটিকে যথাযথভাবেই জড়িত করে ফেলেন। তাঁর মতে, মানব প্রেমের এক মহান আদর্শ হবে সাহিত্যিকের চলার পথের পাথেয়। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ঐক্যসাধন করে সমগ্র জাতিকে একটি সমন্বিত কল্যাণপথে চালিত করা সাহিত্যিকের কর্তব্য। একটি জাতির মানসিক উৎকর্ষ সাধনের ক্ষেত্রে ওই জাতির শিল্পী সাহিত্যিকদের ভূমিকাই মুখ্য। সম্পূর্ণভাবে দলনিরপেক্ষ ও সম্প্রদায় ঊর্ধ্ব মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হয়ে একজন সাহিত্যিক জাতি গঠনের ক্ষেত্রে এমন অবদান রাখবে— যাতে আধুনিক যুগে মানুষ তাঁকে মধ্যযুগীয় ধর্ম প্রচারকদের মতোই শ্রদ্ধা করে। এ যুগের সাহিত্যগণকে এই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এস. ওয়াজেদ আলি বলেন :

> প্রাচীনকালে ধর্মপ্রচারকেরা মানুষকে উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করতেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ দায়িত্ব সাহিত্যিকদের স্কন্ধে এসে পড়েছে। পূর্বে যে প্রেরণা মানুষ ধর্মপ্রচারকের কাছ থেকে পেতো, এখন সে প্রেরণা সে সাহিত্যিকদের কাছ থেকে পায়। সাহিত্যের গুরুত্ব যেমন বেড়েছে, সাহিত্যিকের দায়িত্বও তেমনি বেড়েছে। ধর্মপ্রচারকেরা বিশেষ কোন ধর্মকে অবলম্বন করে প্রচারকার্য চালান না। তাঁরা প্রচার চালান সার্বজনীন রসধর্মকে আশ্রয় করে। সাহিত্যিক রূপকার, তাঁরা ভাবুক। মানুষের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মানুষের অন্তরের অন্তর্গত প্রেরণাকে রূপদান করাই তাঁদের কাজ। সুতরাং মানবতার ধর্মই সাহিত্যিকের স্বাভাবিক ধর্ম। এই মানবিক ধর্ম ও আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা রেখে সাধনা করলে সাহিত্যিকেরা অবধারিত উদীয়মান জাতির এক মঙ্গলময় জীবনবেদী রচনা করতে পারবেন এ আমার নিঃশংসয় প্রত্যয়।[৬০]

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যিককে এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করতে হলে তাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে জাতির পথ প্রদর্শকের ভূমিকা। মানুষের মুক্তিপিপাসার আর্তিকে যদি তিনি তাঁর রচনায় শিল্পরূপ দিতে চান তা হলে জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সাথে অবশ্যই তাকে একমত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিকের মন যদি সম্প্রদায় ভাবনার দ্বারা তাড়িত হয়, দৃষ্টি যদি হয় আচ্ছন্ন, তাহলে নিশ্চিতভাবে সামগ্রিক জাতি চিন্তা থেকে তিনি পিছিয়ে পড়বেন এবং স্বাভাবিক জাতির স্বাধীন বিকাশের প্রশ্নটিকেও তিনি বড় করে দেখতে সক্ষম হবেন না। অতএব, একজন সার্থক সাহিত্যিককে অবশ্যই সম্প্রদায় মানসিকতার উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে জাতিভাবনাকে। সে জন্যে দেশপ্রেম এবং স্বাজাত্যবোধের বিষয়টিও সাহিত্যিকের জন্যে অনিবার্য হয়ে ওঠে। মানব কল্যাণমুখী সাহিত্যের প্রবক্তা এস. ওয়াজেদ আলি ভাতরবর্ষের সাহিত্য থেকে উদাহরণ উপস্থাপন করে দেখান যে, সম্প্রদায় প্রীতি কিভাবে একজন মুসলিম সাহিত্যিককে দেশভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে এবং পরিণতিতে তিনি সার্থকতার চূড়াস্পর্শ করতে অসফল হন। "সাহিত্যিক হ'ল জাতির পথ প্রদর্শক– তার জীবন্ত জীবনের মুখপত্র এবং প্রতীক। সাহিত্যিক যখন মুক্তির বাণী প্রচার করে, তখনই তার লেখা থেকে জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গ বের হয়, তার কথায় বৈদ্যুতিক শক্তি দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতকে দুইজন ভারতীয় Sir Walter Scott অনুসৃত পথ অবলম্বন করে সাহিত্য সাধনা করেন। তাঁদের একজন বাঙালী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর একজন হলেন উর্দ্দু সাহিত্যিক আব্দুল হালিম শারর। "[৬১]

শাররের সাহিত্যে দেশপ্রেমের কেন অভাব তার কারণও এস. ওয়াজেদ আলি ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, সামাজিক পরিস্থিতিই এর কারণ। যে অঞ্চলে তাঁর বাস ওই অঞ্চলে শতকরা দশভাগের মতো লোক মুসলমান। ফলে মুসলমানেরা হিন্দু বিদ্বেষ থেকে দেশপ্রেমে অগ্রসর হয়ে দেশ শাসনের ভার হিন্দুদের ওপর ছেড়ে দিতে অনাগ্রহী। মুসলমানদের এই সংকীর্ণ সম্প্রদায় বিদ্বেষ লেখক শাররকেও প্রভাবিত করেছে। ফলে তাঁর সাহিত্যে দেশপ্রেমের অভাব। যে সময়ের উদাহরণ এস. ওয়াজেদ আলি উপস্থাপন করেছেন, সে সময়ে ভারতবর্ষের মুসলিম সাহিত্যিকগণ উপরি-উক্ত কারণে দেশপ্রেম প্রশ্নে ছিলেন দ্বিধান্বিত। অথচ রেনেসাঁসের এক পরিপক্ব ফল হলো স্বজাত্যবোধ এবং তা আধুনিকতারও নামান্তর। প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী একজন সাহিত্যিক, তিনি যে অঞ্চলেরই হোন না কেন, সেই দেশপ্রেমকে সংকীর্ণ সম্প্রদায় মানসিকতা দ্বারা উপেক্ষা করলে তার পরিণতি শুভ হয় না। কবি ইকবাল এই সীমাবদ্ধতার কথা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তিনি এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে এমন আদর্শ প্রচার করেন, এস. ওয়াজেদ আলির মতে, যা এক ভুল থেকে আরেক ভুলের গহ্বরে তাঁকে নিক্ষেপ করে। ইকবাল যে বিশ্বমুসলিম রাষ্ট্রাদর্শের প্রচার করেন তা এ যুগের পটভূমিতে বাস্তবায়নযোগ্য নয়। ফলে সে ক্ষেত্রেও দেখা দেয় অসফলতা। এ সকল উদাহরণ সহযোগে এস. ওয়াজেদ আলি দেখাতে চান সে, এদেশের মুসলিম সাহিত্যিকগণকে জাতীয় রাষ্ট্রাদর্শের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রেও এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্য চিন্তা স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। "সাহিত্যিক জাতির রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং স্বার্থ থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করতে পারে না। সেই জন্য সাহিত্যিক হিসাবে আমি এইটুকু বলতে চাই যে, স্বাধীন বঙ্গের আদর্শ সম্মুখে রেখেই ভবিষ্যতে আমাদের দেশপ্রেমের গান গাইতে হবে, দেশপ্রেমের ছবি আঁকতে হবে; দেশ সেবার কল্পনা-জল্পনা করতে হবে। চিন্তার, কল্পনার, সেবার এবং সাধনার যে বিরাট এক জগৎ আমাদের কাছে বন্ধ আছে,

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালীত্বের মনোমুগ্ধকর যাদুস্পর্শে তার দুয়ার খুলে যাবে।... সকলে যাতে অকুণ্ঠিত চিত্তে দেশ মাতৃকার সেবায় অস্মিনিয়োগ করতে পারে তার অনুকূল ব্যবস্থা করতে হবে, আর সাহিত্যিকদের সে দিকে লক্ষ্য রেখে সাহিত্য সাধনা করতে হবে।"[৬২] স্বাধীন বঙ্গের এই আদর্শ অর্থাৎ বাঙালিকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার এই আদর্শ এস. ওয়াজেদ আলির মতে, একজন বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকের দেশপ্রেমের প্রশ্নে সবচেয়ে উচ্চতর, সহজতর ও কাম্যতর। এ প্রশ্নে তিনি অখণ্ড ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শের বিরোধী। স্মরণীয়, এ প্রবন্ধটি তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতির ভাষণ হিসেবে পাঠ করেন ১৯৩৯ সালে। তখনও লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নি। সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর এই চিন্তা কত প্রাগ্রসর ও পরিণামসঞ্চারী তা সহজেই বোধগম্য। তাছাড়া, এই আদর্শের মধ্যে তাঁর সম্প্রদায় নিরপেক্ষ উদার মানসিকতাও গভীরভাবে ব্যক্ত হয়। বাংলাভাষী অঞ্চলের হিন্দু মুসলমানের ঐকান্তিক নিবিড় বন্ধুত্ব তিনি কামনা করেন। কামনা করেন মনের উচ্চতা ও ঔদার্য। তবে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতা কোনভাবেই ধর্মকে উপেক্ষা করে বা বিরোধিতা করে নয়। তিনি মনে করেন মানুষের যেমন রাষ্ট্র না হলে চলে না, তেমনি ধর্ম না হলেও চলে না। তাই সাহিত্যের আলোচনা থেকে তিনি ধর্মকে বাদ দিতে চান নি। তিনি মনে করেন সাহিত্যিকের একমাত্র অন্বিষ্ট মানবজীবন এবং তিনি এও মনে করেন যে, মানবজীবনের লক্ষ্য অবশ্যই ভালো কাজ, ভালো চিন্তা, ভালো আদর্শ। এই ভালোত্বের সঙ্গে ধর্মেরও একটা সম্পর্ক আছে। সকল ধর্মের সকল আচরণবিধির লক্ষ্যই মানবকল্যাণ। মানুষের জীবন যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে লালিত ও বর্ধিত হয় সেই বেষ্টনীর প্রতি সাহিত্যিকের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। তাঁর মতে সাহিত্যিক-কে সমাজের বিভিন্ন বিশেষত্বের দিকে লক্ষ রেখে উচ্চতর মানবতার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করতে হবে। সাহিত্যিককে এরূপ দায়িত্ব পালন করতে হলে কেবল সমাজজীবনের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলেই চলে না। সমাজ অভ্যন্তরের নানা ক্লেদ, গ্লানি, নানা অনাচার, নানা দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে এক বিরামহীন সংগ্রামও তাঁকে চালাতে হয়। মানবকল্যাণধর্মী সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে বাংলাভাষী এই অঞ্চলে কী কী বাধা রয়েছে তাঁর একটি বিবরণ দিয়েছেন এস. ওয়াজেদ আলি। তাঁর মনে, বাঙালি বা মুসলমানের জীবনে হীনতাসূচক মনোবৃত্তি এমন গভীরভাবে মূলীভূত হয়ে আছে যে, তা বাঙালির উন্নতি বা বিকাশের পথে এক কঠিনতর বাধা। সাহিত্যিককে এই মানসিকতা দূর করার ব্যাপারে গবেষণা ও লেখনীর মাধ্যমে তৎপর হতে হবে। বাঙালি মুসলমানদের সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য কী, হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে এর সম্পর্ক, না কি ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে, এ ব্যাপারেও সাহিত্যিককে হতে হবে সজাগ। তাছাড়া এ দেশের দারিদ্র্যময় জীবন – কিভাবে তার উৎপত্তি, কিভাবে তা বিদূরিত হতে পারে – এসবও সাহিত্যিকের চিন্তা ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু হবে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যিকের কাছে দাবি অতিশয় জীবনঘনিষ্ট মানসিকতার। জীবনের সকল প্রান্ত – তার ধর্ম, তার সংস্কৃতি, তার জাতিসত্তা, তার প্রাত্যহিক জীবনাচরণ থেকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সবকিছু সাহিত্যিকের অন্বিষ্ট হবে। তাহলেই একজনের পক্ষে সততার সঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টি এবং তার মাধ্যমে মানবের ও সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধন সম্ভবপর হবে। এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্য ও শিল্পভাবনা ছিল স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। তাঁর মতে, মানুষের অস্তিত্ব চিন্তাই সাহিত্য-শিল্পে রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং এর মধ্যেই সমাজের সার্বিক কল্যাণ নিহিত।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের প্রথমার্ধ বাঙালি মুসলমানের আত্ম-আবিষ্কারের কাল। সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মুসলমান মধ্যবিত্ত রেনেসাঁসের চেতনা-স্নাত হয়ে প্রগতির পথে অগ্রসর হতে সচেষ্ট। মূলত উনিশ শতক ছিল ঔপনিবেশিক গহ্বরে পতিত হওয়ার পর্যায় কিন্তু বিশ শতক ঔপনিবেশিকতা ছিন্ন করে, জাতীয়তা ও মানবমুক্তির চেতনা বিকাশের কাল। ফলে এ-সময়ে সর্বত্র সংগ্রামী প্রেরণা লক্ষণীয়। সমকালে এস. ওয়াজেদ আলি বাঙালি মুসলমানের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞানমনস্ক গতিশীল জীবনভাবনার অধিকারী। সকল প্রকার অন্ধতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং অমানবিকতার বিপরীতে তিনি উজ্জীবিত করেছেন মানবীয় মুক্তির দ্যুতি। মধ্যবিত্ত মানসের পলায়নবাদী বাস্তবতার বিপরীতে তিনি মানুষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি সমাজ, সময়, রাজনীতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা অনুভব করেছেন এবং এই দায়বদ্ধতা থেকেই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা তাই সমাজ ও মানবভাবনায় আবর্তিত হয়েছে এবং প্রবন্ধের ক্ষেত্রেই তা পরিপূর্ণ বিকাশ ও স্থিতিলাভ করেছে। সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ, মননশীল, সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। মানব প্রাধান্যই তাঁর সমাজ-ভাবনার মূলকথা। সমাজের অশিক্ষা, মানসিক দুর্বলতা তাঁকে ব্যথিত করেছে এবং বাস্তববাদীর মতোই উত্তরণ সন্ধান করেছেন। ধর্মকে স্বীকার করেও তিনি ধর্মভিত্তিক সমাজ কিংবা রাষ্ট্রকে গ্রহণ করেন নি। ধর্ম তাঁর নিকট ব্যক্তিগত আবেগ নিয়েই ধরা পড়েছে। জাতিগত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠবার সামর্থ এস. ওয়াজেদ আলির মধ্যে লক্ষণীয় মাত্রায় বিকশিত। ফলে বিশ্বমানবিক আবেগ ছিলো তাঁর আয়ত্তে। এক ভারতীয় জাতীয়তায় তিনি বিশ্বাসী হলেও বহুত্বের মধ্যে একত্বের নীতি থেকেও বিচ্যুত হন নি। তিনিই প্রথম বাঙালি, সচেতনভাবে বাঙালির রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রাধিকারের কথা বলেছেন। ভারতীয় জাতীয়তা টিকতে পারে কেবল স্বতন্ত্র জাতিসত্তার স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে।

তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষে বাঙালিরাই সর্বপ্রথম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তুলবে এবং তা লাহোর প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার আগেই উচ্চারিত। আজকের বাংলাদেশ তাঁর সেই দূরদৃষ্টির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁর নিকট সমাজ-কর্মী হিসেবেই স্বীকৃত। যাবতীয় অবক্ষয়বাদী সাহিত্যচর্চা তাঁর অপছন্দের এবং তিনিও একজন সমাজ ও মানবতাবাদী কর্মী হিসেবেই তাঁর সাহিত্যকর্মকে গতিশীল রেখেছেন। তাই তাঁর প্রবন্ধ-পাঠ বিশ শতকীয় সমাজ-রাজনীতি-মানবভাবনার উৎস সন্ধানে অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ।

তথ্যনির্দেশ

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী-১*, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১ (প্রসঙ্গত)

২. সাহিত্য পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

৪. *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী*-২, সংগ্রহ ও সম্পাদনা, সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৫০৭

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১০

৬. *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী*-১ , পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯-৩০

৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১১. 'নারী ও সমাজ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮-৫৯

১৬. 'তরুণ ও প্রবীণ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২-৬৩

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

১৯. 'তরুণের কাজ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

২১. 'বাঙালী মুসলমান' পূর্বোক্ত পৃ. ৪১

২২. পূর্বোক্ত পৃ. ৪১

২৩. *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী*-১ , পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

২৪. 'শিক্ষার আদর্শ': পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

২৫. 'সাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

২৬. 'শিক্ষার আদর্শ', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

২৭. 'রাষ্ট্রের রূপ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১-৯২

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২-৯৩

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৪

৩০. 'ধর্মের প্রচার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

৩১. 'জনসেবায় ইসলাম', পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩

৩২. 'ধর্মের প্রচার', পূর্বোক্ত, পৃ. ১০০

৩৩. 'রাষ্ট্রের রূপ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

৩৪. 'ধার্মিক ও অধার্মিক', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

৩৫. 'সাহিত্য' পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৩৬. 'রাষ্ট্রের রূপ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯০

Dhaka University Institutional Repository

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯১

৪০. 'তাজপুর ইনষ্টিটিউট', পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৪১. 'ভবিষ্যতের বাঙালি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭

৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭-৭৮

৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮

৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০

৪৭. 'রাষ্ট্রের রূপ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯

৪৮. 'রাষ্ট্রের রূপ', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২

৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২

৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৩

৫১. 'সাহিত্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৫২. 'সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চার কথা', পূর্বোক্ত পৃ. ১১৯

৫৩. 'সাহিত্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৫৪. 'সাহিত্য সম্বন্ধে দু'চার কথা', পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৫৬. 'সাহিত্যের লক্ষ্য', এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী-২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৭

৫৭. 'সাহিত্যের লক্ষ্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬-৫০৭

৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৮

৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০৬

৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১০

৬১. 'সাহিত্য', *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী-* ১, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪-১৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এস. ওয়াজেদ আলির ছোটগল্প

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই গতিশীল জীবনের রূপভাষ্য হিসেবে বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)-এর একক প্রচেষ্টায় ছোটগল্প তার শৈশব ও কৈশোর পর্যায় অতিক্রম করে বুদ্ধিদীপ্ত, আবেগময়, তীক্ষ্ণ-মনস্তাত্ত্বিক, বাস্তব ও কল্পনার মিশ্রণে মোহময় স্বতন্ত্র যৌব-শ্রী অর্জন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক নিস্তরঙ্গ জীবনের ছোটগল্পে আবেগ প্রাধান্য স্বীকৃত। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগযন্ত্রণা, গতি ও নেতির দুর্বিপাক জীবনকে বিচূর্ণ-বিভঙ্গ করেছে এবং সমানুপাতে ছোটগল্পের বিষয় ও রূপাঙ্গিকে পালাবদল ঘটেছে। এই পালাবদলে রবীন্দ্রনাথই অগ্রণী এবং প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) প্রতিষ্ঠিত *সবুজপত্রই* সমকালের গতিশীল জীবনের মুখপত্র। সমগ্র উনিশ শতক এবং বিশ শতকের প্রথম দশকেও আমরা কোন বাঙালি মুসলমানকে গল্পকার হিসেবে পাই নি। গল্পকারের আলোড়িত গতিশীল জীবনবোধ বোধগম্য কারণেই মুসলিম সমাজে অনুপস্থিত ছিল। তবে বিশ্বযুদ্ধ গঠমান মধ্যবিত্তের মনোজগতে তীব্র অপ্রাপ্তিবোধের ক্ষত সৃষ্টি করেছে অন্যান্য সামাজিক অনুষঙ্গসহ। ফলে প্রকাশের অন্তর্প্রেরণা অনুভূত হয়েছে এবং প্রবন্ধকার, দায়বদ্ধ সাহিত্যকর্মে বিশ্বাসী এস. ওয়াজেদ আলিও সৃষ্টিশীল পথে এগিয়ে এসেছেন।

এস. ওয়াজেদ আলির চারটি গল্পগ্রন্থ : *গুল-দাস্তা* (১৯২৭), *মাশুকের দরবার* (১৯৩০), *দরবেশের দোয়া* (১৯৩১) এবং *ভাঙ্গা বাঁশী* [প্রকাশকাল নেই]। এস. ওয়াজেদ আলি মূলত সমাজ-দায়বদ্ধ কথাশিল্পী। তাঁর কথাশিল্পের বিষয়বস্তু সামাজিক সমস্যা কেন্দ্রিক, এবং সমস্যার সমাধানও গল্পদেহে যুক্তি পরম্পরায় উপস্থাপিত হয়। তাঁর গল্পে জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি প্রকাশিত হয়েছে ভাবপ্রাধান্য ও মননতীক্ষ্ণতার দীপ্তি – এ-ক্ষেত্রে তিনি প্রমথ চৌধুরীর অনুসারী। গল্পে বিষয়বস্তু নির্বাচনে যেমন তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা, মনোদৃষ্টি ও আন্তরিকতা সুস্পষ্ট, রচনাশৈলীর ক্ষেত্রেও তাঁর সার্থকতা নিশ্চিত। আমাদের সমাজ জীবনের বিশেষ বিশেষ জায়গার অবস্থা ও সমস্যায় তিনি আলো ফেলেছেন সুকৌশলে, শিল্পনিপুণতায়। সীমিত সংখ্যক গল্পের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে গল্প-শিল্পের কাঠামো। চরিত্রের মনোজাগতিক, পারিপার্শ্বিক ও বৈশ্বিক চিন্তাচেতনার ক্ষেত্রেও এস. ওয়াজেদ আলি নিপুণহস্ত। ঘটনার বাহুল্য কিংবা বর্ণনার আধিক্য তাঁর গল্পে তেমন নেই। রূপক ও চিন্তন প্রধান গল্প রচনায় তিনি সর্বাধিক প্রেরণা অনুভব করেছেন।

গুল-দাস্তা

দশটি গল্পের সংকলন *গুল-দাস্তা*। লেখকের পরিণত মনের পরিচয় এ-গ্রন্থ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। জীবনের দৈনন্দিন বাস্তবতা এবং অতীত প্রেক্ষাপটে স্মৃতিতাড়িত কল্পনা-মোহ গল্পগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলার গ্রামজীবন, মিশরীয় যুবক-যুবতীর প্রণয়কথা, শৈশব স্মৃতি, তুচ্ছ এক কবুতরের প্রতি স্নেহার্দ্র ব্যাকুলতা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই এস. ওয়াজেদ আলির সরল, প্রাণবন্ত বর্ণনা-

Dhaka University Institutional Repository

কৃতি মাধুর্যময়। নবতর জীবনবোধের সুস্পষ্ট উন্মেষ তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ থেকে লক্ষণীয়। ভ্রাতৃপ্রেম, দেশপ্রেম কিংবা যুবক-যুবতীর মানবীয় প্রেম সর্বত্রই তিনি আধুনিকতাবাহী মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন।

বিবাহ

গল্পের সূচনা কায়রোর এক সুসজ্জিত অট্টালিকায়। সেখানে তিনজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আলাপ-আলোচনা করছিলেন। একজন গল্পের নায়ক আব্বাসের বাবা– মিশর সরকারের শিক্ষা সচিব সাঈদ পাশা, আর একজন নায়িকা কুলসুমের বাবা –আলেকজান্দ্রিয়ার এক ভূম্যধিকারী ফারুক পাশা এবং হোসেন পাশা– সম্পর্কে সাইদ পাশার ও ফারুক পাশার– চাচাতো ভাই এবং বাল্যবন্ধু। হোসেন পাশা বয়সে তাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। কায়রোতে বসে আলাপের এক পর্যায়ে সাঈদ পাশা তার ছেলে আব্বাসের সাথে কুলসুমের বিয়ের কথা বলে। এ কথা শুনে কুলসুমের বাবা ফারুক পাশা জানায় তার মেয়েকে ফারুকের সাথে বিয়ের কথা বলেছিল। কিন্তু তার মেয়ে এখন বিয়েতে অপারগতা জানিয়েছে এবং বিয়ে করলেও কোন অচেনা অজানা ছেলেকে বিয়ে করবে না; মনের মিল কারো মাঝে খুঁজে পেলেই সে বিয়ে করবে।

ছোটবেলা থেকেই কুলসুম ও আব্বাস কেউ কাউকে দেখে নি। একদিন কুলসুম ও অব্বাসকে সাথে নিয়ে হোসেন পাশা একই দিনে 'China' নামের এক জাহাজে চড়ে বিলাতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। ওদের টিকেট কেনা হয়েছিল ছদ্মনামে। আব্বাসের নাম দেয়া হয়েছিল আবু আহম্মদ ইউসুফ আর কুলসুমের নাম দেয়া হয়েছিল ডাক্তার আবেদা হানুম। জাহাজ পোর্ট সৈয়দ ছাড়ার পর জাহাজের ডেকে কুলসুমকে আব্বাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে। এরপর চার চোখের মিলন। আব্বাস লজ্জা পেয়ে একটা অভিবাদন দিয়ে সরে পড়ে। কিন্তু অব্বাসের মন পড়ে থাকে মিশরীয় যুবতী কুলসুমের কাছে। এক ঘটনায় একদিন আবার তাদের দেখা। মিশর সমস্যা নিয়ে ইংরেজ যুবকদের সাথে চলছিল আব্বাসের তর্ক-বিতর্ক। আব্বাসের মুখে স্বদেশের প্রশংসা শুনে কুলসুম তার প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়। এক পর্যায়ে কুলসুম সেই তর্ক যুদ্ধে তার পক্ষ নেয়। পরে ইংরেজরা তর্ক ছেড়ে সেখান থেকে সরে যায়। এক সময় নির্জন ডেকে তারা আবেগপ্রবণ হয়ে একজন আর একজনকে ভালবাসে। জাহাজে মাত্র তাদের দু'সপ্তাহ কাটে। এর মধ্যেই তারা কথা দেয়া নেয়া ও মন দেয়া নেয়া শেষ করে। পরে একদিন হাতে বিদায়- চুম্বন দিতে গিয়ে আব্বাস কুলসুমের ওষ্ঠ চুম্বন করে। তারপর এক সময় জাহাজ লন্ডন বন্দরে পৌছালো। কুলসুম একটা টেক্সি করে হোটেল মোসলে যায়। আর আব্বাস যায় হোসেন পাশার সাথে সেভয় হোটেলে। হোটেল থেকে আব্বাস তার বাবাকে লিখলো জাহাজে আসার পথে এক মিশরীয় মেয়েকে সে পছন্দ করেছে। মেয়ের বাবা বিয়ের প্রস্তাব দিলে এতে তার মত আছে বলে সে জানায়। কুলসুম ও অনুরূপ আর একটি চিঠি তার বাবাকে লিখলো। পরে হোসেন পাশার পরামর্শ মতো ফারুক পাশাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে আসে। কুলসুম ও আব্বাস এ-ঘটনা দেখে অবাক হয়। পরে সব রহস্য জানাজানি হয়। এতে লজ্জায় ও আনন্দে তারা অভিভূত হয়। এক সপ্তাহ পরে লন্ডনের সেভয় হোটেলের এক সুসজ্জিত কক্ষে তাদের বিয়ে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভাবের স্বচ্ছতা ও প্লটের নতুনত্ব দেখাতে এস. ওয়াজেদ আলির কৃতিত্ব অনন্য। ছোট্ট একটা ঘটনাকে আবেগময় করে প্রকাশ করার অসাধারণ শিল্প কৌশল তিনি প্রয়োগ করেছেন এ গল্পে। গল্পের প্লটকে আলোচনা আর যুক্তিতর্কের মধ্যে এনে ছোটগল্পের রসকে ভারাক্রান্ত হতে দেননি। অথচ গল্পাংশ ও তর্কাংশ মিলিয়ে একটা গল্পের পরিবেশ গড়ে তুলেছেন। এটাই তাঁর লেখার গল্প সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এতে বাংলা সাহিত্য পেয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বাদ-স্পর্শ। তাঁর 'বিবাহ' একটা প্রেমের গল্প। এই জীবনধর্মী গল্পে তিনি জীবনের সহজ আবেগ ও অনুভূতিকে জমাট হতে না দিয়ে তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখেছেন। এই বুদ্ধির খেলায় এস. ওয়াজেদ আলি প্রকাশ করেছেন , অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে তাঁর অভিজাত মনের অনন্যতা। ফলে তাঁর গল্পের গঠনভঙ্গি তাঁকে সমকালীন লেখকদের থেকে পৃথক করেছে। ছোটগল্পে থাকে হৃদয়বোধের প্রকাশ। 'বিবাহ' গল্পে হৃদয়বোধের প্রকাশ থাকলেও তার প্রয়োগ সর্বত্র শুদ্ধ, সংযত ও বুদ্ধির দ্বারা তাকে শোধন করে পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগ করা হয়েছে।

রুস্তম খাঁ

সীমান্তের পাঠানদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ। রোস্তম খাঁ নামের এক পাঠান সর্দার ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করলো না। পরাধীন জীবনের চেয়ে বিপদ সংকুল জীবনকে সে শ্রেয় বলে মনে করে। কিন্তু সীমান্তের এ যুদ্ধে অবশেষে ইংরেজরা জয়ী হলো।

একদিনের ঘটনা, ইংরেজদের খাবার সরবরাহে ঠিকাদার লালা হরদয়ালকে রোস্তম খাঁর লোকেরা জোর করে তুলে নিয়ে যায় এবং তার ভাই চিন্ময় লালকে চিঠি দেয় দশ হাজার টাকা নিয়ে হায়দার খাঁর মসজিদে এক সপ্তাহ পর দেখা করতে। তা না হলে লাল হরদয়াল এবং চিন্ময় লাল উভয়কেই হত্যা করা হবে। এ খবর পেয়ে চিন্ময় লাল ভীত হয় এবং মিনতির সুরে ইংরেজ বাহিনীর অধিনায়কের ছেলে রস সাহেবকে অনুরোধ করে এই চিঠির কথা তার বাবা জেনারেল স্টিফেনসন যেন না জানতে পারেন। তার ভয় রস সাহেবের বাবা জানতে পারলে হরদয়ালকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না।

রোস্তম খাঁকে কোন অলৌকিক উপায়ে বন্দি করার একটা নায়ক সুলভ বাসনা রস সাহেবের মনে জেগে উঠলো। পরদিন কাউকে কিছু না বলে এক পাঠান সওয়ারের সঙ্গে রস সাহেব রোস্তম খাঁর উদ্দেশ্যে ছাউনি থেকে বেরিয়ে পড়লো। দশ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে একটা নির্জন স্থানে এসে উপস্থিত হলো। হঠাৎ বন্দুকের ভয়ংকর শব্দে সেই নির্জন গিরিপথ কেঁপে উঠলো। তার সঙ্গী-সওয়ার আহত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। চোখের পলকে চার পাঁচ জন পাঠান সেই বন থেকে বেরিয়ে তাকে ঘিরে ধরলো। আর সঙ্গে সঙ্গে রিভলভারটা বের করে রস সাহেব সর্দারের দিকে তাক করলে সর্দার বিদ্যুৎ গতিতে সেটা ফেলে দিলো। রস সাহেব কোন রকম ভয় না করে বললো, বন্দিকে হত্যা করা সমরনীতির বিরুদ্ধ। উত্তরে পাঠান সর্দার রোস্তম খাঁ বলেছেন : 'তুমি গুপ্তচর। সমর নীতি তেমিার রক্ষা করতে পারে না।' (*এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী-১*, পৃ. ৩৬৩) এরপর সেই পাঠান সর্দার রোস্তম খাঁ রস সাহেবের হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে গভীর স্নেহে তাকে আশ্বস্ত করেছে, জানিয়েছে অল্প বয়সের জন্যেই তাকে হত্যা করা হবে না, ইচ্ছা করলে রস সাহেব তার ছাউনীতে ফিরে যেতে

Dhaka University Institutional Repository

পারবে। রোস্তম খাঁর এ ব্যবহারে সে অবাক হয়েছে। "রোস্তম খাঁ, তোমার সম্বন্ধে এতদিন কি ভুল ধারণাই আমি পোষণ করে এসেছি। তোমার সাথে পরিচয় লাভ করে এখন আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। তোমার আজকের এই মহৎ ব্যবহারের প্রতিদান একদিন হয়তো আমি দিতে পারবো।" (পৃ. ৩৬৩) রোস্তম খাঁ যখন জানতে পারলো রস সাহেব ইংরেজ অধিনায়কের ছেলে তখন সে তাকে গভীর আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল যে, জেনারেল সাহেবের ছেলের সাথে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হওয়ায় সে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করছে। তারপর রস সাহবেকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলেছে, "আজ থেকে সাহেব তুমি আমার ধর্মপুত্র। আর আমি তোমার ধর্ম পিতা।" (পৃ. ৩৬৪) রস সাহেবও রোস্তম খাঁকে ধর্মপিতা হিসেবে মেনে নেয়। রোস্তম খাঁ বন্দি হরদয়ালকে ফিরিয়ে দেয় এবং ফিরবার সময় রস সাহেব রোস্তম খাঁকে কথা দেয় যে, সে তার বাবার সাথে দেখা করে আবার ফিরে আসবে। রস সাহেবকে না পেয়ে তার বাবা যখন অনুসন্ধানের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন, তখন হরদয়ালকে সাথে নিয়ে রসকে ফিরতে দেখে তার ক্রোধ ও শংকা আনন্দে পরিণত হলো। ছেলের কাছে রস সর্দারের মধুর ব্যবহারের কথা শুনে সে আরও চমৎকৃত। একদিন রস সাহেবের বাবা জেনারেল স্টিফেনসন তার ছেলের অনুরোধে একটা চিঠি দিয়ে রোস্তম খাঁকে নিমন্ত্রণ করলো। চিঠি পেয়ে রোস্তম খাঁ আনন্দিত হয়ে একজন মাত্র অনুচর সঙ্গে নিয়ে জেনারেল সাহেবের ছাউনিতে এলো। জেনারেল সাহেবের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে রোস্তম খাঁ রস সাহেবের সঙ্গে তার ধর্মপুত্র সম্বন্ধের কথা জানিয়েছে। অনেক আলোচনার পর জেনারেল সাহেব তাকে ইংরেজ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করার অনুরোধ জানায়। আর তাকে আশ্বাস দেয় যে, 'মালিক' উপাধি এবং মসিক দশহাজার টাকার মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেবে সরকারের পক্ষে থেকে। এ প্রস্তাব রোস্তম খাঁ গ্রহণ না করে উত্তরে বললো যে, জীবনে সে কখনো বশ্যতা স্বীকার করে নি। একজন পরাধীন 'মালিকের' জীবনের চেয়ে বিপদ সংকুল জীবনই সে বেছে নেবে। রোস্তম সর্দারের এ কথা শুনে জেনারেল সাহেব তার হাত ধরেছে, বীরত্বের জন্যে তাকে অভিবাদন জানিয়েছে। আবেগে রোস্তম খাঁর হাত নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে বলেছে : 'রোস্তম, তুমি প্রকৃতই একজন বীরপুরুষ। তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। আল্লা আমাদের জীবনের বিভিন্ন পথ নির্দেশ করেছেন। আমার কর্তব্য আমি করব। তুমি যাকে তোমার কর্তব্য বলে মনে কর তা করে যাও। তবে যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন আমাকে চিরকাল তোমার 'খালেস দোস্ত' (অকৃত্রিম বন্ধু) বলে জেনো।' (পৃ. ৩৬৭)

অনেকদিন পরের কথা, জেনারেল সাহেব তখন অবসর নিয়েছেন। সীমান্তে আবার যুদ্ধ বেধেছে, রস সাহেব রেজিমেন্টের কর্নেল হয়ে যুদ্ধ করছে। একনি পাহাড়ের উপত্যাক্যায় বড় রকমের একটা যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের পর রস সাহেব রণক্ষেত্রে পরিদর্শন করতে যায় এবং তখন সে শুনতে পায় কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। তখন তার মনে ভেসে উঠলো ধর্ম পিতার কথা। ছুটে গিয়ে দেখে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে আছে তার সেই ধর্মপিতা রোস্তম খাঁ। তাড়াতাড়ি পাশে গিয়ে তার হাত ধরে কাছে বসলো, স্নেহ ভরা চোখে তারা এক অপরকে দেখতে লাগলো। কিছু সময় এভাবে কাটার পর এক শান্ত ও স্নিগ্ধ হাসি হেসে রোস্তম খাঁ বললো যে, সে রোজ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতো যেন যুদ্ধের মাঠে মরতে পারে, আর তার শেষ জখম যেন বুকের দিকে হয়। আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা জানায় তার শেষ ইচ্ছা

Dhaka University Institutional Repository

পূরণ করেছেন বলে। তারপর ব্যথিত কণ্ঠে তাকে জানায় : 'আমার বড় জোর কপাল রস বাবা। আমার শেষ সময় তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। কর্ণেল সাহেব কেমন আছেন?' (পৃ. ৩৬৮) এ কথা শুনে রস সাহেবের মনে অতীতের স্মৃতি জেগে উঠলো। তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠলো। রস সাহেব তাকে হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করাতে চাইলেন, কিন্তু রোস্তম খাঁ এতে রাজি হলো না। অবশেষে রোস্তম খা তাকে অনুরোধ করে : 'আমায় আর কষ্ট দিয়ো না। আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আল্লাহ যখন দয়া করে জীবনের শেষ মুহূর্তে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন, তখন সামান্য কছু অনুরোধ করে যাবো। আমার মৃত্যুর পর সেটি পালন করো।' (পৃ. ৩৬৮) তারপর অনেক কষ্টে জামার মধ্যে হাত দিয়ে একটা তাবিজ বের করে তাকে আবার অনুরোধ করলো : 'এই তাবিজটি আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়। এতে আমার জান্নাতবাসী পুত্র ইয়াকুবের একগাছি জুলফ্ আর বিবি ফাতেমার হাতের পাঞ্জার দাগ আছে। জুলফ্টিকে আমার সঙ্গে দাফন করো; আর ফাতেমার পাঞ্জার দাগটি হায়দার খাঁর এমামের হাতে দিও। তাকে বলো, তার মসজিদের জন্য এইটিই রোস্তম খাঁর শেষ দান।' (পৃ.৩৬৮) একথা বলতে বলতে রোস্তম খাঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

রোস্তম খাঁ একটি স্বদেশপ্রেম মূলক গল্প। এক পাঠান সর্দারের জাতীয়তাবোধ, স্বদেশপ্রেম ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় এ গল্পে প্রধান্য পেয়েছে। সীমান্তবর্তী পাঠানের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধ বর্ণনায় এ গল্পের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। এক আফ্রিদি পাঠান সর্দার রোস্তম খাঁর জীবনের দুটি দিক–একদিকে সে দৃঢ়চেতা, প্রতিবাদী বিপ্লবী জীবনে কখনো কারো কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নি। আর একদিকে সে মহান, উদার, দয়ালু ও ধার্মিক। শত্রুকে মুঠোয় দেখেও তাকে ক্ষমা করে। পরাধীন বিলাস বহুল জীবন ও গৌরবান্বিত উপাধি নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে বিপদসংকুল স্বাধীন জীবনকেই সে বেশি পছন্দ করে। স্নেহ-ভালবাসার আবেগে ইংরেজ অধিনায়কের ছেলেকে নিজের ছেলের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে বলে 'আজ থেকে সাহেব তুমি আমার ধর্ম পুত্র।' আবার সে আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাসী এক খাঁটি মুসলমান। আল্লাহর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ছিল বলেই রোজ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতো সে যেন যুদ্ধের মাঠে মরতে পারে।

স্বাধীনচেতা মানুষেরা কখনো কারো কাছে বশ্যতা স্বীকার না করলেও হৃদয়ের ভালবাসার কাছে পরাজয় মেনে নিতে দ্বিধা করে না। পাঠান সর্দার রোস্তম খাঁও তাই রস সাহেবের মধ্যে নিজের মৃতপুত্র ইয়াকুবের ছবি দেখে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাকে ধর্মপুত্র বানিয়ে স্নেহ ভালবাসার আবেগে জড়িয়ে ধরে পরম শান্তি লাভ করে। এখানে সন্তানের প্রতি পিতার স্নেহ ভালবাসা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ গল্পে বর্ণনার বাহুল্য নেই, ছোট্ট একটা ঘটনাকে মানবিক দুর্বলতার সূত্রে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছে।

জমিলা

মরু-প্রেম কাহিনী

নায়ক জাফর ঘোড়ায় চড়ে মরুপথ দিয়ে যাচ্ছিল। দুপুরের কড়া রোদ সহ্য করতে না পেরে সে এক খেজুর বাগানে বিশ্রাম নেয়। এখানে এসে দেখতে পায় এক পরমা সুন্দরী রমণী একটি ছোট্ট শিশুকে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ে খেলা করছে। এই সুন্দরী জমিলাকে দেখে সে তার ক্লান্তির কথা ভুলে যায় এবং জমিলাও জাফরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারা একে অন্যের প্রেমে আপ্লুত হয়। জাফর জমিলার হস্তচুম্বন করলে জাফরের প্রতি- চুম্বন শেষে বলেছে: "অমি তোমায় ভালবাসি" (পৃ. ৩৭০) এবং সন্ধ্যে পর্যন্ত জাফর এখানে থেকে জমিলাকে বিদায় জানিয়ে বলেছে: "তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। আবার কখন তোমার দেখা পাবো?" (পৃ. ২৭৩) কিন্তু কিছুদূর যাবার পর কাবিলার শত্রুদের হাতে বন্দি হয় এবং তারা তাকে বিচারের জন্যে বনি আমরের প্রধান শেখ আব্দুল ওহাবের কাছে নিয়ে যায়। বিচারে জাফরের মাথা কেটে শাস্তি দেয়ার নির্দেশ হলে আব্দুল ওহাবের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে তার স্বামীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে জাফরের প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু আব্দুল ওহাব শর্ত দেয় যে, সে এক বছর বন্দি থাকার পর মুক্তি পাবে। এক বছর বন্দি থাকার পর মুক্তি পেয়ে জাফর সেই স্মৃতি বিজড়িত খেজুর বাগানে এসে দেখে যে, জমিলারা সেই তাবু ছেড়ে চলে গেছে। তখন নায়ক জাফর মনের দুঃখে বলতে থাকে: "আমি বেহেস্ত চাই না, আমি জান্নাত চাই না, আমি হুর গোলমান চাই না। আমি চাই কেবল আমার জমিলা। আর কাউকে আমি চাই না, আর কিছুই আমি চাই না।"(পৃ. ৩৭২)

'জমিলা' মরুপ্রেমের গল্প। ছোট্ট একটা অনুভূতিকে একানে রূপময় করে তোলা হয়েছে। গল্পটিতে নরনারীর হৃদয়বোধের প্রকাশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নায়ক জাফর ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। মরুপথের কড়া রোদ সহ্য করতে না পেরে এক খেজুর বাগানে বিশ্রাম নিতে গিয়ে জমিলা নামের এক পরমা সুন্দরী রমণীর দেখা পেয়ে ক্লান্তির কথা ভুলে যায়। এক পর্যায়ে নায়ক আবেগপ্রবণ হয়ে নায়িকা জমিলার হস্ত চুম্বন করে এবং নায়িকাও গভীর আবেগে নায়ক জাফরের মুখ-চুম্বন করে ভালবাসার স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু ঘটনার দুর্বিপাকে তাদের প্রেম বিরহ-ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়েছে, মিলনের প্রত্যক্ষ প্রাপ্তি আসে নি।

মানব হৃদয়ের সামান্য একটা অনুভূতি, সামান্য একটা আবেগ ও দুর্বলতা নিয়ে এ গল্প রূপময় হয়ে উঠেছে। এ গল্পে রোম্যান্টিক অনুভূতি থাকলেও এ গল্প সমাপ্তি লাভ করেছে নায়ক জাফরের হাহাকারের মধ্যে দিয়ে।

তারা

লক্ষ্মণ মণ্ডলের মেয়ে তারা সুন্দরী এবং তার বিয়ে হয় এক অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলের সঙ্গে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বিয়ের ছয় মাস পর সে বিধবা হয়ে বাবার বাড়িতে এলো এবং এলে লক্ষ্মণের স্ত্রী খুব ভেঙে পড়ে। লক্ষ্মণ তার স্ত্রীকে এই বলে বোঝায় যে এটা তার কপালের লিখন। বিধবার বেশে বাবার বাড়িতে এসে তারা হাফ ছেড়ে বাঁচলো। বিয়ের পর সে শ্বশুর বাড়িতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে নি। বাবার বাড়িতে এসে সে মানসিক শান্তি ফিরে পেলো। শ্বশুর বাড়িতে বসে তারা তার দেশের কথা ভাবতো, আর তার ছোট্টবেলার স্মৃতিচারণ করতো। সে বসে বসে ভাবতো পুকুরে সাঁতার কাটার কথা, তাদের গ্রামের মাঠের কথা। আর মাঝে মাঝে ভাবতো রোস্তম সর্দারের ছেলে জলিলের কথা। রোস্তম সর্দার অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছিল এবং তার বিধবা স্ত্রী জলিলকে নিয়ে রাস্তার পাড়ে একটা খড়ের ঘরে থাকতো। বিশ বাইশ বছর বয়সী সুদর্শন জলিল তারার চেয়ে পাঁচ বৎসরের

Dhaka University Institutional Repository

বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও উভয়ই ছিল খেলার সঙ্গী। তারা জলিলের মাকে চাচি বলে ডাকতো। দিনের বেশির ভাগ সময়ই সে জলিলদের বাড়িতে থাকতো। এভাবে মেলামেশার ফলে তারা একজন আর একজনকে ভালবেসে ফেলে।

বিধবা হয়ে তারা বাবার বাড়িতে ফিরে এসে পুনরায় জলিলের সাথে মেলামেশা করতে লাগলো। একদিন তারা ভবানন্দ জমিদারের বাগান বাড়ির পাশ দিয়ে আসছিল। সেই বাড়ির বারান্দায় জমিদারের ছেলে সত্যানন্দ বন্ধু বান্ধবের সাথে মদ্যপান করে আমোদ প্রমোদে মগ্ন ছিল; এবং তারার শ্লীলতাহানীর চেষ্টা চালায়। কিন্তু পথযাত্রী জলিল চিৎকার শুনে এসে জমিদারের পুত্রকে মাথায় আঘাতে আহত করে এবং তারাকে উদ্ধার করে।

অবশ্য সত্যানন্দের বন্ধুরা জলিলকে ঘিরে ফেলে এবং সবাই মিলে মারপিট করে তাকে থানায় চালান দেয়। বিচারে জলিলের এক বৎসর কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে বেরিয়ে জলিল বটগাছের আড়ালে তারাকে দেখতে পায় এবং জানতে পারে সে মুসলমান হয়েছে। এখন তার নাম রহিমা। জলিলের মার কাছেই সে থাকে এবং চটের কলে কাজ করে। তারপর জলিলের খুব কাছে এসে এক প্রাণ মাতানো চোখে তার দিকে চেয়ে তারা বললো, "এখানে যে চাচী আর আমি ঘর নিয়েছি। আমি চটের কলে কাজ করি। তাতেই আমাদের কোন রকমে দিন চলে। তুমি ফিরেছ। এখন আমাকে নেকা করে আমাদের দেখা শুনা করবে চলো।" (পৃ. ৩৭৬)

এ গল্পে তৎকালীন সমাজের এক অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দুর মেয়ে হয়েও মুসলমানের ছেলের মন জয় করেছে তারা এবং পরে মুসলমান হয়ে জলিলকে বিয়ে করেছে। তৎকালীন সমাজের সনাতন প্রথার বিরুদ্ধে কথা বলতে লেখক কুণ্ঠাবোধ করেন নি। তারার মুসলমান হওয়ার পিছনে কাজ করেছে জলিলের প্রতি তার ঐকান্তিক ভালোবাসা। বিধবা হয়ে বাবার বাড়িতে আসার পর জলিলের প্রতি গভীর আকর্ষণই তাকে মুসলমান হতে সাহায্য করেছে। এক বছর পর জেল গেটের সামনে তারাকে দেখে তখন সে অবাক হলো। তারপর আরো অবাক হলো তারার মুসলমান হওয়ার কথা শুনে। এক সাথে পথ চলতে চলতে এক সময় তারা জলিলকে বিয়ে করার অনুরোধ জানায়। এ কথা শুনে জলিল গভীর আবেগে তারাকে বুকে টেনে নেয়। নিয়তি তাড়িত জীবনকে আমরা যেমন অস্বীকার করতে পারি না তেমনি আমরা কঠিন বাস্তবকেও অস্বীকার করতে পারি না, তারার বিধবা হওয়া নিয়তি নির্ধারিত। কিন্তু জমিদারের ছেলের লালসার শিকার হওয়া একান্তই বিকৃত সমাজ বাস্তবতার পরিপূরক। মুসলমান হয়ে তারার চটের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করার মধ্যেও শ্রমজীবী মানুষের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভাবের স্বচ্ছতা ও প্লটের নতুনত্বে এস. ওয়াজেদ আলি নিঃসেন্দহে এখানে অনন্য। বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের বিবেচনা গল্পটিকে স্বতন্ত্র তাৎপর্য এনে দিয়েছে।

ভাই

হোসেন আর আহমদ দু'জনে মার্বেল খেলছিল। হোসেনের বয়স ন'বছর আহমদের সাত বছর এবং তারা আপন ভাই। মার্বেল খেলতে খেলতে দুই ভাইয়ের একবার কলহ বেঁধে যায়। এ মারামারি

Dhaka University Institutional Repository

দেখে তাদের চাচা দু'জনকে গালে চপেটাঘাত করেন এবং মিটমাট করে দেন। পরদিন তাদের মামা তাদের দু'ভাইকে নিতে আসেন, কিন্তু হোসেনের মা দু'ভাইকে এক সাথে না পাঠিয়ে শুধু হোসেনকে তার মামার সাথে যেতে দেন। আহমদ বাড়িতেই থাকে। একদিন আহমদের ভীষণ জ্বর হয়। তাদের বাড়ির চাকর এসমাইল জ্বরের খবর নিয়ে তাদের মামা বাড়ি যায়। এ খবর শুনে হোসেনের প্রাণ কেঁদে ওঠে। সে অস্থির হয়ে তাদের চাকরের সাথে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়িতে এসে দেখে যে তার মা মুখ বিষণ্ন করে আহমদের মাথার পাশে বসে আছে। হোসেন ঘরে ঢুকতেই আহমদ ম্লান হেসে তার মাকে বলেছে: "মা, ভাই এসেছে।" হোসেন আহমদের কপালে হাত দিয়ে দেখে তার গা খুব গরম। স্নেহ করুণ কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করে সে কেমন আছে? কিন্তু হোসেনের মা তার ভাইয়ের সাথে কথা বলতে নিষেধ করে এবং তাকে জানায় ওর খুব খারাপ অসুখ হয়েছে। আহমদ কিন্তু স্নেহমাখানো চোখে তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে যে, সে তার জন্যে একটা শালিক পাখির ছানা ধরে খাঁচায় রেখেছে। সে যেন ফড়িং ধরে তাকে খাওয়ায়। তারপর তাকে করুণ কণ্ঠে অনুরোধ করে তার কাছে বসার জন্যে। একথা শুনে হোসেন আর থাকতে পারলো না। ফুঁপিয়ে একেবারে কেঁদে উঠলো। তারপর তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো: "ভয় নেই আহমদ, আল্লা চাহেত তুই দুই দিনেই সেরে যাবি। অমন অসুখ মানুষের হয়েই থাকে।" (পৃ ৩৭৯) তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার বললো: "ভাই তোমার সঙ্গে সেদিন ঝগড়া মারামারি করে আমার বড় কষ্ট হয়েছে। তুমি বড় ভাই, তোমার সঙ্গে মারামারি করে আমি বড় অন্যায় করেছি।" (পৃ. ৩৭৯) তারপর অনুরোধ করে সে যেন আর রাগ না করে। চৌদ্দ দিন জ্বরে ভোগার পর আহমদ ভাল হয়। একমাস পর একদিন আবার দুইভাই মার্বেল খেলতে গিয়ে মারামারি শুরু করে। তখন তাদের চাচা এসে দুইজনের গালে চপেটাঘাত করে তাদের কলহ থামিয় দেন। তারপর দুইভাই যার যার জায়গায় চলে যায়।

কিশোর জীবনের আনন্দ বেদনা ও চঞ্চলতায় ভরা এক প্রীতিস্নিগ্ধ গল্প 'ভাই'। এ গল্পে কিশোর জীবনের এক নিখুঁত ছবি ফুটে উঠেছে। খেলতে খেলতে দু'ভাইয়ের মারামারি বেঁধে যাওয়া আবার মুহূর্তেই তা মিটমাট হয়ে যাওয়ার এক জীবন্ত ছবি এখানে প্রতিফলিত। কিশোর বয়সের মারামারি, শালিক পাখির ছানা ধরে খাচায় রাখা, ফড়িং ধরা ইত্যাদি ছবির মতো জীবন্ত করে তুলে ধরা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় : "ওয়াজেদ আলির 'ভারতবর্ষ', 'মুক্তির গান' প্রভৃতি রূপক হিসাবে উৎকৃষ্ট পক্ষান্তরে 'তারা' ও 'ভাই' ইত্যাদি বাস্তবতা ও মনস্তত্ত্বের বিবেচনায় প্রসিদ্ধ। তাঁর অনেকগুলি গল্পের বিষয়, ফর্ম ও ভাষারীতিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও সেগুলি কারো পুনরাবৃত্তি নয়, বরং স্বভাবে স্বতন্ত্র।"[১]

রাজা

রাজা একটা পোষা পায়রার নাম। লেখকের পায়রা পোষার সখ হলে কাঠের বাক্সের একটা খোপ বানিয়ে তিন-চার জোড়া পায়রা পুষতে লাগলেন। একদিন লেখক তাঁর দাদির সাথে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান এবং সেখানে অনেক পায়রার মধ্যে একটা পায়রা তাঁর খুব পছন্দ হয় এবং পায়রা দলের সর্দার মনে করে তাকে 'রাজা' 'রাজা' বলে ডাকতে ডাকতে তাঁর কাছে ছুটে যান। আত্মীয় তার আব্দার শুনে দুটি পায়রা 'রাজা' ও রাণীকে দিয়ে দিলেন। সেই পায়রা রাজা অন্যান্য পায়রাগুলোর সাথে রাজার মতোই থাকতে লাগলো। একদিন তিনি রাজার পায়ে নূপুর পরিয়ে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা সারা বাড়িতে নূপুর পায়ে বাক্‌বাকুম করতে করতে মাতিয়ে রাখতো। সকাল হলেই পায়রাগুলো খোপ থেকে বারান্দায় নেমে আসতো। লেখক তখন মনের সুখে ধান চাল ছড়িয়ে দিতেন। রাজার সাথে ধীরে ধীরে লেখকের বেশ ভাব জমে উঠলো। 'রাজা' বলে ডাকতেই পায়রাটা তাঁর কাছে ছুটে আসতো। কাছে আসলেই তিনি রাজাকে কখনো হাতে আবার বা কাঁধে বসাতেন। আবার কখনো বা তার ঠোঁটে চুমু দিতেন। রাজা আদর পেয়ে তখন গলা ফুলাতো। খাওয়া শেষ হলে রাজা তার দলবল নিয়ে চলে যেতো এবং বিকালে যথা নিয়মে ফিরে আসতো। একদিন দেখা গেল রাজা ফিরে আসে নি। কাঁদতে কাঁদতে এ খবর সে দাদির কাছে বললো। দাদি তাঁকে অনেক সান্ত্বনা দিলেন : "আচ্ছা ভাই, আর কেঁদো না। রাজার মত তোমার আর একটা পায়রা কিনে দেবো।" (পৃ. ৩৮৩) কিন্তু তাঁর মন এ কথায় প্রবোধ মানলো না। তিন চারদিন পর একদিন তাদের পাশের গ্রামের রহিমদের বাড়িতে গিয়ে দেখে যে, তাঁর পায়রা রাজা ওদের উঠানে। 'রাজা' 'রাজা' বলে ডাকতেই সে তাঁর দিকে মুখ ফেরালো এবং আনন্দে মাথা নাড়তে নাড়তে তার কাছে ফিরে এলো। রহিম তখন অপরাধীর মত চুপ করে এ দৃশ্য দেখছিল এবং এক পর্যায়ে রহিম নিজেকে সামলে নিয়ে জানায়, এ পায়রা কামালের নয়, এ পায়রা সে নবাবপুর থেকে কিনে এনেছে। তার কথা কামাল বিশ্বাস করতে পারলো না। তিনি তাঁর পায়রা ফিরিয়ে দেবার জন্যে রহিমকে অনেক অনুরোধ করেন। কিন্তু রহিম সে অনুরোধ রাখেনি। এমন কি এক পর্যায়ে তিনি পায়রা কিনতেও চেয়েছেন। কিন্তু রহিম পায়রা বেঁচতে রাজি হয় নি। এ ঘটনার প্রায় দু-সপ্তাহ পর একদিন বিকালে রাজা অন্য সব পায়রার সাথে এসে হাজির হলো। তারপর অনেক আদর করে রাজার মুখে চুমু খেয়ে তাকে দলের মধ্যে ছেড়ে দিলো। এরপর পায়রা গুলো যে যার খোপে গিয়ে ঢুকলো। রাজার পায়ে নূপুর নেই। দেখে কামাল তখনই মাধব সেনের দোকান থেকে চার পয়সা দিয়ে একটা নূপুর কিনে আনে এবং রাতে সেটা মাথার কাছে রেখে শুয়ে পড়ে এবং মনে মনে ঠিক করে সকালে উঠতেই রাজার পায়ে পরিয়ে দেবে। কিন্তু ঘুম থেকে নূপুর পরাবার জন্যে 'রাজা' 'রাজা' বলে ডাকতেই তার চোখে পড়লো মেঝেতে রক্তের বড় বড় দাগ। পরে সে বুঝতে পারলো খোপের কাছে একটা মই দাঁড় করানো ছিল। রাতে সেই মই দিয়ে উঠে খাটাশে রাজাকে ধরে নিয়ে গেছে। ছেঁড়া পালক আর রক্তের দাগ দেখে লেখক বুঝতে পারলেন রাজার মত লড়াই করে সে মরেছে। তারপর দাদিজান, দাদিজান বলে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। প্রায় ত্রিশবছর আগে রাজাকে হারালেও আজও তার 'বাকবাকুম' 'বাকবাকুম' লেখকের কানে করুণ সুরে বেঁজে ওঠে এবং রাজার সেই সুন্দর মূর্তি ও তার ঘরে ফেরার স্মৃতি তার মন প্রাণকে বেদনায় কাতর করে।

সামান্য একটা পায়রার প্রতি স্নেহ লেখক অসাধারণ শিল্পমণ্ডিত করে প্রকাশ করেছেন। পায়রা পোষার একটা সখকে কেন্দ্র করে এ গল্পের অবতারণা। দাদির সাথে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়ে লেখক একটা পায়রা দেখে পছন্দ করে নিয়ে আসেন। এই পায়রাটাই রাজা নামে পরিচিত এবং গল্পের নায়ক। একবার রাজাকে হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ তারপর আবার রাজাকে খাটাসে ধরে নেয়ার দুঃখ ত্রিশ বছর পরেও লেখক ভুলতে পারেন নি। কিশোর জীবনের কিছু কিছু ঘটনা একবার দাগ কাটলে তা আর ভুলতে পারা যায় না। ত্রিশ বছর আগে 'রাজা'কে হারিয়ে আজও লেখকের মনে রাজার সেই 'বাক্‌বাকুম' 'বাক্‌বাকুম' ধ্বনি, তার সেই সুন্দর মূর্তি এবং রাজার সেই গৃহ প্রত্যাবর্তনের স্মৃতি তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করে। এস. ওয়াজেদ আলির বিশেষত্ব এই যে, তিনি তুচ্ছ একটা বিষয়কে

Dhaka University Institutional Repository

নিয়েও অভিনব শিল্পরূপ দান করেছেন। তাঁর গল্পগুলোর চরিত্র ও পটভূমিকায় বৈচিত্র্য আছে। এ প্রসঙ্গে কবি কাদের নেওয়াজের বক্তব্য স্মরণীয়: "এস. ওয়াজেদ আলি সাহেবের ছোট্ট গল্প 'রাজা' পড়ছিলুম, এ রাজা কিন্তু অন্য কেউ নয়–একটা পায়রা। .... পাঠক পাঠিকা হয়ত ভাবছেন লেখক কি অন্য বিষয়বস্তু পান নি, যে একটা তুচ্ছ পায়রাকে করেছেন গল্পের নায়ক? এইখানেই কিন্তু সাহিত্যিক ওয়াজেদ আলির বৈশিষ্ট্য। এ কথা বিস্মৃত হলে মূলেই ভুল করা হবে। আগেই বলে রাখি এই লেখক গতানুগতিক লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন। তিনি নিজেই নিজের পথ কেটে চলতে শুরু করেছেন। এই অসাধারণ শক্তিই তাঁকে বিষয়বস্তুতেও অসাধারণত্ব দেখাতে বাধ্য করেছে। যদিও গাছের পাতা ও ফুলের মতো স্বাভাবিকভাবে এটা তাঁর কাছে এসেছে তবুও এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে প্রথম শ্রেণীর লেখকের স্তরেই স্থান দিয়েছে এ কথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না। ... ... ওয়াজেদ সাহেবের ছোটগল্প ও ঠিক তাই। বিভিন্নমুখী পাঠক এদের ভিতর থেকে বিভিন্ন চিন্তাধারা আহরণ করে নেয়, কিন্তু যিনি জ্ঞানী ও সন্ধানী তিনি বেশ বুঝতে পারেন যে, লেখকের রচনায় সত্য ও সুন্দরের রূপই আলুলিত হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অবশ্য এ দিকটাতে চাই অন্তর্দৃষ্টি। বলতে কি এই অন্তর্দৃষ্টিই লেখককে যাদুকর করে তুলেছে। সামান্য তুচ্ছ বস্তুও লেখকের যাদুর কাঠির স্পর্শে হয়ে ওঠে অনবদ্য ও সুন্দর।"[১]

ভাঙ্গাবাঁশী

লেখক বার লাইব্রেরিতে আসা যাওয়া এক রকম বন্ধ করে দেয়ার পর অনেকের কথাই ভুলে যান। অবশ্য দু'চারজনের স্মৃতি এখনও স্মৃতিপটে আঁকা রয়েছে। এর মধ্যে রায় সাহেব নামে এক মহাজনের স্মৃতি এখনও ভুলতে পারেন নি। রায় সাহেব হুগলি জেলার এক জমিদারের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। রায় সাহেব পেশায় ব্যারিস্টার, এবং তাঁর পেশার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে একজন সেরা ও সার্থক লোক। ইংরেজি কাগজে লেখকের একটা লেখা পড়ে রায় সাহেব একদিন বার লাইব্রেরিতে লেখার অনেক প্রশংসা করেন এবং দু'একটি ব্রিফও তাকে পাঠিয়ে দেন। তাই রায় সাহেবের প্রতি লেখকের ছিল অন্তরের টান। এক কথায়, রায় সাহেবের উদার হৃদয় ও তার ব্যক্তিত্বই মানুষকে আকর্ষণ করতো।

হাইকোর্ট ছাড়ার পর রায় সাহেবের সাথে আর লেখকের তেমন দেখা হতো না। তারপর দু'বছর পর একদিন ইডেন গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে লেখকের সাথে তাঁর দেখা হয়। অপ্রত্যাশিত দেখায় তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। দুজনে আলাপ করতে করতে এক সময় কোর্ট ছাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেই রায় সাহেব ঘৃণার সাথে বলেছিলেন, "কোর্টের ভণ্ডামি তাঁর ভালো লাগে না।" রোজ রোজ সত্যকে মিথ্যা বানাতে বানাতে তাঁর নিজের উপর একটা ঘৃণা জমে গিয়েছিল। তাই প্রাকটিস ছেড়ে কিছুটা শান্তি পেয়েছেন। এক পর্যায়ে কথায় কথায় রায় সাহেব বলেছিলেন যে, তিনি জন্মেছিলেন আর্টের জন্যে; সাহিত্যের জন্যে। আর্ট আর সাহিত্য নিয়ে থাকলে তিনি জগতকে কিছু দিতে পারতেন। কিন্তু নিজের স্বার্থের দিকে চেয়ে তিনি কিছু করতে পারেন নি। কথায় কথায় বললেন, রায় সাহেব তার বাবার একমাত্র ছেলে হয়েও কখনো বাবার বিষয় সম্পত্তির উপর কোন লোভ করেন নি। কিন্তু তাঁর বাবা চেয়েছিলেন ছেলে ব্যারিস্টারি পাশ করে ব্যারিস্টার হয়ে অনেক টাকা আয় করুক। রায় সাহেবের মা ছিলেন আবার ভিন্ন প্রকৃতির লোক– সাহিত্যমনা। এমন কি বাংলা সাহিত্যেও ছিল তার বেশ

Dhaka University Institutional Repository

অভিজ্ঞতা। তিনি সুন্দর সুন্দর কবিতাও লিখতেন। রায় সাহেবের বাবা নয় বৎসর বয়সে একদিন তাঁকে কলকাতায় রেখে আসেন। এরপর থেকে মাঠে মাঠে ঘোরা, বিরলে বসে বাঁশি বাজানো আর চাঁদনি রাতে রূপকথা শোনা সব কিছুই তার বন্ধ হলো। কলকাতায় আসার সময় কাঁদতে কাঁদতে তিনি তাঁর প্রিয় বাঁশিটি দেশে রেখে আসেন। কলকাতায় এনে তাঁর বাবা তাঁকে হেয়ার স্কুলে ভর্তি করেন। এখানে প্রথম পরীক্ষাতেই তিনি শীর্ষ স্থান অধিকার করেন। তারপর এন্ট্রান্স, এফ.এ, বি.এ এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তারপর বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরে আসেন। তারপর প্রাকটিস শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার খুব প্রসার প্রতিপত্তি হলো। ব্যবসায়ে তখন তিনি ডুবে থাকেন। ব্যবসায়ে থাকলেও কৈশোরের ভাবপ্রবণতা কিন্তু তাকে ছাড়ে নি। কথায় কথায় আরো বললেন ছয় মাস আগে তাঁর স্ত্রী মারা যায়। এই দুর্ঘটনা তার জীবনকে উলট-পালট করে দেয়। তাঁদের কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। ফলে প্রাক্‌টিস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারপর ফিরে গেলেন কৈশোরের স্মৃতি জড়ানো তাঁর দেশের বাড়িতে। এখানে এসে তাঁর বাল্য জীবনের অনেক কথাই মনে পড়লো। প্রথমেই মনে পড়লো তাঁর মায়ের স্নেহ ভালবাসার কথা, তাঁর দিদিমার আদর সোহাগের কথা। তাঁদের বাড়ির পুরানো চাকর ধেনু অনেক আগেই মারা গিয়েছিল। সেই ধেনুর ছেলে রাম তাকে অভ্যর্থনা করে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেল। বাড়িতে ঢুকেই মরিচা ধরা তালাটি খুলে রুমে ঢুকে তাঁর মায়ের আলমারির একটা ড্রয়ার খুললেন ড্রয়ারের এক কোণে তাঁর ছোটবেলার ছবি। রূপার ফ্রেম দিয়ে বাঁধা তারই পাশে সযত্নে সাটিনে মোড়া তাঁর সেই পুরনো বাঁশি। তাঁর মা এটাকে মহামূল্য রত্নের মতো লুকিয়ে রেখেছেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি আর ঠিক থাকতে পারলেন না। দুই চোখে অশ্রু ঝরতে লাগলো। পরদিন সকালে সেই বাঁশিটি নিয়ে তিনি তাঁর বাল্যের স্মৃতি বিজড়িত সেই মাঠের দিকে গেলেন। ব্যথিত মনে বাঁশিটি নিয়ে বাঁজাবার চেষ্টা করলেন। বাঁশিটি ফিস্‌ফিস্ করে উঠলো। কিন্তু তাঁর প্রাণ মাতানো সুর তাতে ফুটে উঠলো না। মনে হলো বাঁশির প্রাণ তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। রাতে সেই বাঁশিটি বালিশের নিচে রেখে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমিয়ে তিনি এক মধুর স্বপ্নে বিভোর হলেন। তারপর স্বপ্নে দেখতে গেলেন বাঁশিটি ফেপে বাড়তে লাগলো এবং বাড়তে বাড়েত সেটি দুভাগ হয়ে ফেটে গেল। আর তার মধ্য থেকে এক পরমা সুন্দরী রমণী বেরিয়ে এলো। তাঁকে প্রশ্ন করতেই জানালো যে, সে কোন সুন্দরী রমণী নয় – সে হচ্ছে বাঁশির প্রাণ। সেই সুন্দরী তাকে অমরলোকে নিয়ে যাবার আহ্বান জানালো। এক অপার্থিব গভীর আনন্দে তার মন ভরে গেল। এরপর দরজার শব্দে তার ঘুম ভাঙলো। চোখ খুলে দেখতে পান সকালের আলো ঘরে প্রবেশ করেছে। তাঁর সেই বিধবা আত্মীয়া দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছেন। এসব কথা বলতে বলতে রায় সাহেব হঠাৎ চুপ করে রইলেন। তারপর লেখককে রাত্রি গভীর হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিদায়ের আগে রায় সাহেব লেখককে অনুরোধ করে বললেন: "বুড়াকে একেবারে ভুলো না। মাঝে মাঝে দেখা করো।" (পৃ. ৪০১)

'ভাঙ্গাবাঁশী' একটি অতীত স্মৃতিজড়ানো গল্প। যার অন্তরালে আছে মায়ের আদর সোহাগ ও স্নেহ-ভালোবাসা। কিশোর জীবনের অনেক স্মৃতি মানুষ ভুলে গেলেও কিছু কিছু স্মৃতি মনে চিরদিন আঁকা থাকে। মায়ের কাছে সন্তানের স্মৃতি জড়ানো ভাঙ্গা বাঁশিটি যেমন অমূল্য ধন, তেমনি পরম আদরের বস্তু। রায় সাহেবের কিশোর জীবনের একটা ছোট্ট স্মৃতি নিয়ে গল্পটির অবতারণা। ভাঙ্গাবাঁশির মতো

Dhaka University Institutional Repository

একটি তুচ্ছ বস্তু লেখকের হাতে অভিনব শিল্পনৈপুণ্য লাভ করেছে। লেখকের জীবন-অভিজ্ঞতার মনোরম বর্ণনাই গল্পটিকে অনন্য করে তুলেছে। রায় সাহেবের স্মৃতি লেখক আজও ভুলতে পারেননি। রায় সাহেবের উদার হৃদয় ও ব্যক্তিত্ব তাঁকে আকর্ষণ করেছিল, শুধু তা নয় রায় সাহেবের কিশোর বয়সের ভাঙ্গাবাঁশির স্মৃতির কথাও তাঁর মনে দাগ কেটেছিল। এস. ওয়াজেদ আলির বিষয় চেতনা ছিল প্রখর। তাই তার গল্পগুলো বিশেষ আবহাওয়া ও আমেজে পরিপূর্ণ। তিনি ছিলেন সত্য সন্ধানী। পরিচিত সত্যকে স্বীকার করে তিনি তৃপ্তি পান নি। মাঝে মাঝে উপেক্ষিত সত্যকেও আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। তুচ্ছ একটা ভাঙ্গাবাঁশি কিশোর জীবনের স্মৃতি নিয়ে জেগে উঠলেও পরম আদর-যত্নে আলমারিতে রাখা বাঁশিটির মধ্যে আছে তার মায়ের অফুরন্ত ভালোবাসা। মায়ের এই স্নেহ-ভালোবাসাই ভাঙা বাঁশিটির স্মৃতি সূত্রে জীবন্ত হয়েছে রায় সাহেবের মনে। এখানেই গল্পটির চমকপ্রদ অভিনবত্ব।

কবির কিসমৎ

আবেদ আর মালেক দুই ভাই, তারা উট চরাতো। একদিন আবেদ আর একদিন মালেক এভাবে তারা উট চরাতো। একদিন আবেদের ছোট ভাই মালেক উট চরাতে গিয়ে নিজেদের উটের পাল ছেড়ে বনি ইহইয়া কাবিলার ছেলেদেরে কাছে কবিতা পড়ছিল। সেই সুযোগে তাদের এক শত্রু বনি কায়েসের লোকেরা তাদের সব উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। একসাথে এক পাল উট চুরি হওয়ায় আবেদ রাগ করে তাকে জানোয়ার, নিষ্কর্মা ও পাগল বলে গালি দেয়। মালেক তার ভাইকে কথা দেয় যে, সে লড়াই করে সব উট আবার ফিরিয়ে আনবে। এ কথা শুনে আবেদ তাকে তাড়িয়ে দেয় এবং জানিয়ে দেয় গৃহে তার অপ্রয়োজনীয়তার কথা। মালেক যাবার সময় তার ভাই আবেদকে বলে যায় যত উট সে হারিয়েছে দ্বিগুণ উট সে তাকে পাঠিয়ে দেবে। এই কথা বলে সে মরু প্রান্তর অতিক্রম করতে লাগলো। পথে চলতে চলতে সে কখনো ভেবেছে রাজা হবে, আবার কখনো ভেবেছে দস্যুদলের সর্দার হবে। হঠাৎ সে দেখতে পেল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হারেস ঘোড়ায় চড়ে তার দিকেই আসছে। তারপর মালেক বন্ধু হারেসকে সব কিছু খুলে বললো। সব কিছু শুনে হারেস তাকে জানায় যে, আগামী পরশু আমীর ইহইয়ার জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার প্রাসাদে কবিদের এক প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিতায় সবাইকে হারাতে পারলে আর দস্যুগিরি করতে হবে না। তারপর একদিন যথাসময়ে তারা আমীরের দরবারে উপস্থিত হলো। শুরু হলো- কবিতা পাঠ। সবার কবিতা পড়া হলে আমীর দর্শকদের উদ্দেশ্য করে বলেন: "আপনাদের মধ্যে আর কেউ কবিতা পড়তে ইচ্ছা করেন।" (পৃ. ৪০৯) তখন হারেস তার বন্ধু মালেকের কথা বলে জানায় যে, মালেক একজন স্বভাব কবি। এখনও সবার কাছে পরিচিত হতে পারেন নি। আমিরের অনুমতি পেলে সে কবিতা পড়বে। আমিরের অনুমতি নিয়ে কবিতা পড়ে মালেক সবাইকে অবাক করে দিল। কবিতার আসরের সবাই বলতে লাগলো এমন কবিতা তারা আগে কখনো শোনে নি। আমির এই তরুণ কবির কবি-প্রতিভা দেখে আনন্দের সাথে ঘোষণা করলেন যে, তিনি এই তরুণ কবির কবিতায় মুগ্ধ হয়ে তার একমাত্র কন্যার সাথে তার বিবাহ দেবেন। মালেকের সাথে আমীর কন্যার বিয়ের দাওয়াত পেয়ে তার ভাই আবেদ যথা সময়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়। বিয়ের পর মালেক তাদের উট চুরির কথা আমীরের কাছে খুলে বলে এবং আমীর মালেককে প্রয়োজনীয় উট সরবরাহ করে।

Dhaka University Institutional Repository

আমীর কন্যাকে বিয়ে করে মালেক অনেক ধন সম্পত্তির মালিক হয। কিন্তু আমীর কন্যা ছিল অহঙ্কারী ও বদমেজাজী। তাই আমীর কন্যাকে বিয়ে করে মালেক সুখী হতে পারলো না। একদিন পূর্ণিমার রাতে মালেক আমীর মহলে নিয়ে এক পরমা সুন্দরী দাসী সারার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তার কাছে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু আমীর কন্যা আমিনা প্রেম নিবেদনের এ দৃশ্য দেখে সারাকে প্রহার করে এবং এ ঘটনা মহলে জানাজানি হয়ে যায়। মালেক মুহূর্তমাত্র চিন্তা করেই নিজের সেই বিশ্বস্ত ঘোড়া নিয়ে পলায়ন করলো। প্রভুভক্ত ঘোড়া প্রভুর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বায়ুর গতিতে সীমাহীন মরুপ্রান্তর অতিক্রম করতে লাগলো।

'কবির কিসমৎ' গল্পটি সামান্য একটা ঘটনা নিয়ে শুরু হলেও গভীর হৃদয়াবেগে মধ্য দিয়ে তা সমাপ্তি লাভ করেছে। উট চুরির একটি ঘটনায় কাহিনীর সুত্রপাত। কিন্তু পরবর্তীকালে সেই কাহিনী হৃদয়ধর্মে প্রধান্য লাভ করে। উট চরানো জীবন থেকে হঠাৎ করে রাজকন্যাকে বিয়ে করার মধ্যে ঘটনার চমকপ্রদ আকস্মিকতাই বিদ্যমান। এ গল্পে হৃদয়বোধের প্রকাশ থাকলেও তার প্রয়োগ খুব সংযত। এ গল্পের ভাষায় কল্পনা ও আবেগের প্রধান্য থাকলেও তা মুখ্যত উপমা-প্রসাধিত ও চিত্রাত্মক বাক্যবন্ধে উজ্জ্বল। যেমন: "সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল। মরু-প্রান্তর কোন মায়া রাজ্যের রজত সমুদ্রের মত চকচক করছিল। দূর পাহাড়ের রাখাল বালকের বাঁশির করুণ সুরের ব্যথিত মুর্চ্ছনা সেই প্রান্তরকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোন ইন্দ্রজালাবদ্ধ রাজকুমারী তার প্রাসাদ কারাগারের গবাক্ষে বসে তার সুদূরবাসী রাজপুত্রের কাছে প্রেমের আকুল আহ্বান সমুদ্রের লহরগুলির উপরে কম্পিত শঙ্কিত হৃদয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে। কেঁদে কেঁদে সে যেন বলছে, প্রাণ আমার, হৃদয় আমার, এসো তুমি। এই সুদূর মায়া দ্বীপের এই দুর্ভেদ্য কারাগার থেকে তুমি আমায় উদ্ধার করে নিয়ে যাও। তুমি উদ্ধার না করলে আমি আর বাঁচবো না।" (পৃ. ৪১৩-১৪)

পৌত্তলিক

আলি হোসেন লেখকের প্রতিবেশী। ঠাকুর পূজা করতো বলে পঞ্চায়েত করে লোকে তার ঠাকুর ভেঙে দেয়। আবার শোনা যায় যে, সে পুতুল পূজা শুরু করেছে। আলি হোসেনের বয়স বিশ বছর। সে মুসলমান। লোকে তাকে 'পাগল' বলে অপবাদ দিলেও লেখক তাকে বেশ স্নেহের চোখে দেখতেন। পঞ্চায়েত তার শাস্তি দিলে তিনি খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। একবার দেশে ফিরে লেখক আলি হোসেনকে ডেকে পাঠান। আলি হোসেন এলে লেখক তাকে সব কিছু খুলে বলার অনুরোধ করেন। আলি হোসেন জানায় যে, সে দেয়ালে কালীর একটা ছবি টানায় এবং ছবির উপর গাঁদা ফুলের মালা রেখে দেয়। একটা ছোট্ট ছেলে এটা দেখে গিয়ে রটনা করে দেয়। পরদিন বিচারে ছবিটি তার সামনে নষ্ট করে এবারের মতো তাকে মাফ করে দেয়। তারপর আলি হোসেন তাকে জানায় যে, আল্লাহ তাকে কালীর মূর্তিতে দেখা দিয়েছেন। ঈশ্বরকে সে তার মনের মধ্যে দেখতে পায়। সে তার কল্পনার রাজ্যে ঈশ্বরকে শরীরী অবস্থায় দেখতে পায়। ভাদ্র মাসে একদিন বেলা ছ'টার সময় আলি হোসেন মোহাম্মদপুরের মাঠ দিয়ে বাড়ি আসছিল। আকাশে একটু কালো মেঘ দেখা দিয়ে ঝড় এলো। হঠাৎ সে দেখতে পেলো আকাশের পশ্চিম কোণে সোনার মেঝের মতো চক্‌চক্ করছে। আর সেই উজ্জ্বল ভূমিকার উপর কালীর এক স্বর্গীয় মূর্তি সে দেখতে পায় এবং সেই কালী মূর্তি তাকে সংকেত দিয়ে জানায় যে,

Dhaka University Institutional Repository

তার কোন ভয় নেই। তাকে মারবে না। সৃষ্টিই তার ধর্ম, লয় শুধু তার খেলা। মৃত্যু মিথ্যা, জীবন সত্য, তার মৃত্যু নেই। তাকে নিঃশঙ্ক মনে ঘরে ফিরে যাবার আহ্বান জানালো। কথাগুলো তার কাছে স্বগীয় বাণীর মতো মনে হলো। ভক্তির সাথে সে সেই অলৌকিক মূর্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম করলো। তারপর চেয়ে দেখে ঝড় থেমে গেছে, বৃষ্টি উঠেছে। আর সেইদিন থেকে সে কালীর পূজা শুরু করে দেয়। এ কথা শুনে লেখক তাকে জানায় যে, কালী-দেবী তাকে দেখা দিয়েছে যদি সে মনে করে থাকে তা হলে সে ভুল করেছে। এ কথা শুনে আলি হোসেন ম্লান মুখে লেখকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। আলি হোসেনের মনের অবস্থা দেখে লেখক দুঃখ পেলেও আলি হোসেনকে আশ্বাস দিয়ে বলেন : "আচ্ছা, এখন এসো। তোমার উপর যাতে কোন অত্যাচার না হয় সে চেষ্টা আমি করবো। আর তুমিও একবার চেষ্টা করে দেখো সেই কল্পনার ছবি মন থেকে সরাতে পারো কিনা।" (পৃ. ৪২২)

সনাতন বিশ্বাস একবার মানুষের মনে দাগ কাটলে সেই বিশ্বাস কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। কোন কিছু কল্পনা করতে করতে এক সময় তা মানুষের মনে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে। আলি হোসেন ছোটবেলা থেকে হিন্দু দেব-দেবীর কল্পনা করতে করতে এক সময় এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যে, এখন সে সব কিছুর মধ্যেই কালী মূর্তি দেখতে পায়। মোহাম্মদপুরের মাঠ দিয়ে বাড়ি আসার পথে পশ্চিম আকাশের কোণে কালো মেঘের মধ্যেও কালীর মূর্তি দেখেছে, এটা তার কল্পনাপ্রসূত মনের বিশ্বাস। কল্পনা কখনো কখনো মানুষের মনে এমনভাবে জায়গা করে নেয় যে, সেই কল্পনাই পরম সত্য বলে মনে হয়। আলি হোসেনের বেলায়ও তাই হয়েছে। একটা ছোট বিষয় মানুষের মনোজগতে কী প্রভাব ফেলতে পারে এ গল্পে লেখক সে কথাই বোঝাতে চেয়েছেন।

আধুনিক চিত্রকলা ও সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবণতা সুররিয়ালিজম। এই চেতনায় বিশ্বাসী শিল্পী, সৃষ্টিশীল সত্তা কোন প্রথাবদ্ধ বিশ্বাস ও কথিত বা প্রতিষ্ঠিত নান্দনিক প্রত্যয়ের আলোকে বস্তু ও জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেন না। ব্যক্তির জীবনকে সার্বভৌম জ্ঞান করায় জগৎ ও জীবনকে তারা চরিত্রের অন্তর্গত চৈতন্যের দৃষ্টিকোণ থেকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফলে নির্মিত হয়েছে সুপার রিয়ালিটি বা পরাবাস্তবতার। এস. ওয়াজেদ আলির সুররিয়ালিজম সচেতন মনের পরিচয় আমরা পেয়েছি তাঁর গুলদাস্তার (১৯২৭) বিভিন্ন গল্পে। আর এই বিশেষ মেধার বাস্তব প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি 'পৌত্তলিক' গল্পে। আলি হোসেনের চেতনার বিভ্রম জন্ম দিয়েছে পরাবাস্তবতার। প্রথাবদ্ধ রীতিতে তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে আলি হোসেনের এ চৈতন্য- স্বরূপ নির্মাণ সম্ভব ছিল না। এস. ওয়াজেদ আলি তাই ব্যবহার করেছেন সুররিয়ালিজম রীতি ও ভাষাশৈলী: "দেখলুম, আকাশের পশ্চিম কোণটি সোনার মেঝের মত চক্ চক্ করছে। আর সেই উজ্জ্বল ভূমিকার উপর কালীর কালো অথচ এক স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত মনোমোহিনী মূর্ত্তি নরক পালের হার গলায়, বাম করে রুধিরাক্ত খড়্গ নিয়ে স্বামীর ভূতলগত শরীরের উপর পা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছেন– আর নিজের প্রলয়াভিনয়ের কথা ভেবে যেন লজ্জায় রসনা চেটেছেন।" (পৃ. ৪২১)

Dhaka University Institutional Repository

মেয়ে

হাজি জহির একজন সম্ভ্রান্ত লোক, সামান্য অবস্থা থেকে পরিশ্রম করে একদিন বিপুল ধন সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। হজে গিয়েছিলেন বলে লোকে তাঁকে হাজি বলে ডাকে। সে যখন রাস্তা দিয়ে চলত লোকে তাঁকে সালাম দিয়ে পথ ছেড়ে দিত। অনেকদিন আগে হাজি সাহেবের বউ মারা গিয়েছে। সংসারে তার এক মেয়ে আর এক ছেলে। মেয়ের নাম নজিবা, ছেলের নাম কাশেম। মেয়ে নজিবাকে তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। হাজি সাহেব বেশি স্নেহ করতো তাঁর একমাত্র ছেলে কাশেমকে। নজিবাকে সম্পত্তির কোন অংশ দেবার খেয়াল তাঁর একেবারেই ছিল না। নজিবার জন্যে কিছু খরচ করাকে হাজি সাহেব অপচয় বলে মনে করতেন। হাজি সাহেব নজিবাকে বিয়ে দেন এক অল্পশিক্ষিত ছেলের সঙ্গে। তাঁর ভয় ছিল পাছে নজিবার অংশ তার স্বামী কাশেমের কাছ থেকে বুঝে নেয়। বিয়ের এক বছর পর নজিবা শ্বশুর বাড়ি যায়। নজিবা শ্বশুর বাড়ি গেলে হাজি সাহেব ভাবলেন এবার বুঝি কাশেমের সুখের পথের কাটা সরলো। এরপর কাশেমের বিয়ে হলো। অনেক দেখে শুনে খানপুরের জমিদার আশরাফউদ্দিনের পরমা সুন্দরী কন্যা আসমা খাতুনের সাথে কাশেমের বিয়ে হলো। অনেক ধুমধাম করে বিয়ের কাজ শেষ হলো। নজিবা বিয়ের পরও মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি আসতো। কিন্তু কাশেমের বউ তাকে দেখতে পারতো না। নজিবা গরীব বলে ঘরের চাকর-বাকরের চেয়ে বেশি তার আদর হতো না। নজিবা বাপের বাড়ির এ ব্যবহারে দুঃখ পেতো। কিন্তু বাপ ভাইয়ের মায়া কাটাতে না পেরে নীরবে সব কিছু সহ্য করতো।

হাজি সাহেবের বেহাই মীর আশরাফউদ্দিন একজন মামলাবাজ লোক। পাঁচ-সাত নম্বরের মোকদ্দমা তার কোর্টে লেগেই থাকতো। দেশের লোক তার নাম শুনলে ভয়ে আঁত্‌কে উঠতো। হাজির ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে সে নিজেকে ধন্য মনে করেছিল। একদিন মীর আশরাফউদ্দিন তার মেয়েকে দেখতে আসে হাজি সাহেবের বাড়িতে। খাওয়া-দাওয়ার পর কথা প্রসঙ্গে হাজি সাহেব তাঁর বেহাইকে জানায় যে, সংসারের কাজ-কর্ম আর তার ভাল লাগছে না। বিষয় সম্পত্তি কাশেমের হাতে ছেড়ে জীবনের বাকি ক'টা দিন খোদার এবাদত করেই কাটিয়ে দেবেন। এ কথা শুনে মীর সাহেবও জানায় যে, এখন দুনিয়াদারি খোদার এবাদতে মগ্ন হওয়াই ভাল। পরবর্তীকালে মীর সাহেবের পরামর্শ মতো হাজি সাহেব তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি কাশেমের নামে লিখে দেন।

একদিন হঠাৎ দেশে বসন্ত রোগ দেখা দিলো। ঘরে ঘরে লোকে এ রোগে আক্রান্ত হতে লাগলো। বেশির ভাগ লোকই এ রোগে মারা গেলো। একদিন হাজি সাহেবেরও জ্বর দেখা গেলো। ভয়ে তার শরীর শিউরে উঠলো। মীর সাহেব খবর পাওয়া মাত্র হাজি সাহেবকে অনেক বুঝিয়ে তাঁর মেয়েকে বাড়ি নিয়ে আসে। শুধু তাঁর ছেলে কাশেম আর এক চাকরানি হাজি সাহেবের দেখাশুনা করতে লাগলো। চার-পাঁচ দিনের মধ্যে হাজি সাহেবের গায়ে বসন্ত দেখা দিলো। কাশেম আর বাড়িতে থাকতে সাহস করলো না। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি শ্বশুর বাড়ি রওনা হলো। দু'দিন পর বাড়ির চাকরানিও ভয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলো। এখন আর হাজি সাহেবের মুখে পানি দেওয়ার জন্যে ঐ বাড়িতে কেউ রইলো না। কষ্টে হাজি সাহেব ছটফট করতে লাগলেন এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে খোদার কাছে মোনাজাত করতে লাগলেন। তাঁর জ্বরের প্রকোপ আরো বেড়ে গেলো এবং

Dhaka University Institutional Repository

শেষে বিকার উপস্থিত হলো। হাজি সাহেব দেখতে গেলো আসমান থেকে এক 'ফেরেশতা' এসে তার দেখাশুনা করছে। এক এক বার মনে হলো ফেরেশতাটা তার দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদছে। একবার তার মনে হলো এতো দেখতে তার মেয়ে নজিবার মতোই। তারপর তার মনে এক শান্তির ভাব এলো। সে ঘুমিয়ে পড়লো। হাজি সাহেবের ঘুম ভাঙার পর সেই বেহেশতার কথা তার মনে হলো। সে পাশ ফিরে চেয়ে দেখে এ যে তার মেয়ে নজিবা। মাথার কাছে বসে পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করছে। এ দৃশ্য দেখে এক ভাবাবেগে তাঁর প্রাণ ভরে গেলো। তারপর হাজি সাহেবের স্মরণ হলো এযে সংক্রামক রোগ, নজিবা কেন এ রোগের মধ্যে এলো। নজিবা এ কথা শুনে বলে যে, আল্লাহই তাকে দেখবে। তারপর বললো, বসিরের মা তাদের গ্রামে তাঁর মেয়েকে দেখতে গিয়েছিল তা না হলে সে কিছুতেই জানতে পারতো না। খবর শুনে সে পাঁচ ক্রোশ পথ পালকিতে কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। এ কথা হাজি সাহেব আর কিছুই বলতে পারলো না। নজিবার হাত ধরে কাঁদতে লাগলো। হাজি সাহেবের অসুখ সেরে গেলে নজিবা তার ভাই কাশেম ও কাশেমের বৌকে বাড়িতে আসার জন্যে লোক পাঠালো। একদিন মাগরবের নামাজের পর হাজি সাহেব একটা মোড়ায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। নজিবা পাশে পান বানাচ্ছিলো। হাজি সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নজিবাকে বলেছিলেন, সে নজিবার উপর বড় অন্যায় করেছেন, বড় জুলুম করেছেন। লাখ টাকার বিষয়-সম্পত্তি তাকে ভাগ না দিয়ে সব কিছু কাশেমকে দিয়েছে। কাশেমের জন্যে এত করেছে অথচ কাশেম তাঁর বিপদ দেখে সরে পড়েছে। কিন্তু নজিবা তা পারেনি। নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে সে তার সেবা শুশ্রুষা করেছে। সে কাছে না থাকলে হাজি সাহেব কুকুরের মতো মারা যেত। স্বর্থের মোহে সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এ কথা শুনে নজিবা তার পিতাকে জানায় যে, তিনি যেন খোদার কাছে তার জন্যে দোয়া করেন। বাবার দোয়াই তার কাছে বড় সম্পদ। "তুমি আমার জন্য আল্লার কাছে দোয়া করো, সেই আমার বড় সম্পদ হবে।" (পৃ. ৪২৯) হাজি সাহেব নজিবার মাথায় হাত রেখে হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি দিয়ে কাতর কণ্ঠে আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "হে রাব্বিল আল-আমিন, তুমি আমার নজিবাকে সুখী করো।" (পৃ. ৪২৯)

মানুষ মোহে আবদ্ধ থাকলে নিজের ভুল বুঝতে পারে না। কিন্তু চিরদিন মানুষ মোহে আবদ্ধ থাকে না। এক সময় সে তার নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং ভুলের জন্যে সে দুঃখ পায়। হাজি সাহেবের অনেক গুণ থাকলেও তাঁর একটা বড় দোষ ছিল যে, তিনি তাঁর মেয়ে নজিবাকে দেখতে পারতেন না। হাজি সাহেব মনে করতেন কাশেমই তাঁর সব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। নজিবাকে কোন অংশ দেবার কথা তিনি ভাবতেই পারতেন না। মেয়ের জন্যে কিছু খরচ করাকে তিনি অপচয় বলে মনে করতেন। কিন্তু একদিন তার এ ভুল ভেঙে যায়। এ গল্পে আমাদের সমাজের বাস্তব জীবনকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থ ও ধন সম্পদ এক শ্রেণীর মানুষের মনুষ্যত্বকে কীভাবে নষ্ট করে দেয় হাজি সাহেব চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক সে কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাশুকের দরবার

মাশুকের দরবার গ্রন্থে উনিশটি ছোটগল্প স্থান পেয়েছে। বাস্তব কাহিনী ভিত্তিক কিংবা চরিত্র সৃষ্টির কৌশলে বাণী প্রচার এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্মে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় নি। কেননা তাঁর মনোজগতে সর্বদাই একজন সমাজ-সংস্কারক প্রাবন্ধিকের সরব উপস্থিতি অনুভূত হয়েছে। ফলে গল্প তার সনাতন চরিত্র হারিয়ে প্রবন্ধ ও নীতিকথার মধ্যবর্তী রূপ গ্রহণ করে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। এ-বিষয়ে এস. ওয়াজেদ আলির অগ্রজ প্রমথ চৌধুরীর অবদানের কথা স্বীকার করা উচিত। তবে এস. ওয়াজেদ আলি আরো এগিয়ে গিয়ে চরিত্রের স্বল্প উপস্থিতি এবং ইঙ্গিতময় উপস্থাপনায় রূপকীয় আবহ তৈরিতে সক্ষম হয়েছেন।*মাশুকের দরবার* গল্প গ্রন্থ সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত স্বীকার করেও মনোজগত প্রাধান্যের তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিল্পীর জীবনভাষ্য।

মাশুকের দরবার

মাশুকের দরবারে এক মহা উৎসবে বিভিন্ন স্থান থেকে আশেকেরা তাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে সুন্দর সুন্দর উপঢৌকন। যার যেটা সবচেয়ে প্রিয় সেটা উপহার হিসাবে নিয়ে এসেছে। যে ধনী সে নিয়ে এসেছে মনিমুক্তার ডালি। যে শিল্পী সে এসেছে তার আঁকা প্রিয় ছবি। যে পণ্ডিত সে এসেছে তার গবেষণার গ্রন্থ নিয়ে। এরা সবাই ভাবছে মাশুক যার উপহার পছন্দ করবেন তারই গলায় তার প্রেমের হার পরাবেন। অবশেষে মাশুক প্রেমের হার পরালেন এমন এক জনকে যে খুব সাদাসিধা পোশাক পরে ভয়ে ভয়ে এক কোণে বসে ছিল। সে এসেছিল একটা 'কবিতার দেওয়ান' নিয়ে। দরবারে মাশুককে সেটা উপহার দিলে মাশুক দু-এক ছত্র পড়ে তাকে বললেন : "এত বড় ভাল জিনিস লিখেছ। তুমি দেখছি একজন প্রেমিক। তুমি বলো দেখি, আমায় কেন ভালবাস?" (*এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী*-২, পৃ. ২৬২) মাশুকের মুখে এ কথা শুনে আশেক সুললিত ভাষায় করুণ কণ্ঠে বললো : "তোমায় কেন ভালবাসি? তোমায় ভাল না বাসলে আমি যে বাঁচবো না, তাইতো তোমায় ভালবাসি। তুমিই আমার চোখের জ্যোতি, তুমিই আমার প্রাণের আনন্দ। তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার দুঃখ।"(পৃ. ২৬২) এ কথা শুনে মাশুক খুশি হয়ে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পরম আদরে তাঁর সেই বিশ্ববাঞ্ছিত ফুলের হারটি আশেকের গলায় পরিয়ে বলেছেন যে, তার মতো আশেকের দেখা পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন। "আশেকের সাক্ষাৎ লাভ করে আজ আমি ধন্য হলাম।" (পৃ. ২৬৩)

প্রকৃত প্রেমের বসবাস হৃদয়ে। জাগতিক জৌলুস এবং উচ্চকিত বাণী প্রচারে প্রেমের স্বরূপ অনুধাবন করা যায় না। 'মাশুকের দরবার' গল্পে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ককে আত্মিক প্রাধান্যের উপর স্থির করা হয়েছে। প্রেমিক তার অন্তর দিয়ে প্রেমাস্পদকে সন্ধান করে। রূপকী আবরণের ভেতর দিয়ে গল্পকার পৃথিবীর বিলাসের বিপরীতে আত্মিক উন্নতিকে মুখ্য করে তুলেছেন। পরম সত্তার সন্ধান পেতে হলে যেতে হবে আত্মার উৎসে, যেতে হবে সৃষ্টিশীল অন্তর্প্রেরণায়। কেবল ভোগ-বিলাস, লোভ, চটক-চাটুকারে পরিবেষ্টিত হয়ে জীবনের মোক্ষলাভ সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের ট্রাডিশনের কোন পরিবর্তন নেই। পঁচিশ বছর আগেও যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনই আছে। লেখক একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল দশ-এগারো বছর। লেখকের বাসার কাছে ছিল এক মুদির দোকান। সেই দোকানের পাশ দিয়ে লেখক যাওয়া আসা করতেন। সেই মুদির দোকানে এক বৃদ্ধ সুর করে রামায়ণ পড়তো। তার কাছে বসে এক মাঝারি বয়সের লোক গভীর মনোযোগ দিয়ে সেই রামায়ণ শুনতো। সেখানে দশ-এগারো বছরের আর একটা ছেলে বুড়োর কাছে বসে থাকতো। আর তার পাশে বসতো দুটি মেয়ে-তারা আনন্দের সাথে রামায়ণ পাঠ শুনতো। তারপর পঁচিশ বছর পেরিয়ে গেছে। পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছুর। কিন্তু পরিবর্তন হয় নি মুদির দোকানটির।

একদিন হঠাৎ করে লেখক সেই পথ দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলেন পঁচিশ বছর আগের সেই বাড়িঘর সব বদলে গেছে। আগে যেখানে গ্যাসের বাতি জ্বলতো, এখন সেখানে জ্বলে ইলেকট্রিক বাতি। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়লো সেই মুদি-দোকানটার উপর। বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি দোকানটার। দোকানে কেরোসিনের বাতি জ্বলছে আগের সেই বাতিটির মতো। পঁচিশ বছর আগে যে বৃদ্ধকে লেখক দেখেছিলেন ঠিক তারই মতো আর একজন বৃদ্ধ সুর করে রামায়ণ পড়ছিল। ঠিক সেই পঁচিশ বছর আগের ছেলেটির মতো একটি ছেলে খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। আর পাশে বসেছিল আগের মতো দুটি মেয়ে। দোকানে গিয়ে বৃদ্ধের কাছে বিস্ময়সূচক প্রশ্ন করে লেখক জানতে পারেন, অতীতে তিনি দোকানদারের পিতাকে রামায়ণ পড়তে দেখেছেন, আর দেখেছেন বর্তমান দোকানদারের পুত্র কন্যাকে। আজ তিনি যাদের দেখছেন তারা তারই সেই পুত্রের সন্তান। তারপর বৃদ্ধের হাতের বইটির দিকে ইঙ্গিত করে জানতে পারলেন ঐ বইটি ইতিহাসের রামায়ণ। তার দাদামশায় তার জন্মেরও আগে এক বটতলা থেকে এটা কিনেছিল। এ কথা শোনার পর লেখকের মনে হলো ভারতবর্ষের ট্রাডিশনের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। প্রকৃত ভারতবর্ষের একটা নিখুঁত ছবি তখন তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

'ভারতবর্ষ' একটি রূপক গল্প। এ গল্পে তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন-আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে। সময়ের সাথে সাথে সব কিছুর পরিবর্তন হলেও সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের কোন পরিবর্তন হয় নি। যে বিশ্বাসে সেই বৃদ্ধ দোকানদার রামায়ণ পড়তো পঁচিশ বছর পরও সেই একই বিশ্বাসে তার ছেলে রামায়ণ পড়ে তার নাতি নাতনীকে শোনাচ্ছে। এই গল্পে অস্পষ্ট হয়েছে তৎকালীন সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের অর্থনৈতিক পরিবর্তনহীনতার স্বরূপটি। এ গল্পে অল্প কথায় লেখক তৎকালীন সমাজ চিত্র নিখুঁতভাবে তুলে ধরে এক রূপক-প্রিয় শিল্প প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। এ গল্প ঘটনাক্রমকে অতিক্রম করে আমাদের পৌঁছে দেয় এক বোধের জগতে।

এস. ওয়াজেদ আলির গল্প সম্পর্কে *সতত স্বাগত* গ্রন্থে সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্য স্মরণ যোগ্য:

"ভারতবর্ষ ... গল্পের মধ্যে তিনি এদেশীয় জীবনের একটি অক্ষয় চৈতন্যকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিলেন। সতত পরিবর্তনশীল মানবজীবন ধারায় বিশ্বাস এবং অবলম্বনের একটি চিরলতা আছে

Dhaka University Institutional Repository

যাকে গ্রহণ করে একটি জাতি বেঁচে থাকে। এ উপমহাদেশে হিন্দু অথবা মুসলমান সকলের মানসভূমিতে বিশ্বাসের একটি মাধুর্য এবং লাবণ্য তাদের প্রতিদিনকার কর্মপ্রবাহের পশ্চাতে কাজ করছে। সময়ের পরিবর্তন হয়, মানুষের প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন হয় কিন্তু চিত্তের অবলম্বনের যে শাশ্বত বিশ্বাস তা কখনো পরিবর্তিত হয় না। তিনি সভ্যতার অগ্রগতির বিরুদ্ধে কিছু বলেননি কিন্তু বিশ্বাসের লালিত একটি সাধারণ মানুষের জীবনযাপনকে আমাদের সামনে উদঘাটন করেছে।"[২]

'মাশুকের দরবারে'র ভূমিকায় শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বলেছেন :

> ভারতবর্ষ-গল্পটি একটি অভিনব সৃষ্টি। অল্প পরিসরে এক মুদির ছোট্ট কথাটুকু– তাও তার কাজ কারবার লাভ॥লোকসান বা সুখ দুঃখ লইয়া নয়। ছোট দোকানে বসিয়া মুদি রামায়ণ গড়ে, নাতি-নাতনীরা শোনে, মুদির ছেলে অদূরে বসিয়া সওদা বেচে– দোকান ঘরখানি খোলার, ঘরে তেলের প্রদীপ জ্বলে। পঁচিশ বছর পরে পাড়ার চারিদিকে কত পরিবর্তন ঘটিয়া গেল– মাঠ কোঠা ভাঙিয়া প্রাসাদ উঠিল, জলা বস্তীর বুকে পার্ক দেখা দিল, মুদির কিন্তু তেমনি। বুড়া মুদির মৃত্যু হইয়াছে– তার জায়গায় তার ছেলে আজ সেই রামায়ণ খুলিয়া বসিয়াছে এবং তার নাতি-নাতনীকে পড়িয়া শুনাইতেছে। শুধু এইটুকু কথা।[৩]

তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় তুলে ধরে লেখক এ গল্পে এক অভিনব শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। স্বচ্ছ অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গির রূপময়তা পরিণামস্পর্শী, অতুলনীয়। জীবনের সামান্য অনুভূতির রেখাচিত্র অঙ্কনে গল্পকার বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়েছেন।

মাতাল

লেখক বাড়ি আসার পথে দেখতে পেলেন এক মাতাল তাদের গেটের সামনে কলের জল নিয়ে মদের বোতল ভরছে এবং সেই জল পানে মদের অভাব পূরণ করছে। উপস্থিত লোকজন তার এ আচরণ উপভোগ করছে। এ অমানবিক দৃশ্য দেখে লেখকের মায়া হয় এবং বাড়িতে নিয়ে তাকে মদ পান করতে দেন। কথায় কথায় মাতালের নিকট থেকে লেখক জানতে পারলেন নেশা হলে সে অস্থির হয়ে পড়ে, তাই বোতলে কলের জল ভরে কল্পনায় মদের সাধ মেটায়। মাতালের সাথে আলাপ করে লেখক এক চিরন্তন সত্য আবিষ্কার করলেন– নেশা ফুরিয়ে গেলে খালি বোতলে জল ভরে মানুষ কল্পনায় নেশা মেটায় এবং মাতালের মতো একটা নেশা না হলে প্রকৃত প্রেমিক হওয়া যায় না।

'মাতাল' গল্পটি রূপক গল্প। এ গল্পে তেমন প্লট নেই। কিন্তু গল্পের যা প্রাণ তা হলো ইঙ্গিতে জীবনের সুখ-দুঃখকে জাগিয়ে তোলা, গল্পটিতে সেই প্রাণ বিদ্যমান। মাতালের কথায় লেখকের সামনে এক চিরন্তন সত্য ভেসে উঠলো : "এই মাতালের মত একটানা একটা নেশা না হলে আমাদেরও চলে না। তা সে নেশা ধর্মেরই হোক কিম্বা স্বদেশিকতারই হোক কিম্বা বিশ্বপ্রেমেরই হোক।" (পৃ. ২৬৬)

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে এ-গল্পে মানব-মনস্তত্ত্বের জটিল একটি রূপকে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ কতকগুলো আকাঙ্ক্ষার পেছনে অনবরত ছুটছে। এটাই জীবনের নেশা। এই নেশা না থাকলে জীবন হয়ে পড়তো একঘেঁয়ে, প্রাণহীন ; মানুষ পরিণত হতো জড়বস্তুতে। অনবরত আকাঙ্ক্ষা বদলের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে জীবন্ত রাখছে। তেমনি সমাজ-জীবনেও একটির পর একটি আশা কিংবা নেশা এসে হানা দেয় এবং আমরা তাকে সাদরে গ্রহণ করে উদ্দীপ্ত হই।

চাঁদের আলো

পৃথিবীকে আলোকিত করে আকাশে চতুদর্শীর চাঁদ উঠেছে। কয়েকটা কুকুর উঠোনে বসে আছে খাবারের জন্যে। দলের কুকুরদের মধ্যে একটা কুকুর ছিল রোগা ও খিটখিটে। রোগা কুকুরটা চাঁদকে বেহায়া বলে গালাগালি করছে; বলছে চাঁদের কোন লজ্জা নেই, রূপের গর্বে সে লজ্জা শরমের মাথা খেয়েছে। রোগা কুকুরটার এ কথা শুনে দলের আর একটা কুশ্রী কুকুর তা সমর্থন করে বলে যে, এখানে জল্পনা-কল্পনা কোন লাভ নেই। বরং কোন জলার ধারে গিয়ে চাঁদেকে প্রাণভরে গালি দেওয়া যায়। একথা শুনে কুকুরের দল একটা মাঠের ধারে গিয়ে উপস্থিত হয়। তারপর সেই কালো কুকুরটা চাঁদের দিকে মুখতুলে চাঁদকে বেয়াদব পাজি বলে গালি দিয়ে বলে যে, চাঁদের রূপ থাকলেও তার মুখে আছে কালো দাগ। তাদের ধারণা রূপের অহংকার নয়, চাঁদের মতো বেহায়া আর ত্রিভুবনে নেই। এদিকে চাঁদ আরো উজ্জ্বল হয়ে আকাশে আলো ছড়াতে লাগলো। রোগা সেই কুশ্রী কুকুরটা অন্য কুকুরগুলোকে বুঝাতে লাগলো যে, তারা সবাই মিলে চাঁদকে কটুকথা বলতে থাকবে এবং এ ভাবেই তাকে শাস্তি দেয়া যাবে, কেননা কথায় বলে, গালের চোটে ভূত পালায়। কুকুরগুলো আগের মতো চাঁদকে গালি দিতে লাগলো : "ওরে চাঁদ, তোর মত বেহায়া এ ত্রিভুবনে নাই। ওরে চাঁদ তোর মত বেহায়া এ ত্রিভুবনে নাই।" (পৃ. ২৬৭) হঠাৎ একটা সাদা মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেললো। কিছু সময়ের জন্যে পৃথিবী আলোকহীন হলো এবং কুকুরগুলোর মুখে হাসি দেখা দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মেঘটা সরে গিয়ে চাঁদ আবার হেসে উঠলো। রাগে আর ক্ষোভে কুকুরগুলো চাঁদকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো: "আরে হতভাগা, তোর লজ্জা নেই। আরে হতভাগা তোর লজ্জা নেই।" (পৃ. ২৬৭) কুকুরের চিৎকার শুনে পাড়ার এক দুষ্টু ছেলে সহ্য করতে না পেরে লাঠি দিয়ে কুকুরগুলোকে প্রহার করতে লাগলো। এদিকে আর সব কুকুরগুলো ক্ষেপে গিয়ে রোগা কুকুরটাকে কামড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে দিলো।

'চাঁদের আলো' রূপক গল্পে লেখক আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় দুষ্টক্ষত পরশ্রীকাতরতার স্বরূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। চাঁদ আলো দিয়ে পৃথিবীকে মোহিত করছে, কিন্তু তার মাঝে কুকুর খুঁজে পেয়েছে বেহায়াপনা, উগ্র অহংকার এবং কালিমালিপ্ত কলঙ্ক। মূলত সমাজ জীবনের সাধারণ মানুষের স্পর্শের বাইরে চলে গেলে, জ্ঞানের মহিমায় আলো বিতরণ করতে গিয়ে মহৎ ব্যক্তিকে কটূ কথা শুনতে হয়। কুকুরের চিৎকারে যেমন চাঁদের কিছু আসে যায় না, সে তার আলো বিতরণ করেই যায় ; তেমনি মন্দ লোকের ছিদ্রান্বেষণেও মহৎ প্রাণের কর্মপ্রক্রিয়া বন্ধ থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

চণ্ডুর আড্ডা

একদল চণ্ডুখোর তাদের অড্ডায় বসে চণ্ডু খেতো। তাদের মধ্যে এক জনের নেশার ঝোঁক তেমন ছিল না এবং তাকেই অন্যেরা প্রহরীর দায়িত্ব দিয়েছে। তার দায়িত্ব ছিল শহর কোতওয়ালের আসার আগে সতর্ক করা, যাতে অন্যেরা আড্ডা থেকে নিরাপদে সরে পড়তে পারে এবং সূর্য ওঠার আগেই নেশার উপকরণ সরিয়ে ফেলতে পারে।

একদিন প্রহরী আকাশের তারা আর প্রকৃতির শান্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। সে মনে মনে শপথ করলো আর কখনো নেশা করবে না এবং এ নেশার আড্ডা সে ছেড়ে দেবে। এ কথা ভাবতে ভাবতে সে তার সঙ্গীদের সতর্ক করার জন্যে দরজায় ধাক্কা দিয়ে জানায় যে, শহর কোতওয়ালের আসতে আর বেশি বিলম্ব নেই। দরজার ভিতর থেকে তার বন্ধুরা এ কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে বিরক্ত না করার অনুরোধ করে। প্রহরী বারবার তাদের সতর্ক করাতে নেশাসক্ত অন্যেরা রেগে গিয়ে তাকে হাত-পা বাধা অবস্থায় ঘরের ভেতর ফেলে রাখে এবং পুনরায় চন্ডুর নেশায় ডুবে যায়। হঠাৎ শহর কোতওয়ালী এসে দরজায় লাথি মারতে লাগলো এবং এক পর্যায়ে লাথি মেরে দরজা ভেঙে ফেলল। তারা ভীত চোখে তাকিয়ে দেখে শহর কোতওয়ালী এক পৈশাচিক হাসিতে চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে আছে।

প্রকৃতির শান্ত গভীর সৌন্দর্যও মানুষকে প্রভাবিত করে। মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন আনে। চণ্ডুর অড্ডার প্রহরী বাইরে বসে আকাশের তারার সৌন্দর্য ও প্রকৃতির শান্ত শোভা দেখে বিমুগ্ধ হয়, পরিবর্তিত হয় তার মানসিক অবস্থার। চন্ডুখোরের ঘৃণিত জীবনের উপর তার বিতৃষ্ণা জন্মে। সে শপথ করে জীবনে আর কখনো চণ্ডু খাবে না।

382305

এ-গল্পে আজরাইলকে প্রাণ সংহারকের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। লেখকের সমাজ সচেতনতার ফল হিসেবেও গল্পটি বিবেচনা করা যায়। মুসলমান সমাজে যাবতীয় অন্ধতা ও কুসংস্কার পরিত্যাগের জন্য করাঘাত করে যাচ্ছে মহৎ প্রাণেরা। কিন্তু তারা চণ্ডুনেশাসক্ত ব্যক্তিদের মতোই যেন আপন স্বপ্নে বিভোর। ফলে একদিন তাদের যথার্থ মূল্যেই এর প্রতিবিধান করতে হবে।

গালিভারের নিদ্রাভঙ্গ

লিলিপুট দ্বীপের একটি মাঠে শুয়ে গালিভার ঘুমাচ্ছিল। তার পকেটগুলো ছিল খাবার জিনিসে ভরা। ঐ দ্বীপের জলবায়ুর প্রভাবে গালিভার গভীর অচেতন হয়ে পড়ে। আঙুলের মতো আকারের ঐ দ্বীপের লোকেরা এসে দেখে তাদের মতো আকৃতির বিপুল দেহের এক মানুষ মাঠ জুড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। প্রথমে তারা গালিভারের কাছে আসতে সাহস পাচ্ছিল না। পরে তারা সভয়ে কাছে এসে তাকে দেখতে লাগলো। গালিভারের কাপড় নাড়তে নাড়তে হঠাৎ একটা বামুনের হাত গালিভারের পকেটের মধ্যে ঢুকে গেলে। গালিভারের পকেট ছিল চকলেট আর টফিতে ভরা। আঙুল মুখে দিয়ে বামুন বুঝতে বুঝতে পারলো একটা চমৎকার জিনিষ সে পেয়েছে। তৃপ্তির সাথে সে আঙুল চুষতে লাগলো। ব্যাপারটা জানাজানি হলে অন্যান্য বামুনও গালিভারের পকেটে হাত দিয়ে চকলেটের স্বাদ নিতে লাগলো। এমন সুস্বাদু জিনিস তারা জীবনে কখনো খায় নি। গালিভারের পকেটে খাদ্যের প্রাচুর্য দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। অবশেষে তারা সভা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে গালিভার যেন জেগে না ওঠে তার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা করা দরকার। দেশের ভাল ভাল বাদকদেরকে সম্মোহনী রাগিণীর সৃষ্টি করতে হবে যাতে তার ঘুম চিরস্থায়ী হতে পারে। এর পর তারা সিদ্ধান্ত নেয় তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে যাতে সে ঘুম ভাঙলে উঠতে না পারে।

একদিন তারা গালিভারের বুকের উপর এক মেলার আয়োজন করে এবং সেখানে নাচ-গানে মেতে উঠে। এদের হট্টগোলে গালিভারের ঘুম ভেঙে যায়। সে বুঝতে পারে কারা যেন তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। সে ক্ষিপ্ত হলো এবং উঠে বসার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে অনেক নরনারী হাত পা ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলো। সে দুটো গাছ তুলে তাদের প্রহার করার জন্যে প্রস্তুত হলো। এ দৃশ্য দেখে তারা ঘরবাড়ি ও শহর ছেড়ে সাগর পারের দিকে দৌড়াতে লাগলো।

এটি একটি সমাজ-সচেতন রূপক গল্প। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার কর্ম বিমুখতা, আলস্য, সৃষ্টিহীনতার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লেখক এর পরিণাম নির্দেশ করেছেন। আমরা যেন অলৌকিক উপায়ে গালিভারের ধনরত্ন পেয়ে গেছি, তাই মত্ত আছি ভোগ-বিলাসে, জ্ঞান ও কর্মপথ আমরা ত্যাগ করেছি। কিন্তু আলস্য ও ঔদ্ধত্য এক দানব, তাই গালিভারের যখন নিদ্রা ভঙ্গ হবে সে দিন পলায়ন ব্যতিত পথ থাকবে না। সময় থাকতেই লিলিপুটের অবিবেচনাপ্রসূত ক্ষুদ্র জীবন পরিত্যাগ করা উচিত।

বিরহ

অতীতের কথা মনে করে লেখকের দুচোখ বেয়ে দুফোটা জল গড়িয়ে পড়লো। রুমালে চোখ মুছতে মুছতে লেখক বাড়ির পথে চলছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হলো পৃথিবী যেন অনেক বদলে গেছে। কিন্তু বাড়ির কাছের সেই পথ ঘাট আগের মতোই আছে, গাছে গাছে পাখিরা সেই আগের মতোই কলরব করছে, রাস্তার পাশের দোকানগুলো সেই আগের মতই আছে– কোন পরিবর্তন হয় নি। লোকজন এখন সেই আগের মতোই তাদের কাজ নিয়ে ছোটাছুটি করছে। তবুও লেখকের কাছে মনে হলো সব কিছু কেমন যেন বদলে গেছে, মনে হলো তিনি যেন নিজের দেশে পরবাসী। ভাবতে লাগলেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গেলে তিনি শান্তি পাবেন। একদিন যে ঘর তার প্রেমিকার আনন্দ কাকলিতে মুখরিত হতো সে ঘর এখন তার কাছে কবর ভূমির মতই নিশ্চুপ। ঘরের যে দিকেই তাঁর চোখ পড়লো সে দিকেই তাঁর প্রেমিকার ছবি, তাঁর স্মৃতি ভেসে উঠলো। ঘরের ছবিগুলো যেভাবে সাজানো ছিল আজো তেমনি আছে। এ গুলো দেখে তাঁর প্রাণ অস্থির হয়ে উঠলো। শোবার ঘরে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে ছোটখাট খুটি-নাটি জিনিসগুলো দেখে তাঁর প্রেমিকার কথা মনে পড়লো। আনমনে ড্রয়ার খুলে হঠাৎ একটা হেয়ার ব্রাশের উপর তাঁর চোখ পড়লো এবং অনেক মধুর স্মৃতির মধ্যে লেখক হারিয়ে গেলেন। তারপর আর তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। বিছানায় বসে পড়ে কেশগুচ্ছসহ সেই হেয়ার ব্রাশটি বুকের মাঝে চেপে ধরে উভ্রান্তের মতো বলে উঠলেন: "প্রাণ আমার, হৃদয় আমার প্রেয়সী আমার, আমি তোমায় ভালবাসি।" (পৃ. ২৭৬) মিনতির সুরে প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে বরলেন : "প্রাণ আমার হৃদয় আমার, ফিরে এসো তুমি। তোমার এখানে আমি থাকতে পারব না। এই অসহ্য যাতনা থেকে যাদু আমার, আমায় তুমি উদ্ধার করো।" (পৃ. ২৭৭)

Dhaka University Institutional Repository

'বিরহ' গল্পের গঠন প্রচলিত ছোট গল্পের মতো না হলেও এ গল্পের মধ্যে একটা অতৃপ্তির বেদনা আছে। এ গল্পে নিভৃত প্রণয় দ্বন্দ্বের রহস্য না থাকলেও তা হৃদয়ানুভূতিতে জীবন্ত। ছোট খাট জিনিসের মধ্যে অতীত স্মৃতির পরশ পেয়ে লেখক আবেগময় হয়ে উঠেছেন। অতীত স্মৃতিগুলো অনুভূতির গভীরতায় এখানে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এ গল্পের ভাষা আবেগময়, চিত্রাঙ্কন ও লিরিকধর্মী।

বসন্তের বধূ

বসন্তের এক মধুর পরিবেশে প্রেমিকার সঙ্গে লেখকের দেখা হলো। বিচিত্র এক স্বপ্নের মতো তাঁর প্রেমিকার সঙ্গে দিনগুলো কাটছিল। একদিন সোঁ সোঁ করে উত্তরের বাতাস বইতে লাগলো। গোলাপের পাপড়িগুলো বোটা থেকে ঝরে পড়লো। লেখকের সুস্বপ্ন, বসন্তেরও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হলো। তুব বসন্তের কথা কেউ ভোলে না। প্রকৃতির বসন্ত বারবার ফিরে আসে, কিন্তু তাদের বসন্ত আর ফিরে এলো না।

বছরের পর বছর কেটে গেলো। তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষাও ভেঙে চৌচির হলো। ভাবলেন বেঁচে থেকে আর কোন লাভ নেই, মরণেই শান্তি। প্রকৃতিতে পুনরায় বসন্ত এলো, প্রেমের মধুর উৎসবে প্রকৃতি মেতে উঠলো। এ দৃশ্য দেখে লেখক আস্থির হলেন, গভীর আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে তার প্রেমিকাকে লিখলেন: "বসন্তের বধূ হে আমার, তোমায় ছেড়ে আমি আর থাকতে পারি না। এবার আমি আসবো, তোমার কাছেই আসবো। বসন্তের মধুর মিলনে দুটি জীবনকে আর একবার আমরা সার্থক করবো।" (পৃ. ২৭৯) এরপর লেখক গভীর দরদ ও করুণাভরা এক প্রেমের চিঠি পান। তাঁর প্রেমিকা তাঁকে লিখেছে: "বন্ধু হে আমার! জীবনের প্রায় সব ফুলগুলিই শুকিয়ে ঝরে গেছে। আমাদের সেই সুদূর অতীতের মিলনের স্মৃতি ফুলটাই এখন কেবল বেঁচে আছে। তারই সুরভি এখনও বসন্তের কথা আমার মনে জাগিয়ে তোলে! সখা হে, সেটি যাদুর ফুল, হাত দিয়ে তাকে ছুঁয়ো না। সে ফুলটা শুকুলে, আমি আর বাঁচব না।" (পৃ. ২৭৮)

প্রকৃতির বসন্তের মতো জীবনের বসন্ত ক্ষণস্থায়ী। প্রকৃতির বসন্ত বারবার ফিরে আসলেও জীবনের বসন্ত একবার ফুরিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। কিন্তু জীবনের কোন কোন স্মৃতি চিরদিন মনের মণিকোঠায় বেঁচে থাকে। তাই বসন্তের কথা কেউ ভুলতে পারে না। মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্যই ছোট্ট একটা ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে লেখক এখানে তুলে ধরেছেন।

ছবির কথা

লেখক তার প্রেমিকার পাশে বসেছিলেন। আকাশ ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। এ প্রাকৃতিক পরিবেশে দু'জনেই চুপচাপ বসে ছিলেন বৈদ্যুতিক আলো শোভিত এক সুসজ্জিত গৃহে। তবে তারা দু'জনেই ছিলেন অন্যমনস্ক। সেই ঘরের দেয়ালে ছিল একটা ছবি– শেক্সপিয়রের রোমিও-জুলিয়েটের নৈশ অভিসারের পরিকল্পনা। প্রেমিক রোমিওর এক পা দোতলা ঘরের খোলা জানালার মধ্যে আর এক পা বাইরে। বিপদের কথা ভুলে গিয়ে রোমিও জুলিয়েটকে দু'হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে, আর প্রেমের গভীর আবেগে জুলিয়েটের ঠোঁট রোমিওর ঠোঁটে এসে মিশেছে। ছবিটার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে যৌন প্রেমের সুন্দর এক প্রতীক।

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমের চিরন্তন আবেগ আপনজনকে হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে স্থান দেয়। সুন্দরী প্রেমিকা তার প্রেমিকের জন্মদিনে ছবিটা উপহার দিয়েছিল।

প্রেমিক তার প্রেমিকার মনের কথা বুঝেছিলেন বলেই ছবিটি রেখেছেন দেয়ালের ঠিক মাঝখানে যেমন রেখেছে মনের মাঝখানে তার প্রেমিকাকে। লেখক তার প্রেমিকার পাশে বসে আপন মনে ভাবছেন, কেউ কারো সাথে কথা বলছেন না। এমন সময় আকস্মিকভাবে ঝড় ও বৃষ্টি নেমে এলো। দাঁড়কাক ঘরের মধ্যে উড়ে এসে রেমিও-জুলিয়েটের ছবির উপর বসতেই ছবিটা মেঝের উপর পড়ে ভেঙে গেল। এ দৃশ্য দেখে লেখক তার প্রেমিকাকে বললেন: "ভালোই হল। ছবির নগ্ন কামুকতা আমার রুচিকে আঘাত করত। ওটা বিদায় হলো, ভালই হল।" (পৃ. ২৮০) এরপর তাঁর প্রেমিকাকে জানালেন যে, ছটায় তার একটা appointment আছে, তাই তিনি চলে যাচ্ছেন। লেখকের এই চলে যাবার দৃশ্য দেখার জন্যে তাঁর প্রেমিকা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

প্রেম আপনজনকে কাছে টানে, অন্তরের উষ্ণতায় একাত্ম করে। বর্তমান গল্পে সুসজ্জিত গৃহের দেয়ালে রোমিও-জুলিয়েটের ছবি শুধু ছবি নয়, এর মধ্য দিয়ে প্রেমের চিরন্তন সত্য প্রকাশ করা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের সমীক্ষণ হিসেবে গল্পটি তাৎপর্যপূর্ণ। একদা যাদের মধ্যে গভীর প্রেমময় সম্পর্ক ছিল আজ তা জীবনের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সময়ের সাথে সাথে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাও পরিবর্তিত হয়। যা একসময় গভীর আকর্ষণের বিষয় ছিল তা বিরাগের বস্তুতে পরিণত হয়। হয়তো আমাদের দৃশ্যগ্রাহ্য বাস্তব জগতে তেমন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না কিন্তু মনের ভেতরে সময় এসে ক্ষয় করে, দিয়ে যায় অনেক কিছু। গল্পটিতে একটি প্রেমময় বহির্বাস্তবতা দেখা গেলেও উভয় চরিত্রের মনস্তত্ত্ব পরিষ্কার হয়েছে রোমিও-জুলিয়েটের ছবিটি ভূ-পতিত হওয়ার প্রতীকী ব্যঞ্জনায়।

গোলাপের কথা

বাগানে একটা গোলাপ ফুল ফুটেছিল-রূপে ও রঙে অনন্য। এই রূপে মুগ্ধ হয়ে এক বুলবুল পাখি তার ডালে বসে ভেবেছে ফুলটিকে ভালবাসার জন্যেই আল্লাহ তাকে পাখি হিসেবে সৃষ্টি করছে। গোলাপের হাসি মাখা মুখ দেখে সে জীবন সার্থক করতে চায়: "প্রাণ আমার, দয়া করে তোমার রাঙা মুখখানি তুলে একবার আমার পানে চাও। তোমার হাসিমাখা মুখখানি দেখে জীবন আমার সার্থক করি।" (পৃ. ২৮১) বুলবুলের এই প্রীতিমাখা কথা শুনে গোলাপের মুখে হাসি ফুটে উঠলো, সে ভাবলো বুলবুলের কী মিষ্টি কথা, আর কী সরস এর প্রাণ। তার বিশ্বাস ভালবাসার জন্যেই আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন। হঠাৎ বুলবুলের ডানা দুটির প্রতি গোলাপের নজর পড়লো এবং শঙ্কিত হলো এই ভেবে যে, এই ডানা দিয়েই বুলবুল একদিন অন্যত্র চলে যাবে, তার কথা মনেও রাখবে না, অন্য কাউকে ভালোবাসবে। উড়ে বেড়ানোই বুলবুলের স্বভাব, তাই অন্য গোলাপ একদিন তাকে আকৃষ্ট করবেই। কিন্তু বুলবুল এ কথা স্বীকার করলো না। সে গোলাপকে কথা দিলো সারাটা জীবন একাগ্রভাবে একাত্ম থাকবে, ভালোবাসবে। এ কথা শুনে গোলাপ জানালো, সেও বুলবুলকে অস্বীকার করতে পারে না। সে যুগ যুগ ধরে তাকে ভালবাসবে। গোলাপকে কথা দেয়, এ কথা শুনে বুলবুলও তার অনন্ত ভালোবাসার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, এরপর আবেগে এক অন্যকে বুকে টেনে নেয়। তারপর একদিন এক

Dhaka University Institutional Repository

প্রেমিকা গোলাপটিকে ছিড়ে নিয়ে এক ফুলদানিতে রেখে দিলো। গোলাপটি বাগানের দিকে চেয়ে বুলবুলের কথাই ভাবতে রাগলো। সকালে গোলাপের পাপড়িগুলো শুকিয়ে গেলো। গোলাপটি মনে মনে প্রার্থনা করলো মরণের আগে যেন সে বুলবুলকে একবার দেখতে পায়। বুলবুলকে উদ্দেশ্য করে গোলাপটি বলতে লাগলো পরলোকে সে তার জন্যে অপেক্ষা করবে। তার সাধের বুলবুলকে দেখার জন্যে সে বাগানের দিকে চাইলো। সে দেখতে পেলো তার প্রাণের বুলবুল আর একটা সুন্দর গোলাপের দিকে চেয়ে প্রেম নিবেদন করছে। মুখে তার একরাশ ভালবাসার ছবি। গোলাটি বুলবুলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো। বুলবুল নতুন গোলাপকে বলছে, তাকে ভালবাসার জন্যেই আল্লাহ বুলবুলকে সৃষ্টি করেছেন। এ কথা শুনে জানালার পাশে রাখা ফুলদানির গোলাপটি দুঃখ ও আঘাত পেয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, আল্লাহ যেন তাকে এ পৃথিবী থেকে তুলে নেয়। তারপর সেই তরুণ-তরুণী ঘরে ঢুকলো এবং তরুণী তরুণকে জানায়, ফুলদানিতে রাখা গোলাপটি শুকিয়ে মারা গেছে। এ কথা শুনে তরুণ তাকে বললো: "ফুলের জীবন একদিনের, মানুষের জীবন দু'দিনের, প্রেমেরই কেবল মৃত্যু নাই।" (পৃ. ২৮৪) এ কথা শুনে তরুণী তাকে কোমল বাহু পাশে বেঁধে বলে: "তুমিই আমার বুলবুল।" (পৃ. ২৮৪) ফুলদানির গোলাপটির মুখে হাসির রেখা ফুটলো। অনেক কষ্টে আকাশের দিকে মুখ তুলে বললো : "প্রভু হে, তোমার সৃষ্টির মর্ম তুমিই বোঝ।" এ কথা বলতে বলতে চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লো।

মানব মনস্তত্ত্বের চিরন্তন একটি সত্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে 'গোলাপের কথা' গল্পে। জীবনে বারবার প্রেম আসে এবং প্রেমিক ফিরে যায় নবতর প্রেমাস্পদের নিকট। গোলাপ হয়তো একজনকে ভালোবাসে কিন্তু বুলবুল একজনের জন্যে নয়, সে বিভিন্ন ফুলে গুনগুনিয়ে গান শুনায়, এটাই তার ধর্ম। মানব জীবনেও চূড়ান্ত প্রেম বলে কিছু নেই। প্রেমিকজন নতুন প্রেমে মত্ত হয়ে উঠতে পারে, ভুলে যেতে পারে অতীত কথা। জীবনের অলঙ্ঘ্যনীয় গতিশীলতাকে অশ্রুসজল চোখে অবলোকন করেছেন লেখক। তবু প্রেমের স্থায়িত্ব সম্পকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ, তা যেন শ্লেষাত্মক আত্মজীবনীর উদ্ভাস।

প্রেমের পুষ্পরথ

লেখকের ঘরের সামনে দিয়ে এক এ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবক যুবতী রোজ সকালে তারা আসা-যাওয়া করতো। কিছুদিন পরে লেখক দেখতে পান তারা এক সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে, মুখ তাদের হাসিতে উদ্ভাসিত। হঠাৎ আর একদিন তিনি দেখতে পান ফুলে ফুলে সজ্জিত হয়ে মোটরে করে চার্চের দিকে যাচ্ছে, সঙ্গে আছে আত্মীয় স্বজন। দুই-তিন সপ্তাহ পরে সেই তরুণ-তরুণীকে আবার দেখতে পান তাঁর বাড়ির সামনে, মুখে তাদের হাসি আর ধরে না। এর কয়েক মাস পরের কথা। হঠাৎ লেখকের চোখে পড়লো তারা আগের মতো পাশাপাশি চললেও মুখে আর সেই হাসি নেই। এই ঘটনার দশ-পনেরো দিন পরে লেখক দেখতে পান সেই তরুণ একা পথে চলেছে, সাথে সেই তরুণী নেই। তারপর আর একদিন দেখলেন সেই তরুণীও একা একা পথে চলেছে, তার মুখে বিরক্তির ভাব। এরপর লেখক একদিন সেই তরুণকে ডেকে একসাথে না চলার কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কই আজকাল তো তোমাদের এক সঙ্গে বেড়াতে দেখি না।" এ শুনে সেই তরুণ যুবকটি কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলেছিল: "যা গরম পড়েছে এতে কি আর বেড়ান যায়।"

Dhaka University Institutional Repository

'প্রেমের পুষ্পরথ' গল্পে এক চিরন্তন সত্য মৃদু ইঙ্গিতে অপরূপ কৌশলে লেখক ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মানুষের জীবনে সুখশান্তি ক্ষণিকের, চিরদিন দুঃখবেদনা নিয়েই নরনারীর দিন কাটে; সময় বয়ে যায়। প্রেমিক প্রেমিকার প্রথম প্রণয়ে হাসির মাধুরী থাকে। কিন্তু পরে আর সেই অফুরান হাসি থাকে না। ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে এ সত্যই গল্পে প্রতিফলিত।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় *মাশুকের দরবার*-এর ভূমিকায় এ গল্প সম্পর্কে যা বলেছেন তা উল্লেখযোগ্য[৪] :

> 'প্রেমের পুষ্পরথ' প্রাণের চমৎকার ছবিটুকু। প্রথম প্রণয়ে উচ্ছ্বসিত চিত্ত প্রেমিক-প্রেমিকা পথে চলিতেছিল, নয়নে তাদের হাসির মাধুরী... প্রেমের পুষ্পরথে চড়ায়ে আনন্দলোকে চলিয়াছে। গতির বিরাম নাই; যাত্রীদের মনে ভয় নাই; ভাবনা নাই। ক'মাস পরে পথ চলা আছে। কিন্তু সে বাহুতে মালা গাঁথার স্পৃহা নাই। তারা পাশাপাশি চলে না। তরুণ চলিয়াছে আগে আগে আর দশ পনেরো হাত পিছনে তরুণী। পুষ্পরথের গতি আজ স্বচ্ছন্দ নয়। তারপর মুখে আকারণ আনন্দের সে অফুরান হাসির লেশমাত্র নাই। হায়রে সে পুষ্পরথ আজ যেন মেরামত করা একখানা গাড়ি মাত্র। আনন্দলোকে পৌঁছাইয়া দেবার তার সাধ্য কি? তারপরে? তরুণ একা পথে চলে, তরুণী সঙ্গে নাই। পুষ্পরথ তবে অচল হইয়াছে। তাই হয়। কবিও বলিয়াছেন– "সুখ দিন হায় যবে চলে যায় আর ফিরে আসে না।" পুলকের হাসি নিমেষের; চিরদিন দীর্ঘশ্বাসের বোঝা লইয়াই নর-নারীর দিন কাটে! এই সনাতন সত্য লেখক আপরূপ কৌশলে এত মৃদু ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন, আর সে ইঙ্গিতে এমন কবিত্ব যে প্রাণে চিরদিনের জন্য রেখাপাত করে। এলেখার আর্ট ইহাকেই বলে।"

কিউপিডের দুষ্টুমি

লেখক রোজ সন্ধ্যায় কলকাতা শহরের বড় রাসায় বেড়াতে যেতেন। সেই পথেই একটা বাড়িতে খ্রিস্টানদের প্রার্থনার ঘর ছিল। সেখানে এক এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও তার কমবয়সী স্ত্রী পালা করে বেদীতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতো। একই বিষয়ে তারা কথা বলতো, বিষয়টা ছিল: 'The Need for Repentance – অনুশোচনার আবশ্যকতা।' তাদের আবেগ প্রবণ কথায় শ্রোতারা বিভোর হয়ে যেতো। একদিন লেখক সেই প্রার্থনার আসরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উপাসনা শেষ হলে লেখক দেখতে পান সেই খ্রিস্টান দম্পতি একসাথে ফিটনে চড়ে বাড়ি ফিরছে। কিন্তু হঠাৎ তিনি দেখতে পান একজন যুবক সেখানে এলো। তারপর বিভিন্ন বক্তৃতার দিন এই এ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবককে তিনি দেখতে পান বক্তৃতা কক্ষের প্রথম সারিতে বসে আছে। তারপর দু' সপ্তাহ পরের ঘটনা। লেখকের চোখে পড়লো সেই দম্পতি একটা ফিটনে চড়ে সেখানে উপস্থিত হলো। কিন্তু স্ত্রীলোকটির চেহারায় বেশ পরিবর্তন এসেছে, তার পোষাকেও ধর্ম যাজকের পরিচয় নেই। আগে সে দর্শকের দিকে চেয়ে বক্তৃতা দিতো, কিন্তু আজ সেই এ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবকের দিকে চেয়ে তার বক্তৃতা শুরু করলো। লোকটার দিকে তাকাতেই তার মুখে রহস্যপূর্ণ হাসি ফুটে উঠলো। এরপর আর তিন সপ্তাহ লেখকের সেদিকে যাওয়া হয় নি। একদিন সকালে লেখক কাগজে দেখতে পান : "A clergy-man's wife clopes with an Augls Indian." ধর্মযাজকের স্ত্রী সেই এ্যাংলো ইন্ডিয়ানের সাথে নিরুদ্দেশ হয়েছে। এই ঘটনার এক সপ্তাহ পর লেখক প্রার্থনা ঘরটি দেখে খুব দুঃখ পান। প্রার্থনা

Dhaka University Institutional Repository

ঘরের দরজা জানালা বন্ধ, দরজার বাইরে বসে এক ভিখারি ভিক্ষা চাইছে, দেয়ালের কালো একটা ফলক ঝুলানো রয়েছে, তাতে লেখা: "To let. Apply to lala Gaya Ram,—Harriso Road." (পৃ. ২৯১)

বয়সের ধর্মকে অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম যাজিকার পোষাক পরলেই ধার্মিক হওয়া যায় না। ধর্ম মনের গভীরে শিকড় না গাড়লে প্রকৃত ধার্মিক হওয়া যায় না– এ সত্যই এ গল্পে প্রতিফলিত। ধর্ম যাজকের স্ত্রীর বয়স অল্প। ধর্মযাজিকার পোষাক পড়ে ধর্মীয় বক্তব্য দিলেও তার মনকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্রার্থনার আসরে এ্যাংলো ইন্ডিয়ান যুবকের পাশে বসা, গাড়িতে পাশাপাশি বসে যাওয়া- আসা করার মধ্য দিয়ে অবশেষে ধর্মযাজিকার স্ত্রী তার প্রেমে পড়ে। তারপর একদিন সে তার হাত ঘরে নিরুদ্দেশ হয়।

পূর্ব্বাভাষ

একদিন এক স্টিমারে চড়ে লেখক কীর্তনখোলা নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর চোখে পড়লো মাইলের পর মাইল ধরে সুপারি আর নারিকেল গাছের সারি। তারই মাঝে মাঝে পল্লি আর প্রান্তর। গাছ, মাঠ, লোকালয় আর নদীতে এক চমৎকার ছবি লেখক মুগ্ধ চোখে দেখছিলেন। চলতে চলতে গ্রামের ঘরগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো– চারদিকে বস্তি, মাঝখানে একটা পুকুর। নারকেল, তাল গাছের গুঁড়ি দিয়ে বাঁধা ঘাট, গাঁয়ের মেয়েরা সব পুকুর পাড়ে জটলা করছে। কেউ বাসন মাজছিল, কেউ জল তুলছে, আর কেউ বা কলসী কাঁখে গল্প করতে করতে বাড়ি ফিরছে। এরপর স্টিমারটা গ্রাম পার হয়ে, মাঠ পেরিয়ে আরো খোলা জায়গায় এসে পড়লো। সেখানে লেখক দেখতে পেলেন গাঁয়ের ছেলেরা ছুটাছুটি, আর প্রাণ খুলে খেলা উপভোগ করছে। স্টিমারটা তারপর একটা নির্জন প্রকৃতির সামনে এসে পড়লো। লেখক সেই পল্লিবাসীদের কথা ভাবতে লাগলেন এমন সময় তার চোখে পড়লো অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় দশ-বারো বছরের এক ছেলে উপুড় হয়ে শুয়ে নদীর স্রোতের দিকে চেয়ে আছে। ছেলেটার ছোট্ট মন ঘুরে বেড়াচ্ছিল কোন দূর-দূরান্তে দূর পল্লিপ্রান্ত থেকে ছেলেমেয়েদের হাসির রোল বাতাসে ভেসে আসছিল, শোনা যাচ্ছিল পশু পাখির চিৎকার। সেই ছেলেটির সেদিকে খেয়াল ছিল না। সে নিজেকে স্থাপন করেছেন প্রকৃতির অন্তঃমূলে, সাধারণ জীবন প্রবাহের অন্য প্রান্তে। ছেলেটি স্বপ্নময় চোখে স্টিমারের দিকে চেয়ে রইলো। লেখকের মনে হলো সেই শান্ত বালকের স্নিগ্ধ চোখের মধ্যে অনেক প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। বাঁক ফিরে স্টিমার যখন সোজা চলতে শুরু করলো তখন সেই ছোট্ট বালকটির দিকে লেখকের চোখ পড়লো। তিনি দেখলেন সেই ছেলেটি হাটু তুলে বসে ঢেউগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবছে আর আনমনে ছোট্ট ছোট্ট ঢিল তুলে নদীর জলে ফেলছে। এটা দেখে লেখক মনে করলেন এ গ্রামটি আর অজানা অচেনা ও অখ্যাত থাকবে না।

'পূর্ব্বাভাষ' গল্প সম্পর্কে শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় 'মাশুকের দরবার' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন: "প্রথম গল্প – পূর্বাভাষ। স্টীমারে চড়িয়া নায়ক চলিয়াছেন। নদীর তীরে আশে-পাশে গ্রামের নরনারীর কাজকর্ম অলসভাবে বসিয়া থাকা, ছেলেদের ছুটোছুটি এগুলি যেমন দেখিয়াছেন, তেমনি বলিয়া

Dhaka University Institutional Repository

গিয়াছেন-সেগুলি যেন নিখুঁত ফটো। আমাদের চোখের সামনে দুষ্টু ছেলেদের দৌরাত্ম, ঘোমটায় মুখ ঢাকা বধুর কলসীতে জল, ভরিতে ভরিতে ঘোমটার আড়ে স্টীমার দেখা লাঙ্গল লইয়া চাষার মাঠচষা – এগুলি একেবারে সজীব হইয়া ওঠে। এদের এই হাসিখেলা দেখিয়া লেখক বলিতেছেন : "বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কত অল্প ঠাঁই নিয়েই এরা সন্তুষ্ট। জীবনের কর্মকোলাহল থেকে অতি দূরে অবস্থিত ঐ গণ্ডগ্রামে এরা জন্মেছে, আর এই গণ্ডগ্রামেই এরা মরবে। বাইরের জগত কখনো এদের নামও শুনবে না, আর এদের গাঁয়ের নামও শুনবে না।" চমৎকার! মনস্তত্ত্বের অনেক সত্য এই কটি ছত্রে আশ্চর্য সহজভাবে ব্যঞ্জিত। শেষে গাছের ছায়ায় ঐ যে ছেলেটি "উপুড় হয়ে শুয়ে নদীর স্রোতের দিকে এক দৃষ্টে চেয়েছিল।" গাছের ডালে পাখির আনন্দ কলরব, নদীর ঢেউ, বয়স সুলভ চাপল্যবশে সে সবের পানে সে চাহিতে জানে না– মন তার কোথায় কোন্ দূর-দূরান্তর চলিয়াছে। এ ছেলেটির এই স্বাতন্ত্র্য লেখক লক্ষ্য করিয়াছেন। এই কারণেই তাঁর দরদী প্রাণের পরিচয় পাই। স্টীমারে চড়িয়া অনেকেই বেড়ান, কিন্তু এমন দেখার চক্ষু এবং দেখিয়া এ ভাবে তা ভাষায় ফুটাইবার শক্তি আমাদের ক'জনের আছে।"[৫]

কালি ও কলম

বাদশাজাদীর দোয়াতদানে কালি আর কলমে একদিন তর্ক হচ্ছিল। কলম বলছিল তার রূপ আছে বলেই তার এত আদর, এ জন্যেই বাদশাজাদী তাকে আদর করে হাতে তুলে নেন। কলম বললো যে, অন্যদিকে কালির কুরূপই হয়েছে তার কাল। কালির জন্যে তার বেশ দুঃখ হয়, এবং কালির জন্যেই রোজ মাজা-ঘষা সে মুখ বুজে সহ্য করে। এক বাঁদী একদিন কলমকে তুলে তার হাবসী প্রণয়ীকে দেখিয়ে বলেছে: "দেখ, কালি লেগে এর চেহারা ঠিক তোমার মতই হয়েছে।" (পৃ. ২৯৪) তাই কলম আর কালির সাথে থাকতে চায় না। চিরকাল এক সাথে কাটালেও এখন আর কলম কালির সাথে থাকবে না। তখন কড়া ভাষায় কলমকে উদ্দেশ্য করে কালি বললো : "রূপের অত গুমোর করো না ভায়া, রূপের অত গুমোর করো না। আমাতে যে রস আছে তার জোরেই তুমি অত বড় হয়েছো, তা না হলে বাদশাজাদী তোমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করতেন না।" (পৃ. ২৯৪) এ কথা শুনে কলম ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে তাকে জানায় যে, সে আর কিছুতেই কালির সাথে থাকবে না, এবং সাথে সাথে কালিও কলমকে স্পর্শ করবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে।

তারপর একদিন বাদশাজাদী তার প্রেমিককে চিঠি লেখার জন্যে কলমটা হাতে নিতেই তাতে কালি না পেয়ে রাগে টুকরো টুকরো করে ভেঙে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলেন এবং নতুন আর একটা কলম নিয়ে লিখতে শুরু করলেন। এদৃশ্য দেখে কালির মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। অন্যদিকে এক কাঠকুড়ুনি এসে কলমের ভাঙা টুকরো নিয়ে গেলো চুলা ধরানোর জন্যে। আগুনে পুড়তে পুড়তে কলম বলতে লাগলো : "হায়, হায়! অহঙ্কারে মত্ত হয়ে আমার জন্মের কথা ভুলে গিয়েছিলুম; কৃতঘ্নের উচিত শাস্তিই তাই এখন পাচ্ছি।" (পৃ. ২৯৪)

'কালি ও কলম' একটি রূপক গল্প। কলম ও কালির কথপোকথনের মধ্য দিয়ে লেখক মানব জীবনের এক পরম সত্য উদঘাটন করেছেন। কালিই আসলে কলমকে বাঁচিয়ে রাখে। কালির জন্যে

Dhaka University Institutional Repository

কলম প্রাণ ফিরে পায়, তাই কালির কাছে কলম অনেক ঋণী। কিন্তু কলম কালির উপকারের কথা ভুলে যায়, আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে সে কালিকে দোষারোপ করে এবং এক পর্যায়ে কালির সাথে একসাথে থাকতে সে অনিচ্ছা প্রকাশ করে।

গল্পের ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক কলমের মতো সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের কথা আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন, যারা এমনি আত্মঅহঙ্কারে নিজেদের অস্তিত্বের কথা ভুলে যায়। উপকারীর উপকার স্বীকার করে না।

শুভদৃষ্টি

লেখক একদিন বাগানে এসে দেখতে পান সে একটা পায়রাকে বুকে নিয়ে আদর করছে। পায়রাটা অপরিসীম আনন্দে তার বুকে ছোট্ট মাথাটি গুজে স্বর্গ সুখ উপভোগ করছে। লেখক কিছু না বলে একটা গাছের ডালে ভর করে তাদের এই ভালবাসাবাসি প্রাণভরে উপভোগ করলেন। লেখক দেখতে পেলেন স্বপ্নরাজ্যের এক রানী এই পাখিটিকে নিয়ে প্রাণ ভরে সোহাগ করছে। লেখক তার ছোট্ট চাপা ফুলের মত হাতটিতে একটা ছোট্ট চুমু দিয়ে বলেছিল: "তুমি এত সুন্দর আমি তো তা জানতুম না।" (পৃ. ২৯৫) এ কথা শুনে সে মিষ্টি হেসে বলেছিল: "আজ কি হয়েছে, বল দেখি? রোজ তোমায় দেখি, কখনো কিছু মনে হয় নি। আজ তোমার ঐ চাহনিতে আমার শরীরের মধ্যে কি যেন এক বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে হলো আমি আর আমার নই। এখন থেকে আমি আর এক জনের।" (পৃ. ২৯৫)

'শুভদৃষ্টি' গল্প লেখকের কল্পনা প্রসূত চিন্তার চিত্রকল্প। মৃদু ইঙ্গিতে এখানে হৃদয়ানুভূতিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তোলা হয়েছে। বাগানের পায়রাকে প্রাণভরে আদর করা এবং তার বুকে পরম আনন্দে মাতা গুঁজে পায়রার অফুরন্ত শান্তি উপভোগ করা ও তাদের ভালবাসাবাসি দেখে নায়কের মনে ও ভালবাসা জাগে।

অনুশোচনা

লেখকের সাথে তার দুদিনের পরিচয়, তবু সে লেখকের দিকে স্নেহমাখানো চোখে তাকিয়েছিল। লেখক সেটা বুঝতে পারলেও সাহস করে তাকে কিছু বলতে পারেননি। মনের কথা মনে রেখেই তিনি বিদায় নিয়েছিলেন। জলভরা চোখে লেখকের দিকে চেয়ে সে বিদায় দিয়েছিল। ডাগর চোখে তাকিয়ে একটা তপ্ত নিশ্বাস ফেলেছিল। লেখকের মন সেদিন তাতে তৃপ্তিও পেয়েছিল। তারপর আবার যখন তার সাথে লেখকের দেখা হলো তখন সে অন্যের ঘরণী; অনিন্দ্য রূপসী যৌবনের পূর্ণতায় দেহে এসেছে জোয়ার। লেখক অনুভব করলেন অমূল্য রত্ন তিনি হারিয়েছেন, এ জন্যে তার অনুশোচনা হলো। চোখের জলে লেখক তাকে তার মনের কথা জানালেন। তার চাঁদের মতো মুখে এক টুকরো মেঘ এসে দেখা দিল। তারপর লেখকের দিকে প্রতীমার মতো নির্মম চোখে চেয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বিদায় জানালো : "সাগর থেকে রত্ন তোলা সাহসী ডুবরীর কাজ, প্রাণ পণ করে সে খেলতে জানে, আয়াসলোভী কাপুরুষের কাজ তা নয়।" (পৃ. ২৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ প্রেমের শ্লেষ-তীর্যক উপস্থাপন ঘটেছে এ-গল্পে। প্রেমাস্পদকে পাওয়ার জন্যে সত্যিকার ত্যাগ ও সাহসিকতার প্রয়োজন হয়। সময় অতিবাহিত হলে প্রেমের সন্ধান মেলে না, প্রেম চলে যায় অন্য কারো হৃদয়ের ঘরে। ভালোবাসা তাই প্রাপ্তির সঙ্গে পূর্ণতা পায়, বেদনার ক্রন্দন ভালোবাসার মহত্ত্ব আনে না। যার প্রাণে প্রেমের শক্তি আছে সে বিজয়ী হয়। ডুবুরী যেমন সাগর থেকে রত্ন আহরণ করে, প্রেমিক জীবনপণ করে প্রেমের সন্ধান করতে হয় – তবেই প্রাপ্তি ঘটে।

অভিমান

লেখক একবার পণ করেছিলেন তার সাথে আর শোবেন না। এমন কি কথাও বলবেন না, তাই আত্ম সংযম শেখার জন্যে ধর্ম গ্রন্থ খুলে বসলেন। তাঁর আসতে দেরি হচ্ছিল। চোরের মতো একবার চোখ তুলে তাকাচ্ছিলেন, আবার পরক্ষণেই নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বই পড়ায় মন দিচ্ছিলেন। ভাবছিলেন এবার তার মন আর ভাঙবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের মৃদু ধ্বনি গানের তানের মত বেঁজে উঠলো। আশায় আর উদ্বেগে তার শিরা উপশিরা কাঁদতে লাগলো। পুলকের এক বিদ্যুৎ প্রবাহ তার শরীরকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেলো। ধর্মগ্রন্থ লেখকের হাত থেকে খসে পড়লো। এখন আর অভিমান করে লেখক থাকতে পারলেন না। দাঁড়িয়ে দুইহাত বাড়িয়ে তাকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করলেন।

এ-গল্পে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রেমের বাণী যদি একবার কারো অন্তরে পৌঁছে যায় তবে কোন প্রকার ধর্মবাণী কিংবা সমাজ-বন্ধন তাকে আটকে রাখতে পারে না। রূপকী আবরণের মধ্য দিয়ে লেখক স্রষ্টার সঙ্গে তার প্রেমময় সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন। আপন জনের সঙ্গে অভিমান করা যায়, কিন্তু সেই অভিমান দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অন্তরে যার ডাক শোনা যায় তার পানেই সর্বদা মানুষ ধাবিত হয় – এ যেন এক নিয়তি।

আদর্শ প্রেম

প্রেম কোন বাঁধা মানে না, সব বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে প্রেমিকাকে প্রেমাস্পদের কাছে নিয়ে যায়। লাইলির বেলাতেও তাই হয়েছিল। একদিন কাবিলার কাফেলা ছেড়ে লাইলি একমনে চলছিল তার প্রেমিক কায়েসের খোঁজে। আর একদিকে বাদশা কায়েস লাইলিকে হারিয়ে রাজ্যের আশা ছেড়ে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন মরুভূমিতে পালিয়ে এসেছে। সেই নির্জন মরুভূমিই এখন তার ঘর। লোকে আর এখন তাকে বাদশাজাদা কায়েস বলে ডাকে না। সে এখন 'মজনু' নামে পরিচিত।

একদিন লাইলি কুলমান জলাঞ্জলি দিয়ে উটে চড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে মরুভূমির উদ্দেশ্যে। মরুপথে চলতে চলতে তার উট ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো, আর চলতে পারে না। লাইলির ক্লান্ত চোখে ঘুম এলো, ঘুমের ঘোরে সে শুনতে পেল মানুষের কণ্ঠ। তারার আলোয় তার চোখে পড়লো এক পাগল মরুপ্রান্তরে ছুটাছুটি করছে। তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে লাইলি জানতে পারলো সেই পাগলই লাইলির হতভাগ্য প্রেমিক। এ কথা শুনে লাইলি কায়েসকে সম্বোধন করে বললো: "প্রাণের ধন আমার, চির সত্য প্রেমিক আমার, আজকের কান্ত আমার, আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও, আর তোমায় শোক করতে হবে না। আজ থেকে তোমার সব জ্বালা, সমস্ত যন্ত্রণা শেষ হল। চোখ খুলে আমার

Dhaka University Institutional Repository

দিকে একবার চাও, কায়েস। আমি যে লাইলি তোমার প্রাণের লাইলি। দেখ সব ছেড়ে তোমার কাছে এসেছি।" (পৃ. ২৯৮)

ধীরে ধীরে মজনু চেতনা ফিরে পেলো। লাইলি তাকে প্রাণ ভরে ভোগ করতে অনুরোধ জানালো এবং কথা দিল আর কোনদিনও লাইলি তাকে ছেড়ে যাবে না, সারা জীবন তার সাথে এখানে থাকবে। একথা শুনে মজনু লাইলির বাহু বন্ধন ছেড়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললো: "একটি কাজ কিন্তু কায়েসের দ্বারা হতে পারে না, লাইলি। তোমার পূণ্য নাম কলংকিত হবার কারণ আমি কখনো হতে পারি না।" (পৃ. ২৯৯) মজনু তাকে ঘরে ফিরে যাবার অনুরোধ জানালো: "প্রাণের ধন আমার, কুলবধূ তুমি। যাও যাও, এখনই তোমার কাবিলায় ফিরে যাও।" (পৃ. ৩০০)

এদিকে কাবিলার লোকেরা লাইলির খোঁজে বেড়িয়ে পড়েছিল। তাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ সে শুনতে পেলো। সারা পৃথিবী তার সামনে ঘুরতে লাগলো। এরপর মজনুর দেহ মরুভূমিতে লুটিয়ে পড়লো। মরুপথের যাত্রীরা এখনও এ করুণ গাঁথা গেয়ে থাকে।

'আদর্শ প্রেম' একটি প্রেমের গল্প। এ প্রেম সমাজের প্রচলিত প্রেমের মত নয়; প্রেম কোন বাঁধা মানতে চায় না। সব বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করে আপন জনের কাছে ফিরে যেতে চায়।

মুক্তির গান

বাদশার মহলে সোনার খাঁচায় একটি বুলবুল পাখি ছিল এবং তা বাগানের পাশে বারান্দায় ঝুলানো। বাগানে রোজ ঝাঁকে ঝাঁকে বুলবুল পাখি আসতো। মনের আনন্দে পাখিগুলো নেচে নেচে বেড়াতো। সোনার খাঁচার পোষা বুলবুল পাখিটা ভাবতো এদের জীবন কত সুন্দর। বনের বুলবুল পাখিদের বিচিত্র জীবনের সাথে সে তার নিজের জীবনের তুলনা করতেন। মাঝে মাঝে বিধাতাকে উদ্দেশ্য করে বলতো তাকে দয়া করতে। শত বছরের পরাধীন জীবনের চেয়ে মুক্ত আনন্দ মুখর একদিনের জীবন অনেক ভালো। খাঁচার বুলবুলের এই করুণ বিলাপ বনের বুলবুলেরা শুনতে পেল। খাঁচার পাশে এসে বনের পাখিরা তাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাতে লাগলো এবং খাঁচার পাখিকে কথা দিলো তারা এর প্রতিকার করবে। একদিন বনের সব বুলবুল পাখি মিলে খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখিকে উদ্দেশ্য করে বললো: "এস, আমাদের সঙ্গে মিলে প্রাণ খুলে আনন্দ কর।" এ কথা শুনে খাঁচার বুলবুল সোনার খাঁচা থেকে বেরিয়ে এলো এবং মনের আনন্দে এ গাছ থেকে ও গাছে উড়ে বেড়াতে লাগলো। অবশেষে আনন্দের এক পর্যায়ে খাঁচার সেই মুক্ত বুলবুল পাখিটি হঠাৎ করে মাটিতে পড়ে মারা গেল। বুলবুল পাখিরা করুণ কণ্ঠে তাদের সর্দারের কাছে জানতে চায় এমন হলো কেন? সর্দার বললো, "দুঃখের আতিশয্যের মত সুখের আতিশয্যেও মৃত্যু ঘটায়। এই আজন্ম মুক্তিকামী শেষে মুক্তির উগ্র আনন্দ সহ্য করতে না পেরেই মরেছে।" (পৃ. ৩০৩) সর্দার তাদেরকে আরো জানায় যে, যারা চিরমুক্ত তারা মুক্তির মূল্য বুঝে না। আর যারা প্রতীক্ষার পর মুক্তি পায় তারা মুক্তির আনন্দে পাগল হয়ে ওঠে। আর যারা চিরমুক্ত তারা মুক্তির অভাব অনুভব করে না, দুঃখও তারা জানে না। যারা বিরহ জানে না তারা মিলনের উন্মাদনাও বুঝে না। যারা দুঃখ জানে না তারা সুখের মূল্যও বোঝে না। সর্দারের কথা শুনে অন্য বুলবুলেরা আক্ষেপ করতে লাগলো এবং আল্লাহর কাছে

Dhaka University Institutional Repository

অভিযোগ করে এ তাঁর কেমন দয়া। সর্দার তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো: "বন্ধুগণ! আল্লার দোষ ধর না। তাঁর হেকমতের ভিতর প্রবেশ করবার শক্তি আমাদের নাই।"

'মুক্তির গান' একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপক গল্প। সোনার খাঁচায় বন্দি এক বুলবুল পাখির রূপকে পরাধীন মানুষের জীবনের কথা বোঝানো হয়েছে। আর বনের বুলবুল পাখির রূপকে মুক্ত ও স্বাধীন জীবনের কথা বলা হয়েছে। এ গল্পের মধ্যে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন বনের পাখির মতো সব মানুষ একতাবদ্ধ হলে পরাধীনতার কারাগার থেকে মানুষ বেরিয়ে আসতে পারে, পরাধীনতার কারাগার থেকে জাতি মুক্তি পেতে পারে। খাঁচার পাখির উড়ে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে মুক্ত ও স্বাধীন জীবনের মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে। মুক্তমনের আনন্দ প্রকাশ করতে করতে পাখিটি হঠাৎ মারা যায়। খাঁচার পাখির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক এক চিরন্তন জীবন সত্য প্রকাশ করেছেন। দুঃখের অতিশয্যের মতো সুখের অতিশয্যেও মানুষের মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু যারা মুক্ত আনন্দের মধ্যে জীবন কাটায় তারা মুক্তির মুল্য বোঝে না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যারা মুক্তি পায় তারা মুক্তির আনন্দে উন্মত্ত হয়ে ওঠতে পারে। যারা মুক্তির অভাব অনুভব করেনি তারা এর অর্থ বুঝতে পারে না। যারা দুঃখ পায় নি সুখের আনন্দ তারা বোঝে না। মুক্তির মূল্য তারা দিতে পারে না। যারা মুক্তির গান গাইতে গাইতে মারা যায় তারা চিরকাল অমর হয়ে থাকে। জাতির অন্তরে স্মরণীয় হয়ে থাকে। খাঁচার পাখি মুক্তির গান গাইতে গাইতে মারা যায়। খাঁচার পাখির মারা যাবার রূপকের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকামী জীবনচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

দরবেশের দোয়া

দরবেশের দোয়া গ্রন্থে সাতটি গল্প সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সবক'টি গল্পেই ইসলামিক জীবন ও তত্ত্ব দর্শন প্রাধান্য পেয়েছে। এস. ওয়াজেদ আলির তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন এ-গ্রন্থে স্বতঃস্ফূর্ততা লাভ করেছে সন্দেহাতীতভাবেই। ধর্মের জটিল তত্ত্বকথা যা প্রবন্ধভাষ্যে সম্ভব তা এই গল্পগুলিতে শিল্পরূপ খুঁজে পেয়েছে। স্বসমজের প্রতি প্রীতি লেখককে বর্তমানের দুরবস্থায় আহত করেছে। ফলে দায়িত্ব সচেতন লেখক হিসেবে তিনি লেখনি ধারণ করেছেন। অতীতের মহত্ত্বময় ঐতিহ্যকে গল্পাকারে উপস্থাপন করেছেন জাতীয় জাগরণ প্রয়াসে। সমকালে ধর্মীয় জীবনে যে কুসংস্কার, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা তার বিপরীতে গল্পগুলো যুক্তি পরম্পরায় উত্তর উপস্থাপনের মতো। একটা জীবনমুখী দাবি, গৃহবিচ্ছিন্নতা নয় – তাঁর গল্পের বাণীতে উচ্চকিত। সকল ভেদাভেদের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় মঙ্গলের জন্য কর্মময় জীবন যাপনের প্রতি ইঙ্গিতও করেছেন গল্পে। আত্ম-অহংকার পরিত্যাগ করে আল্লাহর একত্বকে স্মরণ করা এবং মানবপ্রেমে বিশ্বাস স্থাপন করার অন্তর্প্রেরণা *দরবেশের দোয়া* গল্পগ্রন্থের সৃষ্টি-উৎস।

দরবেশের দোয়া

গল্পটির কাহিনী ছয় পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম ঘটনাটি দুই পা খোঁড়া এক ভিক্ষুকের কাহিনী। খোরাসানের পথে বাবা খলিল নামে এক কামেল দরবেশ হেঁটে যাচ্ছিলেন, তখন পথে দুই পা খোঁড়া

Dhaka University Institutional Repository

একজন ভিক্ষুক তাঁর কাছে কাতর কণ্ঠে ভিক্ষা চাইলো। লোকটার অবস্থা দেখে দরবেশের মনে দয়া হলো। তিনি ভিক্ষুকের পায়ের জন্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ কবুল করলেন। ভিক্ষুকটি হঠাৎ দেখতে পেল সে তার পা ফিরে পেয়েছে। দরবেশ আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করতে করতে আপন মনে পথ চলতে লাগলেন। আর একদিন দরবেশ আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এমন সময় তিনি মানুষের কোলাহল শুনতে পান, তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে দেখতে পান একজন মাতাল তার প্রতিবেশিনীকে আহত করেছে। লোকটিকে দেখে দরবেশ চিনতে পারলেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "তুমি কি সেই অক্ষম ভিখারী, যার জন্য 'বারিতালা'র দরগায় আমি দোয়া করেছিলাম?" (এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী-২ পৃ. ৩১২) লোকটি জানায় যে, দরবেশের জন্যেই তার এ দুর্দশা। একদিন সেই লোকটি একজন বিধবার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল এবং তখন বিধবার রূপে মুগ্ধ হয়ে সে কুপ্রস্তাব দেয়। বিধবা রাজি না হওয়ায় লোকটি অপমানিত হয়ে বিধবার উপর প্রতিশোধ নেয়। এক ধারালো ছোরা দিয়ে তাকে ঘায়েল করে। লোকটি দরবেশকে জানায়, দরবেশ তার জন্যে দোয়া না করলে সে শান্তির সাথে মরতে পারতে। "দরবেশ সাহেব, আপনি যদি আমার মঙ্গলের জন্য দোয়া না করতেন, তাহলে এ দুর্দশা আমার আজ হতো না। একজন ধার্মিক মুসলমানের মত পরম শান্তিতেই আমি মরতে পারতুম।" (পৃ. ৩১৩)

এ ঘাটনার পর দরবেশ আল্লাহর কাছে মনে মনে ক্ষমা চান এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি আর কোন দিন কোন মানুষের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন না। "মনে মনে স্থির করলেন, কোন বান্দার মঙ্গলের জন্য ভবিষ্যতে কখনো আর আল্লাতায়ালার দরগায় দোয়া করবেন না। আল্লাই হচ্ছেন সমস্ত মঙ্গলের আধার।" (পৃ. ৩১৩)

পরবর্তী ঘটনা খোরসানের এক আমীরের। তাঁর কঠোর শাসনে সে দেশের লোক সব সময় শঙ্কিত থাকতো। কঠোর শাসনে প্রজারা অসন্তুষ্ট ছিল এবং তারা আমীরের অমঙ্গল কামনা করতো। একদিন প্রজারা দরবেশের সাহায্য কামনা করে, যেহেতু দরবেশের অলৌকিক ক্ষমতার উপর প্রজাদের বিশ্বাস ছিল।

"জালেম এই আমীরের হাত থেকে আমাদের মুক্তির জন্য আপনি আল্লাতায়ালার দরগায় দোয়া করুন। তাঁর মাহবুবের প্রার্থনা অবশ্য তিনি শুনবেন। আপনার দোয়াতেই আমাদের মুক্তি হবে।" (পৃ. ৩১৪) দরবেশ খোদার কাছে প্রার্থনা করার সাথে সাথে খবর আসে আমীর শিকার করে ফেরার পথে ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা গিয়েছে। অত্যাচারী আমীরের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে দেশের লোক আনন্দ উৎসব মেতে ওঠে। আমীরের মারা যাবার খবর শুনে প্রতিবেশী রাজ্যের দুর্ধর্ষ জঙ্গী বেগ আমীরের রাজ্য আক্রমণ করে। জঙ্গীবেগের সৈন্যরা আমীরের রাজ্য দখল করে লুটতরাজ ও খুন-খারাবি শুরু করে। পরলোকগত আমীরের জন্যে সবাই তখন বিলাপ করতে থাকে।

নিরুপায় হয়ে দেশের লোক আবার দরবেশের আস্তানায় এসে হাজির হয়। এবং তাকে দোয়া করতে অনুরোধ করে। দরবেশ আল্লাহর কাছে হাত তুলে করুণ কণ্ঠে মিনতি করতে লাগলেন। এবার আকাশ থেকে বাণী এলো : "হে আমার প্রিয় খলিল! তোমার প্রতিবেশীদের শাস্তি এবং শিক্ষার জন্যই

Dhaka University Institutional Repository

জঙ্গীকে তাদের মধ্যে আমি পাঠিয়েছি। আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জঙ্গী তার কাজ থেকে বিরত হবে না। বৃথা তুমি আমাকে অনুরোধ কর না।" (পৃ. ৩১৬)

এ ঘটনার পর দরবেশের মনে দুঃখ হয় এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করেন ভবিষ্যতে আর কখনো মানুষের মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গলের জন্যে খোদার কাছে প্রার্থনা করবেন না। মানুষের প্রকৃত মঙ্গলামঙ্গলের কথা বোঝার ক্ষমতা তাঁর নেই।

পরবর্তী ঘটনা দরবেশের ব্যক্তিগত প্রার্থনা নিয়ে। দরবেশের আস্তানার কাছে ছিল একটি নদী। অযু, গোসল প্রভৃতি কাজের জন্যে দরবেশ নদীর পানিই ব্যবহার করতেন। একদিন দরবেশের অসুখ হলে নদীতে পানি আনতে যাওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়লো। বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। সকালে তিনি দেখতে পান নদী তাঁর আস্তানার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে। আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর অন্তর ভরে উঠলো। আল্লাকে তিনি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালেন। আর এদিন বন্যার পানিতে দরবেশের আস্তানা ভেসে গেল। তারপর ঢিবির উপর বসে দরবেশ কাতর মনে পৃথিবীর প্রহেলিকার কথা ভাবছিলেন। আল্লাই তাঁর জীবনের একমাত্র সম্বল, আল্লা ছাড়া আর কাউকে তিনি জানেন না। আল্লাই তার আশা, আল্লাই তার ভরসা। এসব কথা ভাবতে ভাবতে চোখের পানিতে তাঁর বুক ভেসে গেল। আল্লা তার সব প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছেন, যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন; কিন্তু প্রার্থনার সফলতা থেকে অমঙ্গলেরই সুচনা হয়েছে।

বিকলাঙ্গের জন্যে প্রার্থনা, দেশবাসীর মঙ্গলের জন্যে অত্যাচারী আমীরের মৃত্যু প্রার্থনা, অবশেষে দরবেশের নিজের সুবিধার জন্যে আল্লাহকে তিনি নদীর স্রোতের গতি পরিবর্তন করতে ও প্রার্থনা করেন। দয়াময় আল্লাতালা তার সব প্রার্থনাই কবুল করেন। কিন্তু কোনটাই শুভ ফল বয়ে আনে নি। এ সব ঘটনার ফলে তার মনে সংশয় দানা বাঁধে। অনেক ভেবে-চিন্তে চোখের পানিতে বুক ভিজিয়ে করজোড়ে খোদাকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন: "হে খোদা তোমার এই গরীব বান্দাকে নাজাত দাও! দোয়ার সার্থকতা কোথায় সেই তথ্যটি পরিষ্কার করে তাকে বুঝিয়ে দেও।" (পৃ. ৩১৮) দরবেশ আল্লার কাছে প্রার্থনা করেন আল্লা যেন তাঁকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচায়। দরবেশের আকুল প্রার্থনায় খোদার আরশ কেঁপে উঠলো। আল্লাহ জিব্রাইলকে সম্বোধন করে বললের:

"আমিন! আমার খাস বান্দা বাবা খলিলের মনে সংশয়ে বিষম যন্ত্র উপস্থিত হয়েছে। যাও, সংশয় মুক্ত করে মনের শান্তি তাকে ফিরিয়ে দেও।" (পৃ. ৩১৮)

তখন অবর্ণনীয় এক স্বর্গীয় আলোকে স্থানটি উজ্জল করে জিব্রাইলের আবির্ভাব ঘটলো এবং দরবেশের চোখে পড়লো অপরূপ এক স্বর্গীয় মূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। স্নেহের মৃদু হাসিতে তার মুখ থেকে অপূর্ব এক মাধুর্য ঝরে পড়ছে। দরবেশ তাঁর পরিচয় দিতেই কোমল কণ্ঠে হযরত জিব্রাইল বললেন :

"বাবা খলিল, আপনাকে সুসংবাদ দিচ্ছি, আপনি আল্লার বিশেষ একজন প্রিয় পাত্র। আপনার মনের অবস্থা দেখে বিশেষভাবে বিচলিত হয়েই আমায় তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এখন আপনার সংশয়ের বিষয় আমায় অবহিত করুন।" (পৃ. ৩১৮)

Dhaka University Institutional Repository

এ কথা শুনে দরবেশ জিব্রাইলের কাছে সব কথা খুলে বলেন জিব্রাইল সব ঘটনা শুনে তাকে পরামর্শ দেন যে, সাধনা ও প্রার্থনা হচ্ছে মানুষের অবশ্য করণীয় কর্তব্য। মানুষের কাজ সাধনা করা। কিন্তু এর ফলাফলের ভার আল্লার হাতে। প্রার্থনার চরম সার্থকতা আত্মার উন্নয়নে। তিনি দরবেশকে আরো বলেন, মানুষ বিশ্বকে দেখে সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়ে কিন্তু আল্লাহ দেখেন ব্যাপক ও গভীর দৃষ্টি দিয়ে। তাই মানুষের কাছে যা অন্যায় বলে মনে হয় খোদার কাছে তা অন্যায় বলে মনে হয় না। জিব্রাইলের কথা শেষ হলে দরবেশ খোদার ধ্যানে মগ্ন হলেন। বাইরেরর জগতের কথা তিনি ভুলে গেলেন এবং এক নুরানী জগতে তিন মগ্ন হলেন। জিব্রাইল পরমানন্দে দরবেশকে আশীর্বাদ করতে করতে আকাশ পথে অদৃশ্য হলেন।

'দরবেশের দোয়া' গল্পের ঘটনাক্রম আমদেরকে এক আধ্যাত্মিক জগতে নিয়ে যায়। এ গল্প আমাদেরকে পৌঁছে দেয় এক বোধের জগতে, যেখানে এক মেহাত্তম দর্শনের সাথে আমরা পরিচিত হই। গল্পের সমাপ্তিতে খোদার কাছে আমাদেরকে আত্ম সমর্পন করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ গল্পের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত রয়েছে এক ধর্মীয় অনুভূতি, অবশ্য এ ধর্মীয় অনুভূতি কোন অন্ধ সংস্কারে আবদ্ধ হয় নি। এ ধর্মীয় অনুভূতি আমাদের মনের গভীরে এক চিরন্তন সত্যের জন্ম দেয়। মানুষ তার অগোচর সত্যকে সর্বদা বুঝতে পারে না। কিন্তু পরমসত্তা সৃষ্টিকর্তা সকল মঙ্গল-অমঙ্গলের নিয়ন্ত্রক জাগতিক সত্যই পরম সত্য নয়। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানে পরম সত্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা যা মঙ্গল ও কল্যাণকর বলে মনে করি তার মধ্যে অনেক অমঙ্গল ও অকল্যাণ থাকলেও আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান তা বুঝতে পারে না এবং এর সুদূর প্রসারী ফল সম্পর্কেও আমরা অবহিত নই। একমাত্র আল্লাই মানুষের সার্বিক মঙ্গল অনুধাবন করতে পারেন। এ গল্প ধর্মীয় আমেজে পূর্ণ হলেও এর মধ্যে কোন সামাজিক গোঁড়ামি নেই।

লেখকের সত্য সন্ধানী দৃষ্টি পরিচিত ও জাগতিক সত্যকে স্বীকার করে তৃপ্ত নয় তাই লেখক আধ্যাত্মিক অনুভূতির মধ্য দিয়ে এক চিরন্তন সত্যের জগতে গিয়ে পৌঁছেছেন।

ফেরেস্তাদের কলহ

বেহেশতের একটি সুরম্য প্রাসাদ কক্ষে ফেরেশতা অপরূপ কারুকার্য খচিত আসনে বসে আলাপ করছিলেন। একজনের নাম রুহুল আমিন। তিনি হচ্ছেন সুনীতির অভিভাবক। মানুষকে নীতি আর ধর্মের পথে পরিচালনা করাই তাঁর দায়িত্ব। আর একজনের নাম রুহুল সিদ্‌ক। তিনি হচ্ছেন সত্যের অভিভাবক তাঁর কর্তব্য হচ্ছে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে পৃথিবীকে সত্যের পথে নিয়ে আসা। তৃতীয় জনের নাম রুহুল জামাল। তিনি হচ্ছেন সৌন্দর্যের অভিভাবক। পৃথিবীকে সৌন্দর্যের আবরণে সাজানোই তাঁর কাজ।

আলাপের এক পর্যায়ে তাঁরা তাঁদের পদের গৌরব ও গুরুত্ব নিয়ে তুলনা করতে আরম্ভ করলেন। নীতির অভিভাবকই প্রথম ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। তিনি জোরগলায় দাবি করে বসলেন তাঁর পদই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সর্বোচ্চ তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বললেন: "প্রিয় বন্ধুগণ, আমার পদ যে এই কায়েনাতে (বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে) সর্বোচ্চ সে বিষয়ে মতভেদের কোন অবকাশ নেই।" (পৃ. ৩২৪) আরও

Dhaka University Institutional Repository

জানালেন, পৃথিবী সব প্রাণীকে সরল পথে তিনিই পরিচালিত করেন। এ কাজ তিনি না করলে শয়তান আজাজিল সমগ্র পৃথিবীর উপর তার রাজত্ব ও প্রভাব বিস্তার করবে। আল্লাহর বিধি-নিষেধের কোন তোয়াক্কা তখন কেউ করবে না। পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। নীতির অভিভাবক রুহুল আমিনের এই আত্ম প্রশংসা শুনে সত্যের অভিভাবক রুহুল সিদ্‌ক বললেন : "অহমিকা যে তোমার প্রধান একটা দোষ আমাদের সকলেরই তা জানা আছে। তুমি যে বিশ্বের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা, আর ফেরেশতাদের মধ্যে তোমার বিশিষ্ট একটা স্থান আছে, সে বিষয়ে অবশ্য আমার সন্দেহ নেই। তবে, নিজেকে আমাদের চেয়ে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার তোমার এই চেষ্টাকে বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। আবার স্থান যে তোমার অনেক উচ্চে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকতে পারে না। কেবল আমি কেন, সৌন্দর্যের অভিভাবকও পদ গৌরবে তোমার চেয়ে বড়। তার কাজের গুরুত্বও তোমার কাজের চেয়ে অনেক বেশী।" (পৃ. ৩২৪)

সত্যের অভিভাবক মানুষকে আলোর পথ দেখায়। জ্ঞানের আলো মানুষের মাঝে ছড়িয়ে না দিলে এই বিশ্ব প্রকৃতি মানুষের চোখে অন্ধকার দেখাতো এবং তাদের জীবন বিভীষিকায় পরিণত হতো। এরপর সৌন্দর্যের অভিভাবক রুহুল জামাল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, তারা দুজনে সে সম্মানের দাবি করছেন সে সম্মানের প্রকৃত ও ন্যায্য অধিকারী একমাত্র তিনিই। তাদের তিন জনের এই বাদানুবাদ শুনে মালেক-উল মওৎ আজরাইল বিভীষিকাময় মূর্তি নিয়ে তাদের সামনে হাজির হলেন এবং তাদেকে উদ্দেশ্য জানতে চান এই বেহেশতের মাঝে আজ অশান্তিত কেন? তাঁরা আজরাইলকে জানান যে, কে পদ গৌরবে শ্রেষ্ঠ এবং কার কর্ম বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কে কার চেয়ে বড় এই নিয়ে তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলছে। এই বিতর্কের অবসানের জন্যে তারা তিন জনই আজরাইলের উপর নিষ্পত্তির ভার দেন। আজরাইল তখন তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন: "বন্ধুগণ, তোমাদের তর্কের সুন্দর এক মীমাংসা আমার মাথায় এসেছে। কার কাজের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী এই তোমাদের তর্ক। তোমরা এক এক জন করে ক্ষণেকের তরে যদি নিজ নিজ কাজ থেকে বিরত থাক, আর অপর দুজনে যদি প্রথা মত তাদের কাজ করে যেতে থাকে, আমি তাহলে অনায়াসে বুঝতে পারবো, কার অনুপস্থিতিতে আল্লাতালার মখলুকাতের ভগবানের বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে, আর তাঁকেই আমি প্রথম পদের ন্যায্য অধিকারী সাবস্ত্য করবো।" (পৃ. ৩২৬)

প্রতিযোগী ফেরেশতাগণ এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। সর্বসম্মতিক্রমে সুনীতির অভিভাবকই প্রথম বিশ্বের কাছ থেকে প্রথম নিজেকে অপসারিত করেন। এর ফলের পৃথিবী পাপে পরিপূর্ণ হলো। মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেললো। মানুষ স্নেহ-প্রেম প্রীতি ভালবাসা ভুলে গেল। এক কথায়, পৃথিবী ধ্বংস হবার উপক্রম হলো। আজরাইল সুনীতির অভিভাবক রুহুল আমিনকে সম্বোধন করে বললেন: "বন্ধুবর! তুমি না থাকলে বিশ্বের অবস্থা কি হবে আমি বেশ তা বুঝতে পেরেছি। এখন তোমার কর্তব্যের ভার পুণরায় তুমি গ্রহণ কর। রুহুল সিদ্‌ককে এবার তার কর্তব্য থেকে বিরত হতে দেও।" (পৃ. ৩২৭) সুনীতির অভিভাবক রুহুল আমিন তাঁর কর্তব্যে ফিরে গেলে পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরে এলো। এবার সত্যের অভিভাবক রুহুল সিদ্‌ক তাঁর কর্তব্য থেকে বিরত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী থেকে জ্ঞানের আলো নিভে গেলো। বিশৃংখলা আর অরাজকতায় দেশ ভরে গেল। আজরাইল রুহুল

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্‌ককে উদ্দেশ্য করে বললেন : "মহিমাময় রুহুল সিদক, তোমার শক্তির উচিত মান আমি দিয়েছি। আনুগ্রহ করে এখন তোমার দায়িত্বের ভার পূণরায় গ্রহণ কর।" (পৃ. ৩২৭) রুহুল সিদ্‌ক তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পৃথিবীতে আবার শান্তি ফিরে এলো। আজরাইল সৌন্দর্যের অভিভাবক রুহুল জামালকে তাঁর দ্বায়িত্ব থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করলেন। তিনি তার কাজ থেকে বিরত থাকার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর চেহারা মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেলো। সমস্ত সৌন্দর্য পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হলো। নরনারীর মধ্যে প্রেম-ভালবাসা জাগলো না। সত্যের অনুসন্ধানও কেউ করলো না। পৃথিবীর প্রাণবন্ত গতিশীল জীবন দেখতে দেখতে অচল হয়ে গেল। পৃথিবীর এই অবস্থা দেখে আজরাইল রুহুল জামালকে সম্বোধন করে বললেন : "প্রিয় রুহুল জামাল, তোমার শক্তির এবং কার্যের গুরুত্বের উচিত মাপ আমি নিয়েছি। এখন তুমি তোমার দায়িত্বের ভার পূনরায় গ্রহণ কর।" (পৃ. ৩২৮) রুহুল জামাল তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পৃথিবী আবার আনন্দ কোলাহলে মুখর হলো। এরপর প্রতিযোগী তিনজনই জানতে চাইলেন কে সবচেয়ে বড়? তারা আজরাইলকে সম্বোধন করে বললেন: "মহিমাময় আজরাইল, আমাদের প্রত্যেকের ক্ষমতা তুমি প্রত্যক্ষ করেছ এবং আমাদের কাজের গুরুত্বের মাপও নিয়েছ। এখন অনুগ্রহ করে তোমার ফয়সালা প্রকাশ কর।" (পৃ. ৩২৮) এই কথা শুনে আজরাইল জানায় যে, তাদের প্রত্যেকের পদই সমান সম্মানিত ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা তিনজনই সমান শক্তিমান এবং সমান সম্মানের অধিকরী। তাদের কেউ কারো উপর শ্রেষ্ঠ নয়। তাদের কাউকে বাদ দিয়ে এই বিশ্ব প্রকৃতি চলতে পারে না। সবার উপরই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি একমাত্র আল্লাই করতে পারেন। আজরাইলের এই জ্ঞানগর্ভ ও বিবেচিত মীমাংসায় তিন ফেরেশতাই সন্তুষ্ট হলেন এবং তারা আজরাইলকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে যার যার কর্মস্থলে প্রস্থান করলেন।

'ফেরেশতাদের কলহ' একটি প্রতীকধর্মী গল্প। তিন ফেরেশতার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে গল্প শুরু এবং তাদের মধ্যে পদগৌরবে কে শ্রেষ্ঠ তা মীমাংসার মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি। সুনীতির অভিভাবক রুহুল আমিন, সত্যের অভিভাবক রুহুল সিদ্‌ক এবং সৌন্দর্যের অভিভাবক রুহুল জামাল এদের শ্রেষ্টত্বের দাবী গল্পকে নিয়ে যায়। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে পদ গৌরবে শ্রেষ্ঠ মনে করে। কিন্তু আজরাইলের মীমাংমার পর তারা বুঝতে পারে আসলে পদগৌরবে কেউ শ্রেষ্ঠ নয়। সবার উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার একমাত্র আল্লাহতালা। প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ পদে সমানগুরুত্বপূর্ণ, কেউ কারো উপর শ্রেষ্ঠ নয়। এ গল্পে লেখক ফেরেশতাদের রূপকে মানুষের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। এই পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষই কেউ কারো উপর শেষ্ঠ নয়। প্রত্যেক মানুষই নিজ নিজ পদে সমান গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় কেউ নয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনই এই শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারেন।

নবীদর্শন

সম্ভ্রান্ত এক পাঠান বংশে গোলাম মোহাম্মদের জন্ম। বাপ-মা ছোটবেলায় মারা যায়; চাচা জাহান্দার খাঁ তাকে আদর স্নেহে লালন পালন করেন এবং উপযুক্ত বয়সে এক রূপবতী ও গুণবতী মেয়ের সাথে তাকে বিয়ে দেন। ছোটবেলা থেকেই গোলাম মোহাম্মদের প্রকৃতিতে বৈরাগ্যের আকর্ষণ ছিল। একদিন সে কাউকে কিছু না বলে দিল্লী থেকে সুরাতের পথে পা বাড়ায়, উদ্দেশ্য সেখান থেকে জাহাজে করে

Dhaka University Institutional Repository

জেদ্দায় যাবে এবং সেখান থেকে মদিনা মনোয়ারায়। গোলাম মোহাম্মদের সংসারের দিকে তেমন খেয়াল ছিল না। সব সময় সুফী দরবেশদের সঙ্গ ভালবাসতো। আর তররেজ, রুমী, হাফিজ প্রমুখ কবিদের বই ভক্তির সাথে দিন-রাত পড়তো। সব কিছু গোলাম মোহাম্মদ ধর্মচিন্তা আর সাধনাতেই মগ্ন থাকতো এবং চাচা জাহান্দার খাঁ এতে তেমন আপত্তি করতেন না। কারণ তাদের অনেক বিষয় সম্পত্তি ছিল এবং তিনি নিজেও ধর্মপ্রাণ লোক ছিলেন। গোলাম মোহাম্মদের চেহারায় এমন কিছু ছিল যা দেখে তার চাচার মনে এক অপূর্ব স্বর্গীয় ভাবের সঞ্চার হতো। তিনি বলতেন: "বেটা গোলাম মোহাম্মদ আমাদের খানদানের নাম রাখবে। ওর চেহারায় যে, নূরানী চমক আছে, তা আল্লার পিয়ারাদের চেহারাতেই দেখতে পাওয়া যায়।" (পৃ. ৩৩০)

গোলাম মোহাম্মদের এক শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ করে। জাতিকে দেখে তার চাচা জাহান্দার খাঁ খুব আনন্দিত হন। ধুমধামের সঙ্গে নাতির আকিকা করে খাঁ সাহেব তার নাম রাখেন সায়েফউল্লাহ (আল্লার তলওয়ার) এবং আশীর্বাদ করেন, যেন তার নাতির নাম সার্থক হয়। আকিকার পর জাহান্দার খাঁ কলেরা রোগে মারা যায়। চাচা মারা যাবার পর গোলাম মোহাম্মদের আর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হলো না। সে প্রতীজ্ঞা করলো সংসারের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবে না, সে মদিনায় চলে যাবে এবং রসূলের মাজারে বসে এবাদত করে অবশিষ্ট জীবন সেখানে কাটিয়ে দেবে। তারপর দোকান থেকে সুফির ব্যবহার্য পোষাক কিনে আনে এবং কাউকে কিছু না বলে সেই পোষাক পড়ে সামান্য কিছু পাথেয় নিয়ে সে ঘর থেকে বেড়িয়ে পড়ে। পথ চলতে চলতে রাত হলো। ক্লান্ত গোলাম মোহাম্মদ এক গাছের ছায়ায় রাত কাটাবার সংকল্প করলো এবং এশার নামাজ পড়ে আল্লা আর রসূলের ধ্যানে মগ্ন হলো। তার মন নবী প্রেমে ভরপুর হয়ে গেল, শোবার আগে নবীকে সম্বোধন করে মিনতির সুরে সে বললো: "হে আশরাফ-উল আম্বিয়া, মানবের শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক! তোমার প্রদর্শিত পথ ভিন্ন পথ না। গরীব এই উম্মতকে তুমি পথ দেখাও। তোমারই গোলা সে। তুমি ছাড়া তার গতি নাই, তোমার আশাতেই ঘর সংসার ছেড়ে সে পথে বেরিযেছে। সত্য পথ দেখিয়ে জীবন তার সার্থক কর।" (পৃ. ৩৩১) এক পর্যায়ে গোলাম মোহাম্মদ ঘুমিয়ে পড়ে এবং স্বপ্নে নবী এসে দেখা দেন। সে স্বপ্নে দেখতে পায় উজ্জ্বল লৌহবর্মে আবৃত এক মহাপুরুষ তার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর মাথায় লোহার টুপির সাথে সবুজ বর্ণের পাগড়ি শোভা পাচ্ছে। তাঁর এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে কোরান বিদ্যুতের মতো জ্বলছে। গোলাম মোহাম্মদ অন্তরে অনুভব করলো, ইনিই হচ্ছেন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা এবং সে একান্ত মিনতির সঙ্গে হযরতকে অভিবাদন করলো। স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে নবী বললেন: "বৎস! তোমার ভালবাসা আর আন্তরিকতা আমায় একান্তভাবে স্পর্শ করেছে; স্বশরীরে তাই আজ তোমায় দেখা দিতে এলুম। আমার কাছ থেকে বর প্রার্থনা কর।" (পৃ. ৩৩২) এ কথা শুনে গোলাম মোহাম্মদ জানায়: "হুজুরের দিদার লাভ করলুম এই আমার পরম সৌভাগ্য। আমি কেবল একটি বর আপনার কাছে প্রার্থনা করবো; আপনার উম্মত আমি, আপনার নির্দেশিত পথের সন্ধান আমায় দিন, আর সেই পথে চলবার শক্তি যেন আমি পাই– তার জন্য দোয়া করুন।" (পৃ. ৩৩২) গোলাম মোহাম্মদের প্রার্থনা শুনে নবী জানতে চান, সে কোথায় যাচ্ছে? গোলাম মোহাম্মদ জানায় হুজুরের মাজার শরীফ জিয়ারত করার জন্যে সে মদিনায় যাচ্ছে এবং অবশিষ্ট জীবন সেই মাজারেই কাটিয়ে দেবে। একথা শুনে হযরত মোহাম্মদ তাকে এবাদতের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন এবং ধর্মের তিনটি

Dhaka University Institutional Repository

মূল মন্ত্র সালাত, খায়রাত ও জেহাদ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা দেন। আল্লাহকে স্মরণ করা, পরের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা করার নাম সালাত। বিপদে পরের সাহায্য করার নাম খয়রাত এবং মিথ্যার বিরুদ্ধেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাম জেহাদ। হযরত গোলাম মোহাম্মদকে ঘরে ফিরে প্রকৃত ইসলামের সাধনায় আত্ম নিয়োগ করার পরামর্শ দেন। তাকে উদ্দেশ্য করে হযরত বলেন:

> তুমি যদি আমার পথে চলতে চাও, তাহলে তোমাকে মোজাহেদ হতে হবে। অজ্ঞতার বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমাকেও অবিরাম যুদ্ধ করতে হবে। নিষ্ক্রিয় সন্ন্যাসীর জীবন আমার উম্মতের জন্য নয়। সংসার এবং সমাজ ত্যাগ করে তুমি ভুল করেছ। ইসলামের আদর্শ সমাজের বাইরে কখনও উপলব্ধ হতে পারে না। সমাজ হচ্ছে মোস্‌লেমের শস্যক্ষেত্র; সেই ক্ষেত্রেই তাকে সালাত, খায়রাত এবং জেহাদের বীজ বপন করতে হবে: আর সেই বীজ থেকেই সে রেজওয়ানে খোদার (আল্লাহর তুষ্টির) অমূল্য ফসল হাসিল করবে। বৎস! আবার তুমি সংসারে ফিরে যাও; সমাজে ফিরে যাও। তোমার স্ত্রীকে ভালবাস, তাকে সুখী কর। তোমার সন্তানকে ভালবাস, তাকে প্রকৃত ইসলামের মন্ত্রে দীক্ষিত কর। তোমার প্রতিবেশীদের ভালবাস, তাদের সুখে সুখী হও, তাদের দুঃখে দুঃখী হও। সম্পদে তাদের আনন্দ বর্দ্ধন কর। বিপদের তাদের সাহায্য কর। দিন রাত তাদের মঙ্গলের চিন্তায় ব্যস্ত থাক। সত্যের প্রচার কর, মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। যেখানে কেউ সত্য ঘোষণা করছে, বীরের মত তার পাশে দাঁড়িয়ে সময়ে, সকল অবস্থায়, আল্লাহকে স্মরণ কর, তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, তার কাছে হেদায়েত চাও। এই হচ্ছে আমার দীন, এই হচ্ছে ইসলাম। বৎস! এখনই তুমি ঘরে ফিরে যাও, আর প্রকৃত ইসলামের সাধনায় আত্মনিয়োগ কর।(পৃ. ৩৩৪)

গোলাম মোহাম্মদ গভীর আগ্রহ ও আবেগে নবীকে আলিঙ্গণ করার জন্য উঠতে গিয়ে দেখে প্রায় ভোর হয়েছে। তখনও তার চোখে নবীর নূরানী ছবি জ্বর জ্বল করছে। তারপর আযান দিয়ে নামাজ পড়ে গোলাম মোহাম্মদ ঘরে ফিরে চললো।

প্রেমের মোসাফের

অনেক দিন আগে মুসলমানেরাই ছিল পৃথিবীর সেরা জাতি। শুধু এশিয়াতেই নয় ইউরোপের স্পেন, ইটালী, সিসিলি, কর্শিকা প্রভৃতি দেশেও তারা বাদশাহী করতো। স্পেনের দক্ষিণে ছিল মুসলমান বাদশার রাজধানী গ্রানাডা। গ্রানাডার বাদশারা "আলহামরা" প্রাসাদেই থাকতেন। শাহজাদা আহমদ কামালের পিতা ছিলেন গ্রানাডার প্রতাপশালী বাদশা। কামালের জন্মের পর ভাগ্য গণনা করে জানানো হয় কিশোর বয়স থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তাকে এমন এক জায়গায় রাখতে হবে সেখানে কোন স্ত্রীলোকের সংসর্গে শাহজাদা আসতে না পারেন। একুশ বছর পার হয়ে গেলে তাঁর জীবন-শঙ্কা কেটে যাবে। তারপর খুশি তিনি যেতে পারবেন, যার সাথে খুশি মিশতে পারবেন।

আল হামরা প্রাসাদের সামনেই ছিল একটি পাহাড়। সেই পাহাড়েই তৈরি হলো সুন্দর এক মহল। সেই মহলের চারদিকে উঁচু পাচিল দিযে ঘেরা হলো এবং সেখানে একটি মনোরম বাগান তৈরি হলো। মিশর দেশ থেকে এক বৃদ্ধ হেকিম এনে কামালের তত্ত্বাবধানে করা হলো। এই হেকিমের নাম হলো ইবনে বোনাব্বান। সারা জীবন তিনি মিশরের পিড়ামিডের সন্ধানেই কাটিয়েছেন। যত রকম

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা আছে সবকিছু শাহজাদাকে ভালভাবে শেখাতে অনুরোধ করা হলো। কিন্তু প্রেমের বিষয়ে কিছু নিষেধ করা হলো। হেকিম সাহেব বিশ বছর নানা বিষয়ে তাকে শিক্ষা দিলেন, কিন্তু প্রেমের বিষয় কিছু জানতে দিলেন না।

একদিন হেকিম সাহেব লক্ষ্য করলেন শাহজাদার প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে শাহজাদা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো, মাঝে মাঝে সুরের সাধনাতে সময় কাটাতে লাগলো। হেকিম সাহেব অনেক চেষ্টা করেও তাকে পড়াশুনার দিকে মন ফেরাতে পারলেন না। হেকিম সাহেব শাহজাদার মনের বিচিত্রি লীলাখেলা দেখে ভীত হয়ে পড়লেন শাহজাদার জীবন শঙ্কার কথা আর নিজের বিপদের কথা ভেবে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাই একদিন শাহ্জাদাকে উচু বুরুজের মধ্যে বন্দি করে রাখলেন। বুরুজে অনেগুলো সুন্দর সুন্দর কামরা ছিল। এর চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্যও ছিল খুব মনোরম। এখানে শাহ্জাদার জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠলো। তাঁর কাতর অবস্থা দেখে হেকিম সাহেব বাধ্য হয়ে চিত্ত বিনোদনের উপায় খুঁজতে লাগলেন।

হেকিম ইব্নে বোনাব্বান মিশর থেকে ইহুদি আলেমের কাছে পশু পাখির ভাষা শিখেছিলেন। এই ইহুদি আলেম পুরুষানুক্রমে সোলায়মান বাদশার কাছ থেকে এই বিদ্যা শিখেছিলেন। শাহজাদা এই বিদ্যা শেখার প্রস্তাব শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। গভীর আগ্রহ ও মনোযোগের সাথে শাহজাদা শিক্ষা নিতে থাকলো। এই শিক্ষা নেয়ার পর পশু-পাখির সাথে শাহ্জাদা কথা বলার সুযোগ পেলেন। প্রথমে তিনি একটি বাজপাখির সাথে কথা বললেন। কিন্তু বাজপাখির স্বভাব-চরিত্র তাঁর ভাল লাগলো না। তারপর সে এক পেচকের সাথে কথা বললো। পেচককে তাঁর পণ্ডিতের মতো মনে হলো। পেচক শাহজাদার সাথে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতো, আবার মাঝে মাঝে যাদুবিদ্যার কথাও তাঁকে বলতো। কিছুদিন পর এটাও শাহজাদার ভাল লাগলো না। এরপর এক বাদুড়ের সাথে আলাপ করলেন। বাদুড় খিলানের এক অন্ধকার কোণে দিনের বেলায় ঝুলতো আর সন্ধ্যে হলে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াত। বাদুর ছাড়াও সেখানে একটা বাবুই পাখি থাকতো। তার সাথে আলাপ করে শাহজাদার বেশ কিছুদিন আনন্দেই কাটলো। তারপর কিছুদিন যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারলো যে, বাবুই একটা বাক্যবাগীশ ছাড়া আর কিছুই নয়। পাখিদের সাথে কথা বলে তার আর মন ভরলো না।

একদিন এক বসন্তে শাহজাদা দেখলো প্রকৃতির মধ্যে গানের সুর। সেই গানের সুরের মধ্যে ভেসে আসলো প্রেম, প্রেম।" এই প্রেমের গানেই প্রকৃতি উন্মত্ত। শাহজাদা অবাক হয়ে ভাবলো সবার মনেই প্রেম, অথচ সে প্রেম সম্পর্কে কিছুই জানে না। শাহজাদার মানসিক অবস্থা যখন এমন এক পর্যায়ে তখন হেকিম সাহেব তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, প্রেমই মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ। এই প্রেমের জন্যে ভাই ভাইকে খুন করে। বিশ্রামহীন দিন রাতই হচ্ছে প্রেমের নিত্য সহচর। প্রেমই সব সুখ-শান্তি নষ্ট করে, অকালে বার্ধক্য এনে দেয়। প্রেমের মারাত্মক পথ থেকে শাহজাদাকে রক্ষার জন্যে হেকিম সৃষ্টি কর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শাহজাদার দুঃখ আরো বেড়ে গেল। সারাক্ষণ প্রেমের বিষয় নিয়েই তিনি ভাবতে থাকেন। একদিন শাহজাদার ঘরে একটি ঘুঘু পাখি মেঝেতে লুটিয়ে পড়লো, কেননা একটি বাজপাখি তাকে আক্রমণ করেছিলো। শাহজাদা তাকে খাঁচায় রাখলো। কিন্তু পাখি আদর যত্ন পেয়েও খুশি হলো না। তাই শাহজাদা পাখিকে জিজ্ঞাসা করলো: "কেন তুমি ক্ষুণ্ন হয়ে বসে আছ পাখি? তোমার অন্তর যা চায় সবই কি তুমি পাও নি?" (পৃ. ৩৪৩) পাখি উত্তর দিল, সে তার ভালবাসার জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। শাহজাদা তখন পাখিকে অনুরোধ করলো : "সোনার পাখি আমার! এই ভালবাসা জিনিষটা কি তুমি কি আমায় বুঝিয়ে দিতে পার।" (পৃ. ৩৪৪) পাখি তখন শহাজাদাকে প্রেমের অর্থ বুঝিয়ে বললো যে, একের জন্যে ভালবাসা হচ্ছে দুঃখ, দুই জনের জন্য আনন্দ আর তিনজনের বিরোধ। ভালবাসা হচ্ছে ইন্দ্রজাল, যার প্রভাবে দুটি প্রাণ সহানুভূতির কোমল মধুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। এ কথা শুনে শাহজাদা পাখিকে মুক্ত করে দিলো। পাখি পাখা নাড়া দিয়ে আকাশে উড়লো। এবার শাহজাদা প্রেমের অর্থ বুঝতে পারলো। এরপর তিনি হেকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলের, কেন তিনি তাকে এতোদিন জীবনের মূল রহস্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেন নি? হেকিম তখন ভবিষ্যৎ বর্ণনাকারীদের সব ভবিষ্যত বাণী শাহজাদাকে খুলে বলেন।

একদিন শাহজাদা মিনারের ছাদে বসেছিলেন। এমন সময় সেই ঘুঘু পাখিটি এসে তার কাঁধের উপর এসে বসলো এবং এক রূপসী রাজকন্যার খবর দিলো। রাজকন্যার কথা শুনে তাঁর মনে প্রেমভাব জাগ্রত হলো। সেই অপরিচিতা রাজকন্যার প্রেমে তিনি উন্মনা হলেন। একটা চিঠি লিখে পাখিকে অনুরোধ করলেন রজকন্যার কাছে পৌঁছে দিতে। শাহজাদার কথা মতো পাখি রজকন্যার কাছে চিঠি পৌঁছে দেয় এবং আসার সময় রাজকন্যা মতির হারের সাথে তার ছবি পাখির গলায় বেঁধে দেয়। পাখি উড়ে আসর সময় শিকারীর গুলিতে বিদ্ধ হয় এবং অনেক কষ্টে প্রাণপণ শক্তিতে শাহজাদার কাছে উপস্থিত হয়। পাখি শাহজাদার পায়ের কাছে পড়েই মারা যায়। পাখির গলায় হার ও ছবি দেখে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। তারপর একদিন তিনি পেচকের কাছে তাঁর প্রেমের কথা খুলে বলেন এবং পেচককে সঙ্গে করে পালাবার পরিকল্পনা করেন। একরাতে পাচিল টপকিয়ে তিনি পেচককে সঙ্গে নিয়ে পেচকের নির্দেশ মতো সেভিল নগরের উদ্দেশ্য যাত্রা করলেন। সেখানে থাকে এক দাঁড়কাক এবং সেই দাঁড়কাক ছিল যাদুবিদ্যায় পারদর্শী। শাহজাদা সেই শহরের মিনারের উপর উঠে দাঁড়কাকের সামনে উপস্থিত হলেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে মিনতির সাথে জানতে চাইলেন যে, তিনি কেমন করে তাঁর প্রেমিকা রাজকন্যার দেখা পেতে পারেন? শাহজাদা তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যও তাকে খুলে বলেন। অনেক মিনতির পর দাঁড়কাক তাঁকে কর্ডোভা শহরে যাবার পরামর্শ দেয়। সেখানে জামে মসজিদের এক খেজুর গাছের তলায় এক মোসাফের আস্তানা করে বসে আছে, সে-ই রাজকন্যার সঠিক খবর দিতে পারবে। পেচককে সাথে নিয়ে অনেক নদী পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে কর্ডোভা শহরের সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। এখানে এসে দেখতে পেলেন ইরান দেশের এক কথক তোতা পাখি গল্প বলছে, আর সব লোক গভীর আগ্রহের সাথে তা শুনছে। প্রাচ্যের সব জ্ঞান এর আয়ত্তে, কবিতা ও গজলও সে জানে। অনেক শাহী দরবেশের সাথে তার পরিচয়ও আছে। এক সময় শাহজাদা তোতা পাখির কাছে তার আগমনের কথা খুলে বসে এবং সেও তোতা পাখিকে সেই রাজকন্যার ছবি দেখায়। ছবি দেখে তোতা পাখি জানালো যে, এ ছবি বাদশাজাদি আলভিগন্ডার। এ

Dhaka University Institutional Repository

রাজকন্যা হলো টলেডোর খ্রিস্টান বাদশার একমাত্র কন্যা। কিছু ভণ্ড দৈবজ্ঞের কথায় রাজা তাকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছে এবং তাকে অবরোধ করে রেখেছে।

একদিন তোতা পাখি, পেচক ও শাহজাদা এই তিনজন এক সাথে টলেডোর উদ্দেশ্যে রওনা হলো। তারা সায়েরা মোরেনার দুর্গমগিরি পথ পেরিয়ে লা-মানচা এবং ক্যাষ্টিলের সমতল ভূমি পাড়ি দিয়ে অবশেষে টেগাস নদীর তীরে অবস্থিত। পাহাড়ের পাদদেশে টেগাস নদী কলকল করে বয়ে যাচ্ছে।

তোতা পাখি দূর থেকে বাদশার রাজপ্রাসাদ দেখলো। সামনে টেগাস নদী। শাহজাদা রাজকন্যাকে খবর দেয়ার জন্যে তোতা পাখিকে অনুরোধ করলো। তোতা পাখি উড়ে গিয়ে দেখলো রাজকন্যা একটা কাগজ হাতে করে দেখেছে আর তার দু'চোখ বেয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। তোতা পাখি রাজকন্যার সামনের উপস্থিত হয়ে শাহজাদার আগমনের কথা তাকে খুলে বলে এবং আরো জানায় গ্রানাডার রাজপুত্র আহমদ আল-কামাল তার প্রেমে পাগল হয়ে এখানে এসেছে। এ কথা শুনে রাজকন্যা খুব খুশি হয় এবং তাকে জানায় রাজকন্যাও তার প্রেমে পাগল হয়ে আছে। রাজকন্যা তোতা পাখিকে জানায় তাকে পেতে হলে রাজপুত্রকে বাহুবলের সাহায্য নিতে হবে। আগামীকাল তার বয়স সতের বছর পূর্ণ হবে। সেই উপলক্ষে রাজা শক্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। যে জয়ী হবে তার সাথেই তার বিয়ে হবে।

তোতা পাখির কাছে শাহজাদা শক্তি প্রতিযোগিতার কথা শুনে এক মহা সমস্যায় পড়লো। তার সঙ্গে কোন অস্ত্র-শস্ত্র ছিল না। তাছাড়া সে অস্ত্র চালাতেও জানতো না। তখন দুঃখ হলো। তার বাবা কেন তাকে অস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নি? অবশেষে পেচক শাহজাদাকে জানায় যে, সামনের ঐ পাহাড়ের মধ্যে এক গুহা আছে। সেই গুহার মেঝের উপর ঐন্দজালিক এক বর্ম আছে। আর মেঝের পাশে ঐন্দ্রজালিক এক ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। যুগ যুগ ধরে বর্ম আর ঘোড়া এই গুহার মধ্যে রক্ষিত আছে। বর্মটি একটি আরব যাদুকরের সম্পত্তি। খ্রিষ্টানরা টলেডো দখল করলে আরব যাদুকর ঐ গুহায় আশ্রয় নেয়। পরে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মরার আগে ঘোড়া আর ধর্মকে সে যাদু করে করলে। মুসলমান ছাড়া অন্য কোন জাতির কেউ ঐ দু'টি জিনিস ব্যবহার করতে পারবে না। এই দুটি জিনিস সকাল থেকে দুপুরের মধ্যে ব্যবহার করতে হবে। অন্য কোন সময়ে নয়। এ জিনিস দু'টি নিয়ে যুদ্ধ করলে কেউ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। পেচকের পরামর্শ মতো ঐ গুহায় এসে শাহজাদা ঘোড়া নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করলো। প্রতিযোগিতার সময় শাহী মণ্ডপে রাজকন্যা ছিল। শাহজাদার নাম ঘোষণার সাথে সাথে সবাই প্রতিবাদ করলো এই বলে যে, কোন বিধর্মী মুসলমান খ্রিস্টান রাজকন্যার পাণি গ্রহণ করতে পারবে না। এক পর্যায়ে প্রতিযোগিতার অন্যান্য রাজপুত্ররা তাঁকে উপহাস ও বিদ্রুপ করতে থাকলে শাহজাদা তাদের আক্রমণ করে। কেউ তার সামনে টিকতে পারে না। ঘোড়া আর বর্শাকে শাহজাদা সামাল দিতে পারলো না। ঐন্দ্রজালিক ঘোড়া একবার কাজ শুরু করলে অর থামতে জানে না। সামনে যাকে পেলো তাকেই সে আক্রমণ করে মাটিতে ফেলতে লাগলো। অবস্থা খুব খারাপ দেখে বাদশা নিজে যোদ্ধার পোষাক পড়ে শাহজাদার সাথে মোকাবেলা করতে লাগলো। কিন্তু বাদশারও সাধারণ মানুষের মতো অবস্থা হলো। ঠিক এই সময় সূর্য আকাশের

Dhaka University Institutional Repository

মাঝখানে এসে উপস্থিত হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে যাদুর ঘোড়া যুদ্ধ-প্রাঙ্গন থেকে যথাস্থানে ফিরে এলো। বাদশাকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় শাহজাদা ব্যথিত হলেন। মন খারাপ করে শাহজাদা বসে আছেন। এমন সময় তোতা পাখি এসে খবর দিলো যে, রাজকন্যা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যুদ্ধ প্রাঙ্গন থেকে প্রাসাদে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পেঁচা এসে খবর জানালো যে, রাজকন্যা তার বুকের মধ্য থেকে চিঠি বের করে বারবার তাতে চুম্বন করে করুণ কণ্ঠে বিলাপ করছে। রাজকন্যার এই অবস্থা দেখে বাদশা একদিন ঘোষণা করলেন যে, রাজকন্যাকে যে সুস্থ করতে পারবে তাকে শাহী তোষাখানার শ্রেষ্ঠ 'জওহেরাত' পুরস্কার দেয়া হবে।

শাহজাদার সঙ্গে আসা পেচক পাখি তাকে জানায় যে, মিশর থেকে এক বৃদ্ধ পেচক এখানে এসেছে। তার কাছে সে জানতে পেরেছে সোলেমান বাদশার উড়ন্ত গালিচা তোষাখানার একটা বাক্সের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। পরদিন শাহজাদা আবরের সাধারণ মানুষের বেশ ধারণ করে হাতে একটা ছড়ি আর মেষ পালকের মতো ছোট্ট একটা বাঁশি হাতে করে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং বাদশার সাথে দেখা করে জানায় যে, সে রাজকন্যার চিকিৎসা করতে চায়। শাহজাদা বাদশাকে আরো জানায় যে, সে ভৌতিক বিদ্যায় পারদর্শী। বাদশা তাকে রাজকন্যার চিকিৎসার অনুমতি দেন। শাহজাদা তখন বাঁশি বাজায় বাঁশির সুর শুনে রাজকন্যা সবকিছু বুঝতে পারে এবং শাহজাদাকে চিনতে পারে। পরে ছদ্মবেশী মেষপালককে রাজকন্যার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। তারা চোখে চোখে প্রেম নিভেদন করলো। কোন কথা হলো না। এতে তারা উভয়েই তাদের মনের ভাব বুঝতে পারলো। রাজকন্যা সুস্থ হলো। এতো তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়ায় সবাই অবাক হলো। বাদশা শাহজাদাকে প্রধান চিকিৎসক হিসাবে নিযুক্ত করলেন এবং তাকে পুরস্কার হিসাবে তোষাখানার শ্রেষ্ঠ রত্ন গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেন, শাহজাদা এ কথা শুনে বাদশাকে উদ্দেশ্য করে বললেন: 'বাদশা সালামৎ, সোনা-রূপা কিম্বা মণি মাণিক্যের পরওয়া আমি করি না। আপনার তোষাখানায় আমাদের একটি স্মরণ চিহ্ন আছে। সেটি হচ্ছে মুসলমানেরা যখন টলেডোরে বাদশাহী করতেন, তখনকার যুগের একটি বাক্স কাঠের তৈয়েরি। আর তার ভিতরে রেশমের এক গালিচা আছে। মেহেরবাণী করে গালিচার সেই বাক্সটি আমায় উপহার দিন; তাতেই আমি সন্তুষ্ট হব।" (পৃ. ৩৬৬) বাদশা সেই গালিচা শাহজাদাকে হাসিমুখে উপহার দিলেন। সেই গালিচায় হিব্রু ভাষায় কিছু কথা লেখা। গালিচা পেয়ে শাহজাদা রাজকন্যার সোফার নিচে বিছিয়ে দিলো। তারপর রাজকন্যার পদপ্রান্তে বসে সবাইকে সম্বোধন করে শাহজাদা বললো: "এই গালিচা এক সময় মহাজ্ঞানী বাদশা সুলেমানের তখতের শোভা বর্ধন করতো। সুন্দরীর যোগ্য আসন বটে। ... তকদিরের কেতাবে যা লেখা আছে, কে তাকে ব্যর্থ করতে পারে? দেখুন সকলে, দৈবজ্ঞের ভবিষ্যৎ বাণী কেমন করে আজ সফল হচ্ছে। বাদশা সালামৎ, তসলিম, আমার রহস্য প্রকাশ করতে এখন কোন আপত্তি নাই। আপনার কন্যা আর আমি পরস্পরকে গোপনে ভালবেসে এসেছি। আমি হচ্ছি প্রেমের মোসাফের।" (পৃ. ৩৬৬) শাহজাদার কথা শেষ না হতেই গালিচা প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে শূন্যে উঠলো এবং দেখতে দেখতে আকাশে অদৃশ্য হলো। বাদশা সালামৎ প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মস্ত বড় সেনাবহিনী নিয়ে গ্রানাডাভিমুখে রওনা হলো এবং গ্রানাডা শহরের কাছে শিবির স্থাপন করলো। তারপর বাদশা তার কন্যাকে ফেরত চেয়ে গ্রানাডার সুলতানের কাছে এক চিঠি দেন। সুলতান চিঠি পেয়ে দরবারের সব আমির ওমরাহ নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

মহলে আনার জন্যে ভ্যালেনকা এক দাসকে তাঁর কাছে পাঠালো। আবু হামেদ দেশ থেকে আসার সময় ভ্যালেনকার জন্য একটা হরিণ শাবক নিয়ে আসেন। ভ্যালেনকা এ উপহার পেয়ে খুব খুশি হয়। পরের বছরও আসবে বলে আবার কথা দিয়ে আফ্রিকা চলে যান।

আবার আবু হামেদ যথাসময়ে ফিরে এলেন। এবার আর সাগরতীরে ভ্যালেনকা গেলো না। এমন কি কোন লোকও তাকে স্বাগত জানানোর জন্য গেলো না। তবে বন্দর কর্মকর্তার কাছে আবু হামেদকে উদ্দেশ্য করে ভ্যালেনকা একটি চিঠি পাঠায়। চিঠিতে ভ্যালেনকা লিখেছে : "বিশেষ কারণবশত তিনি আবু হামেদের সঙ্গে বন্দরে সাক্ষাৎ করতে আসতে পারেন নি। বাবা কার্যোপলক্ষ্যে রাজধানীতে গিয়েছেন। বাড়িতে তার বড় ভাই একজন ফরাসি অতিথি নিয়ে এসেছেন। অতিথি ছেড়ে কোনমতে তিনি আসতে পারলেন না।" (পৃ. ৩৭৮) ভ্যালেনকার বড় ভাই সাত বছর পর বাড়ি এসেছে, সঙ্গে এনেছে এক ফরাসি বন্ধু। তার ভাই ডন কার্লো বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধে অনেক খ্যাতি অর্জন করেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছেন ধর্ম সাধনায় জীবন উৎসর্গ করবেন।

আবু হামেদ ভ্যালেনকাদের বাড়িতে এলেন। ভ্যালেনকা সেই ফরাসি যুবকের কাছে বসেছিল। আর ভ্যালেনকার ভাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সাথে কথা বলছিল। আবু হামেদকে দেখেই ভ্যালেনকা তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভ্যালেনকার মনের ভাব সেই ফরাসি যুবক মিঃ লডারিকও বুঝতে পারলো। কিছু মামুলি কথা-বার্তার পর আবু হামেদ বিদায় নিলেন।

এরপর আবু হামেদ ও ভ্যালেনকার ভালবাসার কথা জানাজানির পর ডন কার্লো আবু হামেদের বাসায় এসে তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করে এবং অনেকক্ষণ ধরে যুদ্ধের পর ডন কার্লোর তরবারি দু'টুকরো হয়ে যায়। অবশেষে ডন কার্লো আবু হামেদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে বললো : "আমি তোমার জাতকে বিধর্মী এবং ঘৃণ্য বলে মনে করি। শীঘ্র আমায় হত্যা কর।" (পৃ. ৩৮১) আবু হামেদ এ কথার উত্তরে বললো : !তোমায় যুদ্ধে হারিয়ে কেবল আমি এই কথা প্রমাণ করতে চেয়েছিলুম যে, ভ্যালেনকার স্বামী হবার যোগ্যতা আমার আছে। তোমায় হত্যা করার উদ্দেশ্য আমি অন্তরে পোষণ করিনি ; করতে পারি না।"(পৃ. ৩৮১) এমন সময় ঘোড়া ছুড়িয়ে ভ্যালেনকা ও সেই ফরাসি যুবক লডারিক এসে উপস্থিত হলো তাদের দেখে ডন কার্লো লডারিককে উদ্দেশ্য করে বললো : "আমি তো হেরেছি। লডারিক তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ, যদি এই বিধর্মী আরবকে হারাতে পারো।" (পৃ. ৩৮১-৩৮২) কিন্তু লডারিক আবু হামেদের সঙ্গে যুদ্ধে রাজি হলো না।

একদিন আবু হামেদ ভ্যালেনকার কথা ভাবতে ভাবতে গির্জায় গিয়ে দেখলো লডারিক গভীরভাবে প্রার্থনারত। এ দৃশ্য দেখে আবু হমেদ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হলেন। আবু হামেদ বেদীর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করতে যাবেন এমন সময় তার চোখে পড়লো এক আরবি লিপিকার উপর। সেই লিপিকায় কোরআন শরীফের একটি আয়াত খোদাই করা ছিল। এ আয়াত দেখে স্বধর্মের প্রতি তাঁর ভালবাসা পুনর্জীবিত হলো। দেরি না করে গির্জা থেকে তিনি বেরিয়ে দরজার কাছে ভ্যালেনকাকে দেখতে পেলেন। তাকে দেখে আবু হামেদ বলে উঠলেন : "তুমি কি লডারিকের সন্ধানে এসেছ ভ্যালেনকা ?" (পৃ. ৩৮২)

Dhaka University Institutional Repository

ভ্যালেনকা তার সন্দেহ দূর করে বললো : "আমি এখানে এসেছি তোমার জন্য প্রার্থনা করতে। আবু হামেদ, আমায় ভালবেসে তুমি উচিত কাজ কর নি। তবে আমার ভালবাসার দায়িত্ব যখন গ্রহণ করেছ, তখন তোমার খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করা উচিত।" (পৃ. ৩৮৩)

সবাই মিলে একদিন লডারিকের বাসায় দাওয়াত খেতে যায়। দেয়ালে দেখা যায় বিজয়ী খ্রিস্টান যোদ্ধাদের ছবি। আর সেই সব ছবির মধ্যে একটা ছিল গ্রানাডার শেষ মুসলমান বাদশার তরবারি। এ দৃশ্য দেখে আবু হামেদ লজ্জায় ব্যথিত হলেন। সেখানে সবার অনুরোধে আবু হামেদ তার বংশের একটা শোকগাথা গাইলেন। তাঁর কণ্ঠের করুণ গান শুনে সবাই শোকে অভিভূত হলো। ডন কার্লোও সেখানে তাদের বংশের কীর্তি গাইলো। আবু হামেদ এ গান শোনার পর তীব্র কণ্ঠে এর প্রতিবাদ করলো : "আপনারা সীডকে বীর পুরুষ বলেন। আমি কিন্তু তাকে দুর্বৃত্ত দস্যু বলেই মনে করি।" (পৃ. ৩৮৪) ডন কার্লো জানালো যে, সীডের পবিত্র রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত। একথা শুনে আবু হামেদ দুঃখ প্রকাশ করে বললো যে, বেয়ার বংশের লোকেরাই গ্রানাডা বিজয়ের পর বনি সেরাজ বংশের এক আমীরকে তার পিতার কবরের সামনে হত্যা করেছিল। সেই বেয়ার বংশ এখন 'সানাতাফি' নাম ধারণ করেছে তা তার জানা ছিল না। একথা শুনে ডন কার্লো গর্বের সাথে বলে উঠলো : "আমার মহিমান্বিত পিতামহই 'বনি সেরাজে'র আমীরকে স্বহস্তে হত্যা করেছিলেন। মহারাজ ফার্ডিনান্ড তাঁকেই 'ডিউক সানতাফির গৌরবান্বিত উপাধিতে ভূষিত করেন।" (পৃ. ৩৮৪)

এ কথা শুনে আবু হামেদের চোখ দিয়ে নীরবে ক'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তারপর আবু হামেদ ভ্যালেনকার দিকে চেয়ে বললেন : "ভ্যালেনকা, তুমি বনি সেরাজ বংশের শেষ কুল প্রদীপের কথা স্মরণ করে বিরলে একটু অশ্রু মোচন করো!" (পৃ. ৩৮৫) এ কথা শুনে সবাই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো। কিন্তু ভ্যালেনকা গর্ব অনুভব করলো। আবু হামেদ তাকে সম্বোধন করে আবার বললেন : "আমি আজীবন তোমার গোলাম হয়ে থাকবো। আমার জীবনের কথা কিন্তু তোমার জানা নেই। আমি বাওয়ার-বংশের কথা বলেছিলাম, তাদেরই একজন বনি-সেরাজের এক আমীরকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন। সেই আমীর ছিলেন আমার পিতামহ।" (পৃ. ৩৮৫) তারপর আবু হামেদ গ্রানাডা আসার উদ্দেশ্য খুলে বলে। পূর্ব-পুরুষের হত্যার প্রতিশোধ নিতে এসে ভাগ্য কিভাবে তাঁকে প্রেমে জড়িয়ে ফেললো। ভ্যালেনকাকে উদ্দেশ্য করে আবু হামেদ আবার বললেন : "তোমার প্রতিশ্রুতি তোমায় এখন ফিরিয়ে দিচ্ছি। নিজের জন্য আজীবন সঙ্গীহীন জীবনের ব্যবস্থা আমি করবো। আমার মৃত্যুর সঙ্গে এই দুই বিখ্যাত বংশের বিরোধেরও শেষ হবে। কালের করাল করস্পর্শে আমার ছবি যদি তোমার অন্তর থেকে মুছে যায় তাহলে এই উচ্চমনা ফ্রেঞ্চ নাইটকে–।" (পৃ. ৩৮৫) আবু হামেদের এ কথায় লডারিক খুশি হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাকে তাদের মাঝে থাকার অনুরোধ করলেন। ডন কার্লো আবু হামেদের আত্মত্যাগের প্রশংসা করলেন এবং গভীর আন্তরিকতার সাথে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন : "আবু হামেদ তুমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ কর। আমি নিজেই ভ্যালেনকাকে তোমার হাতে সমর্পণ করবো।" (পৃ. ৩৮৬) ডন কার্লোর এ প্রস্তাব শুনে আবু হামেদ বললো : "অন্যায়ভাবে নিহত ব্যক্তির পৌত্র কি তাঁর হন্তারকের পৌত্রীকে বিয়ে করতে পারে।" (পৃ. ৩৮৬) এ কথা বলার পর ভ্যালেনকার প্রেম তাঁর সারাটা মনপ্রাণ দখল করে বসলো। তাই ভ্যালেনকাকে উদ্দেশ্য করে আবার

Dhaka University Institutional Repository

আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন : "ভ্যালেনকা, তোমার নির্দেশমতো আমি চলবো। এ সমস্যা সমাধানের ভার তোমার হস্তেই অর্পণ করলাম।" (পৃ. ৩৮৬) এ কথা শুনে আবেগ জড়িত কণ্ঠে ভ্যালেনকা আবু হামেদকে বললো : "যাও, আবু হামেদ, তুমি দেশে ফিরে যাও।" এ কথা বলতে বলতে তার সংজ্ঞাহীন দেহটি মাটিতে পড়ে গেলো। আবু হামেদ গভীর সংযমের সাথে সে আদেশ নতশিরে গ্রহণ করলেন। পরদিন জাহাজে চড়ে আবু হামেদ তার দেশ আফ্রিকায় ফিরে এলেন। একমাত্র মেয়ের এ দুঃখবেদনা সহ্য করতে না পেরে ভ্যালেনকার বাবা মারা যায়। ভ্যালেনকাকে কেউ বিয়ের কথা বলতে সাহস পেতো না। তবে সে মুসলমানের নিন্দা সহ্য করতে পারতো না। টিউনিস নগরের উপকণ্ঠে প্রাচীন কার্থেজ শহরের যে ভগ্নাবশেষ আছে আবু হামেদের কবর সেখানে আজো দেখতে পাওয়া যায়।

এস. ওয়াজেদ আলির 'তরুণ আরব' একটি প্রেমের গল্প। গল্পটি একটি বিদেশি গল্প অবলম্বনে লিখিত। বংশগৌরব, আভিজাত্য ও ধর্মীয়বোধ এ প্রেমের মাঝখানে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

গ্রানাডার মুসলমান সুলতানদের অতীত ইতিহাস, খ্রিস্টানদের গ্রানাডা দখলের কাহিনী বর্ণনা করে এ গল্প শুরু হলেও গল্পের নায়ক আবু হামেদের গ্রানাডা আগমনের পর গল্পের কাহিনী হৃদয়ধর্মী হয়ে ওঠে। ভোর রাতে অপ্রত্যাশিতভাবে আবু হামেদের সঙ্গে ভ্যালেনকার দেখা এবং ভ্যালেনকার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে পরিচয়ের সূত্রে তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া অবশেষে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাই গল্পটিকে আবেগময় করে প্রেমের গল্পে পরিণত করেছে।

প্রচারক

একবার লেখক এক সভায় গিয়েছিলেন। এক বক্তা হিন্দিভাষায় বক্তৃতা করছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা'। বক্তার হাতে ছিল বাঁশের লাঠি আর মাথায় ছিল বিপুল আকারের পাগড়ি। বক্তা জোরের সাথে বলেন যে, যিশুখ্রিস্টের অনেক আগেই এই ভারতে প্রেমের মন্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে প্রচারিত হয়েছিল। বললেন : "এই যে অহিংসা মন্ত্র বিশ্বের গৌরবের বস্তু, সে হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতারই দান।"(পৃ. ৩৮৭) বক্তা তারপর বিভিন্ন জাতির সভ্যতার সমালোচনা করেন। এইভাবে প্রায় দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করার পর বক্তা বসে পড়েন। লেখক এতক্ষণ বক্তৃতা শুনছিলেন। এবার দু'কথা না বলে পারলেন না। তিনি নিঃসঙ্কোচে বললেন : "আপনাদের মনে রাখা দরকার ঝর্ণার জল যেদিন মানুষের পিপাসা নিবৃত্তি করেছে, প্রেমের মন্ত্র সেদিনই বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে। পশুমাতা যেদিন শাবককে দুগ্ধপান করিয়েছে অহিংসা নীতি সেই দিনই বিশ্বে জন্মলাভ করেছে। প্রেম এবং অহিংসা নীতির আদি প্রচারক কোন নীল চশমাধারী বক্তা নন। সে কাজ স্বয়ং বিশ্বকর্মাই করেছেন।" (পৃ. ৩৮৮) প্রচারক বক্তা লেখকের কথায় প্রতিবাদ করার জন্য লাঠি ঠুকে উঠে দাঁড়ালেন। লেখক ক্ষমা চেয়ে বললেন যে, দু'মিনিটেই তিনি বক্তব্য শেষ করবেন। লেখককে অন্য জায়গায় যেতে হবে, তাই বেশি সময় এখানে থাকতে পারবেন না। লেখক বক্তাকে জানালেন যে, তাঁর বাড়িতে অনেকগুলো হাঁস আর কুকুর আছে। বক্তাকে একটু রাগাবার জন্যে লেখক হেসে বললেন যে, তিনি কুকুর খুব ভালবাসেন। তারপর লেখক একটা গল্প বললেন : দুটি বাচ্চা হাঁস একটা কুকুরের সঙ্গে খেলা

Dhaka University Institutional Repository

করছিল। হাঁসের ছানা দুটি ঠোঁট দিয়ে অনবরত কুকুরটাকে কামড়াচ্ছিল। কুকুরটা সে কামড় বেশ উপভোগ করছিল। তবে তাদের বাড়াবাড়ি থামাবার জন্য কামড়াবার ভাণ করে তাদের দিকে মুখ বাড়াচ্ছিল। হাঁসের বাচ্চাগুলো এই রাগে বিচলিত হলো না। হাঁসের বাচ্চাগুলো যখন কিছুতেই দমলো না তখন কুকুরটি রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলো। বক্তাকে সম্বোধন করে লেখক বললেন : "অহিংসা আর প্রেম এই কুকুরকে কে শিখিয়েছিল?" (পৃ. ৩৮৮) এই কথা বলে লেখক সভা ছেড়ে চলে আসেন। পরে লেখক তার বন্ধুদের কাছে শুনেছিলেন লেখকের প্রতিবাদের জন্য বক্তা তিনঘণ্টা ধরে বক্তৃতা করে বলেছিলেন তার শরীর ভাল থাকলে তিনি আরো দু'ঘণ্টা কথা বলতেন।

সুরাটের কাফিখানা

তিন শতাব্দী আগে সুরাট ছিল ভারতের প্রধান বন্দর। সুরাট শহরে সাগরের তীরে একটা কাফিখানা ছিল। নানাদেশের লোক সেখানে আসতো বিশ্রাম ও পানাহারের জন্য। একদিন সেখানে ইরান দেশের এক দার্শনিক এসে উপস্থিত হন এবং তার সঙ্গে আসে এক হাবসী গোলাম। খোদার বিষয় দিন রাত আলাপ-আলোচনা, গবেষণা ও চিন্তা করতে করতে ইমান হারিয়ে তিনি খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েন। স্বর্গীয় আলোকের অভাবে তাঁর মনে খুব অশান্তি দেখা দেয়। অশান্তির হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তিনি বেশি পরিমাণে অহিফেন সেবন করতেন। অভ্যাসমতো প্রচুর অহিফেন সেবন করে দার্শনিক কাফিখানার এক সোফায় হেলান দিয়ে যাত্রীদের আসা-যাওয়া দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো হাবসী দাসকে। দার্শনিক আবেগজড়িত কণ্ঠে দাসকে জিজ্ঞাসা করলেন : "দাস বসে বসে কি ভাবছো তুমি ? ... আচ্ছা বল দেখি বন্ধু, তুমি কি খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাস করো " যদি করো তাহলে অকাট্য যুক্তি দিয়ে তোমার বিশ্বাসের সমর্থন করো ? উত্তরে দাস বললো যে, সে খোদাকে দেখেছে। তারপর দাস দার্শনিককে সম্বোধন করে বললো : "খোদার অস্তিত্বের আপনি প্রমাণ চাচ্ছিলেন? এই দেখুন, খোদা এখানে সশরীরে উপস্থিত।" (পৃ. ৩৮৯) একটা কাঠের টুকরোর দিকে ইঙ্গিত করে দাস তাকে বললো যে, এই কাঠের টুকরোই তার স্রষ্টা। তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই কাঠের টুকরোই তাকে রক্ষা করেছে। কথা শেষ করে হাবসী ভক্তির সাথে কাঠের টুকরোটা ঘন ঘন মাথায় ঠেকাতে ঠেকাতে বললো : "তুমি অনাদি, তুমি অনন্ত, এ বিশ্ব তোমারই সৃষ্টি। ... মৃত্যুর পর আমি যেন অনন্ত কাল ধরে তোমার ডালের পাখি হয়ে থাকতে পারি। আর তোমার সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করতে পারি।" (পৃ. ৩৯০) যারা কাফিখানায় এসব আলোচনা শুনছিলেন তাদের মধ্যে একজন দাক্ষিণাত্যের ব্যবহার শাস্ত্র বিশারদ নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলো। হাবসী দাসের বক্তৃতা শুনে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : "ওরে কৃষ্ণকায় শূদ্র, সত্যই তুই একটা নিরেট মূর্খ। বিশ্বপ্রভু ব্রহ্মাকে কি কেউ কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে ? তিনি যে ব্রহ্মাণ্ডের চেয়েও বড়। তিনিই তো এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক মাত্র সত্য ; তিনি ছাড়া আর সব মিথ্যা।" (পৃ. ৩৯০) শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতের মতে, ব্রাহ্মণের দ্বারাই ব্রহ্মার পূজা অর্চনা হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণরাই ব্রহ্মার পূজা অর্চনার প্রকৃত অধিকারী। তার মতো দাসের মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করার অধিকার নেই। ব্রাহ্মণের কথা শেষ না হতেই এক বৃদ্ধ ইহুদি বণিক বলে উঠলেন : "শুনুন পণ্ডিত মশায়! আপনার কথা মোটেই বিচারসহ নয়। বিশ্বপ্রভুর প্রকৃত মন্দির এই পৌত্তলিকতাপূর্ণ ভারতবর্ষে নয়, গঙ্গানদীর তীরে নয় ; সে মন্দিরের উপযুক্ত পীঠস্থান হচ্ছে বিশ্ববাসীর শ্রেষ্ঠ তীর্থ – পবিত্র

Dhaka University Institutional Repository

জেরুজালেম নগর, আর তার মন্দিরের প্রকৃত পূজারী হচ্ছেন একেশ্বরবাদী এব্রাহিমের বংশধর ইহুদিরা, ব্রাহ্মণেরা নয়।"(পৃ. ৩৯০-৯১) এমন সময় এক খ্রিস্টান মিশনারী তাকে বাধা দিয়ে বললেন যে, প্রায় দু'হাজার বছর আগে খোদা ইহুদিদের একটু স্নেহের চোখে দেখতেন। কিন্তু তারপর তিনি তার একমাত্র পুত্র ক্রাইস্টকে পাঠালেন সমগ্র মানব জাতির উদ্ধারের জন্যে। কিন্তু ইহুদিরা শত্রুতা করে তাকে এক কাঠে চড়িয়ে হত্যা করে। চিরকাল তারা মানুষের ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়েই থাকবে। তিনি আরো বলেন, মুক্তির পথ সকলের জন্যে তিনি খোলা রেখেছেন। সেখানে একজন প্রটেস্টান্ট প্রতিবাদ করে বললেন : "যারা যিশুখ্রিস্টেকে মানবে, বাইবেলের নির্দেশ মতো চলবে, তারাই মুক্তি পাবে, তা তারা খ্রিস্টান ধর্মের যে কোন সম্প্রদায়ের লোকই হোক না কেন! যিশুখ্রিস্টে আত্মসমর্পণ – মুক্তির এই হচ্ছে একমাত্র পথ।" (পৃ. ৩৯১) এই কথা শুনে আর একজন মুসলমান রাজ কর্মচারী এর প্রতিবাদ করে বললেন যে, খ্রিস্টান ধর্ম ইহুদী ধর্ম সব প্রাচীন ধর্মই বাতিল হয়ে গেছে। এখন একমাত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম। এক পর্যায়ে সবাই নিজ নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তখন চীনদেশীয় দার্শনিক সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, অহংকার এবং গর্বই বিতর্ক ও কলহের সৃষ্টি করেছে। তিনি একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে সবাইকে বুঝতে চেষ্টা করেন।

তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন যে, সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না – বরং পৃথিবীই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তার মতে, বিশ্বপ্রভু ঠিক সূর্যের মতো। সব মানুষই নিজস্ব একটা খোদা, ব্যক্তিগত একটা বিশ্ব প্রভু চায়। প্রত্যেক জাতি তাদের উপাসনালয়ে এই সত্যকে বন্দি করে রাখতে চায়। খোদার বিষয়ে মানুষের ধারণা যত উঁচু হবে সাধনার পথে যাওয়া তার পক্ষে তত সহজ হবে। এ কথা শুনে এক সুফী এই চীনা দার্শনিককে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরলেন এবং সবাইকে উদ্দেশ্য করে এক গল্প বললেন।

আল্লার ফেরেশতা জিব্রিল একদিন খোদাকে জিজ্ঞাসা করলেন তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি কে ? আল্লাহ বললেন : "রুম দেশের অমুক নগর প্রান্তে এক দেবালয় আছে, সেই দেবালয়ে তুমি একটি মানুষকে দেখতে পাবে। সেই মানুষটি হচ্ছে এখন পৃথিবীতে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।" (পৃ. ৩৯৭) জিব্রিল সেখানে গিয়ে দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধ মূর্তির সামনে বসে আপন মনে জপ করছে। এ দৃশ্য দেখে জিব্রিল-এর মনে সন্দেহ হলো। তিনি খোদার কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন কি করে একজন পৌত্তলিক আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি হতে পারে ? খোদা তাকে বললেন যে, সেই পৌত্তলিক সত্যিই তার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সামনে তার পাষাণ প্রতিমা থাকলেও মনে প্রাণে সে খোদাকে ডাকছে। প্রতীমা পূজার পথে অগ্রসর হতে হতে সে আসলে খোদার বিরাটত্বের কথা বুঝতে পারবে এবং প্রতিমাকে ফেলে একদিন সে খোদারই দিকে এগিয়ে আসবে। প্রতিমা তার স্বর্গে উঠবার একটা ধাপ মাত্র। দরবেশের এ কাহিনী শুনে সবাই আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলো। দরবেশ একটা গান গাইলেন। তার অর্থ হলো, আল্লাহ দেশ সীমার উর্ধ্বে, খোদার পরিচয় আছে পরিচয়হীন অনন্তে। তিনি আদি, তিনিই অনন্ত ও অসীম।

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙ্গাবাঁশী

ভাঙ্গাবাঁশী গল্পগ্রন্থে কোন প্রকাশকাল নেই। তবে এটি সর্বশেষ গল্পগ্রন্থ হিসেবেই বিবেচিত। এ-গ্রন্থে মোট এগারোটি গল্প থাকলেও আটটি গল্পই *গুল-দাস্তা* গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত ছিল। নতুন তিনটি গল্প হচ্ছে : 'আফ্রিদি তরুণী', 'মোহ-মুক্তি' ও 'মিলন'। সমাজ সচেতন গল্পকার তত্ত্বজিজ্ঞাসার রূপকী আবরণ পরিত্যাগ করে পুনর্বার বাস্তব জীবনঘনিষ্ঠ চরিত্রসৃষ্টির জগতে ফিরে এসেছেন। এখানে তিনি স্পষ্টভাবেই মানুষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। আত্ম-সংকীর্ণতার বিপরীতে সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে তিনি স্পষ্ট উচ্চারিত হয়েছেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি, অপব্যাখ্যা, বিবেচনাহীন পারলৌকিক প্রাধ্যান্যকে পরিত্যাগ করে মানব মহিমার বাণী স্পষ্টভাবেই তুলে ধরেছেন।

আফ্রিদি তরুণী

গল্পের লেখক কয়েকজন বাঙালি যুবকের সাথে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হয়েছিলেন। সেখানে তাদের নিয়ে একটা বাঙালি রেজিমেন্ট গঠিত হয়েছিল। এঁরা সবাই ছিলেন স্বদেশ প্রেমিক। লেখকের শরীর অসুস্থ হওয়ায়, পেশওয়ারের কাছে একটা ছাউনিতে তাকে রাখা হয়েছিল। ছাউনির কাছে ছিল হায়দার খাঁ নামে এক আফ্রিদির ফলের দোকান এবং এর সাথে লেখকের বেশ আলাপ জমে যায়। একদিন হায়দার খাঁ লেখককে তার গ্রামের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে দাওয়াত করে। লেখক আনন্দের সাথে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। পরদিন বিকালে লেখক হায়দার খাঁর সাথে তার গ্রামে বাড়ি যান। ছাউনি থেকে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে এক পাহাড়ের পাদদেশে তাদের গ্রাম। বাড়িগুলো পাহাড়ের গা কেটে কেটে তৈরি করা। প্রতিটি বাড়িতে একটি মাত্র কক্ষ এবং সেখানেই থাকা-খাওয়া ও রান্না করার ব্যবস্থা। ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর জন্যে বাড়ির কিছুটা অংশ বেড়া দিয়ে পৃথক করা হয়েছে। হায়দার খাঁর বাড়িতে তার বাবা, মা, স্ত্রী সবাই লেখককে বরণ করলেন। হাত মুখ ধোয়ার পর পান করার জন্যে তাঁকে একটা পাত্রে দুই-তিন সের দুধ দেয়া হলো। লেখক কিছুটা পান করে রেখে দিলেন। হায়দার খাঁর বৃদ্ধ পিতা শের খাঁ তাকে রসিকতা করে বললেন যে, হিন্দুস্তানের লোক বড় লাজুক আর খেতে জানে না। শের খাঁ বাড়ির ভিতরের দিকে মুখ করে তার এক ষোড়শী নাতনী জুলেখাকে ডাকলো। সে দেখতে অপরূপ সুন্দরী গ্রিক রণদেবী ডায়ানার মতো। শের খাঁ জুলেখাকে বললো : "হিন্দুস্তানের লোক, খেতে পারে না। যাও, তুমি লোটাটি ভরে নিয়ে এসো। (*এস. ওয়াজেদ আলী রচনাবলী* ২, পৃ. ৪০৫) জুলেখা লোটাটি ভরে আনার পর বৃদ্ধ শের খাঁ এক চুমুকেই পুরো তিনসের দুধ পান করে ফেললো। তারপর লেখককে দেয়া হলো রাতের খাবার। প্রকাণ্ড এক ভেড়াকে গোটা রোস্ট করা হয়েছে। বড় একটা তামার থালায় তা রাখা হয়েছে। আর সেই থালার উপর আছে ডজন চারেক মোটা খামিরা রুটি। লেখক সেখান থেকে দুটো রুটি এবং পোয়া দেড়েক মাংস খেয়ে হাত তুলে নিলেন। লেখকের আহারের পরিমাণ দেখে বৃদ্ধ শের খাঁ তার দু'পাটি ধবধবে সাদা দাঁত বের করে হো হো করে হাসতে লাগলো এবং হাসতে হাসতে তারা পিতাপুত্র মিলে প্রায় আট সের মাংস এবং ত্রিশটি রুটি সাবার করলো। খাবার শেষ হলে মহিলারাও এসে আলাপে যোগ দিলো।

Dhaka University Institutional Repository

হঠাৎ লেখক ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখেন, রাত এগারোটা বেজে গেছে। অথচ রাত ন'টার মধ্যে তাকে ছাউনিতে ফেরার কথা। তা না হলে কোর্ট মার্শালের সম্মুখীন হতে হবে। অবশেষে লেখককে রাতে সেখানে থাকার জন্যে তারা অনুরোধ করতে পারলো না। রাতে বৃটিশ বাহিনীর একজন সৈন্যকে একলা রাস্তায় পেলে আফ্রিদিরা তাকে মেরে ফেলতে পারে এই আশংকায় অবশেষে জুলেখা একটা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে লেখককে উদ্দেশ্য করে বললো : "চলুন চাচাজি, আমি আপনাকে ছাউনিতে পৌঁছে দিব।" (পৃ. ৪০৭) এ কথা শুনে শের খাঁ উৎসাহের সঙ্গে বললো : "তাহলে আপনার ভাবনা নেই, হাবিলদার সাহেব। জুলেখা একাই দশজন পুরুষের জন্য যথেষ্ট।" (পৃ. ৪০৭) পাঁচ মাইল দুর্গম পথ হেঁটে অবশেষে রাত একটার সময় জুলেখাকে সাথে নিয়ে লেখক ছাউনিতে ফিরে এলেন। সেন্ট্রিকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ছাউনিতে ঢুকে সোজা তার কক্ষে এসে লেখক একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। আর জুলেখা তাঁর বিছানায় গা ছড়িয়ে দিলো। সে রাতে আর জুলেখা ফিরে যেতে পারলো না। লেখক একটা কম্বল নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। সকালে লেখককে অভিবাদন করে জুলেখা তার গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। সেদিন লেখক সিংহিনীর মতো নির্ভীক প্রাণে জুলেখাকে পথ চলতে দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন। আফ্রিদি তরুণী জুলেখার নির্ভীকতার যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তার কোন তুলনা নেই।

মোহমুক্তি

হোসেন আলি জমিদারের পুত্র। তার পিতা মৃত্যুবরণ করলে সে জমিদারির মালিক হয়। কেউ তার শরিকদার ছিল না। ওকালতি পাশ করলেও কখনো প্র্যাকটিস করতো না। বন্ধু-বান্ধবের সাথে গল্প-গুজব করে আর একটু-আধটু রাজনীতি চর্চা করেই দিন কাটাতো। একদিন হঠাৎ করে তার স্ত্রী লতিফা বেগম মারা যায়। স্ত্রীর অকাল মৃত্যুর পর সংযমের পথে তাকে আটকে রাখবার আর কেউ রইলো না। হোসেন আলি একদিন তরুণী বিধবা সারা কোহেন-এর প্রেমে পড়ে। দিনে-রাতে শয়নে স্বপনে সারার কমনীয় মূর্তিই হলো তার কামনার বস্তু। বিধবা সারার সখের কোন শেষ ছিল না। হোসেন আলি তার সব সখ মেটাবার জন্যে সদা সচেষ্ট থাকতো। সারার মুখে হাসি ফোটানোই ছিল তার জীবনের সাধনা।

রোজা শেষ হবার আর মাত্র একদিন বাকি আছে। হোসেন আলি সেদিন সারাকে বলেছিল যে, যে তার এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাবে। সে আর আসতে পারবে না। এ কথা শুনে সারা বলেছিল, হোসেন আলি তার বিষয়ে এতটুকুও ভাবে না। হোসেন আলি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, সে বড় রকমের একটা কিছু দেখিয়ে তাকে অবাক করে দেবে। এ কথার উত্তরে সোহাগ জড়িত কণ্ঠে সারা তাকে বলেছিল : "পুরুষের কথায় বিশ্বাস করাও যা, আর বাতাসে কেল্লা বাঁধাও তা।" (পৃ. ৪০৯) সারার মুখে এ কথা শুনে গভীর আত্মপ্রত্যয়ের সাথে হোসেন আলি বলেছিল : "ভাল, চাক্ষুস প্রমাণ দেখিয়ে দেবো। তখন তো আমাকে বিশ্বাস না করে থাকতে পারবে না।" (পৃ. ৪১০) সেদিন আত্মীয়ের নিমন্ত্রন আর হোসেন আলি রক্ষা করতে পারলো না। এক জুয়েলারের দোকান থেকে দু'শ পঞ্চাশ টাকা দামের নতুন ধরনের এক জোড়া বালা কিনে ছুটলো সারার বাড়ির দিকে। প্রাণভরা অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে ধীরে ধীরে এলো ড্রয়িং রুমের দিকে। পাশের কামরা

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনে সে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর সারার কোমল স্বর সে শুনতে পেলো। সারা বলছিল : "ডেভিড আমায় অবিশ্বাস করা তোমার বড় অন্যায়। তুমি ছাড়া আর কাউকে যে ভালবাসি না। সে কথা তোমার বিশেষ করেই জানা উচিত। বোকা লোকটাকে পাওয়া গেছে, দিন কতক মউজ করে নেই। তারপর তুমি তো আছই।"(পৃ. ৪১০) এ সব কথা শুনে হোসেন আলি আর স্থির থাকতে পারলো না। সারার মুখ আর দেখবে না এই প্রতিজ্ঞা করে সে ফিরে এলো নিজের বাসায়। বাসায় এসে সে রাতে আর খেলো না। মনের দুঃখে রুমে ক্রমাগত পায়চারি করলো। তারপর এক সময় হুইস্কির বোতল শেষ করে সোফায় গা এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। পরদিন সন্ধ্যার সময় সবাই আকাশের দিকে চেয়ে আছে ঈদের চাঁদ দেখার জন্যে। কিন্তু হোসেন আলি রোজার কথা, ঈদের চাঁদের কথা, ঈদের কথা সব ভুলে গিয়েছিল। সে তখন উদ্‌ভ্রান্তের মতো গড়ের মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এখানেও তার ভাল লাগলো না। বাসায় ফিরে দেখে রাত সাড়ে আটটা বেজে গেছে। মনের ভার কিছুটা লাঘব করার জন্যে, তার বাসার খুব কাছেই এক ব্যারিস্টার আহমদ সাহেব থাকতেন, সেখানে যাবার জন্যে পথে বেরিয়ে দেখতে পায় তার বাড়ির পাশের এক গরীব মুসলমানের মেয়ে আসগরী ও তার ছোট ভাই আখতারকে। আখতার কাঁদছে আর আসগরী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছে : "কেঁদো না, ছোট্ট ভাইটি আমার, কেঁদো না। আব্বার অসুখ করেছে, তাই এবার তোমার নতুন কাপড় দিতে পারছেন না। বকরিদের সময় নতুন আচকান, নতুন টুপি, নতুন রুমাল নিশ্চয় তুমি পাবে। দুদিন সবুর করে থাকো।" (পৃ. ৪১২) এ কথা শুনে হোসেন আলির মানসিক অবস্থার পরিবর্তন হলো। সে ভাবলো প্রতিবেশীর প্রতি তার একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। মোহে আবদ্ধ হয়ে সে সব কিছু ভুলে গিয়েছে। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে আর পাপ কাজ করবে না। নিজেকে আল্লাহর উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে তৈরি করবে এবং তার ধন-সম্পদ ভাল কাজে, মানুষের মঙ্গলের জন্যে খরচ করবে। এ সব কথা ভাবতে ভাবতে হোসেন আলির চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো আর চোখে জল দেখে আসগরী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো : "নবাব সাহেব, আপনার তবিয়েত খারাপ হয়নি তো ?" (পৃ. ৪১৪) রুমালে চোখ মুছে হোসেন আলি বললো : "না আসগরী, আমার তবিয়েত এতদিন খারাপ ছিল ; আজ ভাল হয়েছে। কাল ঈদ, আল্লার ফেরেস্তা আমার কাছে এইমাত্র সেই ঈদের পয়গাম (শুভ সংবাদ) নিয়ে এসেছিলেন। তাঁকে দেখেই আনন্দে আমি কাঁদছিলুম। আমি মোটর নিয়ে আসছি, তুমি তোমার মাকে গিয়ে বল, নবাব সাহেব তোমাকে আর আখতারকে গাড়িতে করে 'চাঁদনি' নিয়ে যাবেন। আখতারের ঈদের আচকান, টুপী আর রুমাল কেনার জন্যে।" (পৃ. ৪১৪) এ কথা শুনে আসগরীর মুখে এক স্বর্গীয় হাসি দেখা দিল।

'মোহমুক্তি' গল্পে প্রকাশ পেয়েছে নারীর ছলনা। ছলনাময়ী নারী পুরুষকে মোহে আবদ্ধ করে রাখে। পুরুষেরা তাদের পাশবিক লোভ-লালসার আশায় ছলনাময়ী নারীর ছল-চাতুরী বুঝতে পারে না। মানুষ মোহে আবদ্ধ হয়ে থাকলে অনেক কিছু ভুলে যায়। ভুলে যায় তার দায়িত্বের কথা, ভুলে যায় তার কর্তব্যবোধ। এইভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা ভুলতে ভুলতে একদিন সে পাপের গথে পা দেয়। এই পাপই আবার মানুষকে অন্ধ করে, ব্যভিচারের মোহে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত করে দেয়। পাশবিক লোভ-লালসা মানুষকে আত্মসর্বস্ব করে তোলে। 'মোহমুক্তি' গল্পের নায়ক নওয়াবজাদা হোসেন আলিও বিধবা সারার মোহে আবদ্ধ হয়ে ভুলে যায় তার সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু যেদিন সারার আসল রূপ প্রকাশ পেলো, সেদিন থেকেই তার মোহের ঘোর কাটতে শুরু করলো।

মিলন

সাদেক মিঞা গ্রামের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি। তার ছিলো অনেক ধন সম্পদ। এ ছাড়াও আসানসোলে তার একটা দোকানও ছিল। সে ছিল খুব ধার্মিক। পীর সাহেব কেবলাহ্ তাদের এলাকায় এলে তার কাজ ছিল গ্রামের মাতাল ও বদমায়েসদের বিরুদ্ধে পীর সাহেবের কাছে নালিশ করা। পীর সাহেব উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর যথারীতি শাস্তির ব্যবস্থা করতেন – কারো জন্যে কান মলা, কারো জন্যে নাকে খৎ ইত্যাদি। গ্রাম থেকে যাবার আগে পীর সাহেব সকলকে শরিয়তের নির্দেশ মতো চলবার পরামর্শ দিতেন। পীর সাহেব যাবার পর কয়েক দিন ধরে গ্রামের মাতাল বদমায়েশরাও যথাসময়ে নামাজের জন্যে মসজিদে আসতো। কিন্তু ক'দিন পর আবার যা তা-ই। একদিন বৃদ্ধ কসিমুদ্দিন শেখ মাতাল অবস্থায় গ্রামের রাস্তা দিয়ে গান গাইতে গাইতে যাচ্ছিল। এমন সময় সাদেক মিঞা তাকে দেখে বললো : "আচ্ছা সবুর কর, পীর সাহেব ফিরে আসুন। এবার তোমার ভাল রকম শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।" (পৃ. ৪১৬) কসিমুদ্দিন তখন মাতালের সুরে বললো : "রেখে দাও তোমার পীর সাহেব, আমার যা খুশি আমি করব।" (পৃ. ৪১৬) এ ঘটনার পর একদিন হঠাৎ করে সাদেক মিঞার ঘরে আগুন লাগে। গ্রামের মুসল্লিরা আগুন নেভানোর ব্যবস্থা না করে ধর্মীয় আলোচনা শুরু করলো। সাদেক মিঞা তাদের আলোচনা না শুনে ছুটলো তার ঘরের আগুন নেভানোর জন্যে। সেখানে গিয়ে দেখে বৃদ্ধ মাতাল কসিমুদ্দিন ও পাঁচ ছেলে আগুনের সাথে মোকাবেলা করছে। পাড়ার আরও কয়েকটা কথিত মাতাল বদমায়েস তাদের সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজে যোগ দিয়েছিল। সাদেক মিঞা ঘরে আগুন দেখে আর সহ্য করতে পারলো না। নিজেই ঘরের চালে উঠার জন্যে মইয়ে পা দিতে গেলে এক জোড়া সবল বাহু তাকে মই থেকে নামিয়ে এনে স্নেহ-কোমল কণ্ঠে তাকে সম্বোধন করে বললো : "কোন ভয় নাই। আপনি ঠাণ্ডা হয়ে এক জায়গায় বসে থাকুন ভাই সাহেব। আপনার মেজাজের এখন ঠিক নাই। আপনি ছুটোছুটি করবেন না। আল্লার ফজলে, আমার পাঁচ ছেলে, আর গাঁয়ের এই জোয়ানেরা বেঁচে থাকতে আপনার ঘর কখনও পুড়বে না। এই দেখুন না দু'মিনিটের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি।" (পৃ. ৪১৮) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চোখে সাদেক মিঞা কসিমুদ্দিন ও তার পাঁচ ছেলে এবং গ্রামের অন্যান্য অন্যান্য মাতাল বদমায়েসদের কর্মতৎপরতা দেখে মুগ্ধ হলো। তারপর মুসল্লিদের উদ্দেশ্য করে বললো : "এই মাতাল বদমায়েসদের বাহাদুরী দিতে হয়। এরা না থাকলে আমার যথাসর্বস্ব পুড়ে আজ ছারখার হয়ে যেতো।" (৪১৮) এদিকে কসিমুদ্দিনের ছোট ছেলে আব্দুল ঘড়া ভরা পানি নিয়ে মই বেয়ে উপরে যেতে গিয়ে পা ফস্‌কে পড়ে যায়। সবাই তাকে দেখার জন্যে জড়ো হয়। আগুন নেভানো বাদ দিয়ে যারা আব্দুলকে দেখার জন্যে এসেছিল তাদেরকে উদ্দেশ্য করে রূঢ়কণ্ঠে কসিমুদ্দিন বললো : "যে যার কাজে ফিরে যা। আগুনে ঘর জ্বলছে আর তোরা এসেছিস তামাসা করতে। আবদুলের দেখাশুনা আমি করছি।" (পৃ. ৪১৮) এ কথা শুনে সবাই লজ্জিত হয়ে আবার আগুন নেভাতে লাগলো। এমন সময় মগরবের আজান শুনতে পাওয়া গেলো। নামাজ কাজা হয়ে যাবে এই ভয়ে সব ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা আগুন নেভানো তাদের কর্তব্যের মধ্যে গণ্যই করলো না। সবাই মসজিদে চলে গেলো। আব্দুল ধীরে ধীরে উঠে বসলো। কসিমুদ্দিন সাদেক মিঞাকে বললো :

Dhaka University Institutional Repository

"খোদার হাজার শোকর ভাইজান, আগুন নিভে গেছে।" মুসল্লিরা নামাজ শেষ করে তসবিহ্ জপ করতে করতে আবার ফিরে এলো আগুন দেখার জন্যে। সাদেক মিয়ার চোখের সামনে থেকে জগতের চেহারা একেবারে বদলে গেলো। মুসল্লিদের দল তার কাছে শয়তানের দল বলে মনে হলো। আর মাতাল কসিমুদ্দিনের চেহারা তার চোখের সামনে জ্বলে উঠলো এক স্বর্গীয় আলোকে। মাতাল কসিমুদ্দিনের হাতদুটি সাদেক মিঞা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো : "ভাইজান, আমায় মাফ কর। কি ভুলই আমি এতদিন করেছিলুম। তুমি তো সাধারণ মানুষ নও, তুমি হচ্ছ আল্লার একজন ফেরেস্তা।"(পৃ. ৪২০) মাতাল এবং পরহেজগারের এই অপূর্ব মিলন দৃশ্য দেখে মুসল্লিরা তাদের উপর রাগ করে কোন কথা না সেখান থেকে চলে যায়।

'মিলন' গল্পে এস. ওয়াজেদ আলি ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্য আবিস্কার করেছেন। মানুষের উপকার এবং সমাজের সেবাই হচ্ছে ধর্ম সাধনের একমাত্র পথ। ধর্মকে তিনি কতকগুলো অর্থহীন বিধিনিষেধের তালিকায় পর্যবসিত করতে চাননি। তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্মকে ব্যবসায়ে পরিণত করার মানেই হলো তার মৃত্যু। তাই লেখক সর্বপ্রকার রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। গোঁড়া ধার্মিককে কখনো তিনি প্রকৃত ধার্মিক মনে করেন নি। মানব ধর্ম তার কাছে বড় ধর্ম। এই সত্যই এ গল্পে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন।

এ গল্পে গোঁড়া ধার্মিকের মুখোশ তুলে ধরা হয়েছে। গোঁড়া ধার্মিক যে প্রকৃত ধার্মিক নয়, এ গল্পে তা নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। যারা ধর্মের আচার-আচরণ পালনে ব্যস্ত তাদের অন্তরের গভীরে ধর্মের কোন স্থান নেই। বহিরঙ্গে ধর্মের আচরণকে যারা প্রাধান্য দেয়, তারা অন্তরঙ্গে ধার্মিক হয়ে ওঠে না। একজন প্রকৃত ধার্মিক তার বিবেক বিসর্জন দেয় না। সামাজিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনও ধর্মের অংশ। প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে মাথায় টুপি আর হাতে তসবিহ নিয়ে ধর্মীয় আলোচনার মধ্যে ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় না। বরং এ ধরনের ধার্মিকদের ভণ্ড ও প্রতারক বলেই মনে হয়। সাদেক মিঞার ঘরে আগুন লাগলে পরহেজগার মুসলমানেরা আগুন নেভানোর ব্যবস্থা না করে ধর্মীয় আলোচনা শুরু করলো। জসীমউদ্দিন মোল্লা ছিলেন গ্রামের পাকা মুসল্লি। সাদের মিঞার ঘরে আগুনের দীপ্তি দেখে উপস্থিত মুসল্লিদেরকে সম্বোধন করে বললো : "আজকের এই অগ্নিকাণ্ড থেকে আমাদের সবক্ (শিক্ষা) নেওয়া উচিত। দুনিয়ার মাল-দৌলত নিতান্তই অনিত্য জিনিস। আজ আছে, কাল নেই। এই সকালে আমাদের সাদেক মিঞার ঘরটি কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল। আর এখন দেখুন তার কি দুর্দশা! মগরেবের পর কয়েক ঝুড়ি ছাই-পাঁশ ছাড়া এ ঘরের আর কিছু থাকবে না। দুনিয়ার মালমাত্তার এই দশাই হয়ে থাকে। চন্দ্ রোজা (ক্ষণস্থায়ী) দুনিয়ার খেয়াল ছেড়ে আখেরাতের (পরকালের) চিন্তাতে মশগুল হওয়াই হচ্ছে প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য।"(পৃ. ৪১৭) সাদেক মিঞা পরহেজগার মুসল্লিদের কাছে কোন সহানুভূতি পেলো না। তাদের হাসিমাখা মুখ দেখে তার অন্তর তিক্ত হয়ে উঠলো। সে ছুটে চললো তার আগুন লাগা ঘরের দিকে। সেখানে গিয়ে দেখে বৃদ্ধ মাতাল কসিমুদ্দিন ও তার পাঁচ ছেলে আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা আগুনের সাথে যুদ্ধ করছে। গ্রামের অন্যান্য মাতাল-বদমায়েসদের একাগ্র কর্মতৎপরতা দেখে সাদেক মিঞা মুগ্ধ হলো। এমন সময় মসজিদ থেকে মগরেবের আজান শোনা গেল। পরহেজগার মুসল্লিরা নামাজ পড়ার

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে বিচলিত হয়ে উঠলো। নামাজ কাজা হয়ে যাবে বলে তারা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি মসজিদে ছুটে গেলো। সাদেক মিঞা মসজিদমুখী মুসল্লিদের দিকে তাকিয়ে এক গভীর জীবন সত্য অনুভব করলো আর চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেলো। পৃথিবী তার কাছে নতুন রূপ নিয়ে ধরা দিলো। দৃশ্যমান জগতের চেহারা তার কাছে বদলে গেলো। পরহেজগার মুসল্লির দল তার চোখে শয়তানের দল বলে মনে হলো। আর মাতাল কসিমুদ্দিনের চেহারাটি তার চোখের সামনে জ্বলে উঠলো এক স্বর্গীয় আলোকে। সাদেক মিঞার মনে হলো নূরানী জগত থেকে এক ফেরেস্তা মানুষের মূর্তি ধরে নেমে এসেছে এই মাটির পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ মোচন করতে, আর প্রকৃত এবাদতের মূল্য শিক্ষা দিতে। এ গল্পে প্রকৃত ধার্মিকের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রকৃত এবাদতের মর্ম ও তার অন্তর্নিহিত সত্য আবিষ্কার করা হয়েছে। মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব পালন করা, মানুষের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং সমাজ ও মানুষের উপকারে লাগাই প্রকৃত এবাদত। প্রকৃত ধার্মিক ও এবাদতের মর্মই একটা ছোট্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক এখানে তুলে ধরেছেন।

এস. ওয়াজেদ আলির ছোটগল্প শিল্প-সৌকর্যের বিচারেও তাৎপর্যবহ। বিশ শতকের বাঙালি মুসলিম মানস প্রধানত ব্যস্ত থেকেছে সমাজ-চিন্তায়। সমাজের পশ্চাৎপদতা প্রাগ্রসর সৃষ্টিশীল মানুষকে উৎকণ্ঠিত, শঙ্কিত করেছে এবং তাঁরা সংস্কারকর্মী হিসেবেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকতে বাধ্য হয়েছেন। এস. ওয়াজেদ আলিও সামাজিক প্রয়োজনেই সাহিত্যকর্মে ব্রতী হয়েছেন। ফলে স্বভাবতই বিষয়প্রাধান্য তাঁর গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবু প্রয়োজনের দাবি শিল্পকে গতিশীল ও জীবন্ত রাখে এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভা এর ভেতরেই নবতর ব্যঞ্জনা ও আত্ম-উন্মোচন ঘটান।

প্রথম পর্যায়ে এস. ওয়াজেদ আলি বাস্তবধর্মী ঘটনা ও চরিত্র রূপায়ণে নিবিষ্ট থেকেছেন। সমাজজীবন, বিশেষত মুসলিম জীবন উপকরণ হিসেবে গল্পে উঠে এসেছে। এর মধ্যে কল্পনা ও বাস্তবের মিশ্রণও ঘটেছে। লেখক উপকরণ সংগ্রহে ফিরে গেছেন অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যে। এর ফলে মোহময় এক কল্পনার জগৎ আমাদের সামনে খুলে গেছে। তিনি রূপকথার বিশেষ ভঙ্গিটি ধারণ ও আত্মস্থ করেছেন। সেখানে পশুপাখিও মানুষের মতো কথা বলে, জ্ঞানী হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য উপস্থাপন করে। এই ঐতিহ্যের ব্যবহার এক দিকে যেমন মুসলিম সমাজকে উদ্দীপ্ত করার প্রয়োজনে ; অন্যদিকে তেমনি বাঙালির ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবিত হয় আধুনিক অবয়বে। দ্বিতীয় পর্যায়ে গল্পকার রূপকী ব্যঞ্জনায় শিল্পনিপুণ অবগুণ্ঠন তৈরি করে নেন। ছোট ছোট রূপক কথা, তাৎপর্যপূর্ণ নীতিকথা চরিত্রের ইঙ্গিতময় উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। এখানেও সচেতন সমাজ-মন লেখককে তাড়িত করেছে সত্য, তবু শিল্পীর নম্রতা এতে খুঁজে পাওয়া যায়। অনেক সময় চরিত্র ও ঘটনাবিহীন অনুভূতির উপস্থাপন গল্পকে কবিতার সমধর্মী করে তোলে। কবিতায় যেমন বোধের গভীরতায় পৌঁছাতে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাবহুল শব্দ ব্যবহার করা হয়, এস. ওয়াজেদ আলিও তেমন নিপুণতায় অব্যর্থ শব্দ প্রয়োগে তৎপর এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি সফল। তৃতীয় পর্যায়ে এস. ওয়াজেদ আলির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা গল্পকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রগুলো গল্পকারেরই বোধের প্রতিনিধি হিসেবে তৎপর থেকেছে। এখানে গল্পের শিল্প সার্থকতা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও যুক্তি পরম্পরা, নবতর

Dhaka University Institutional Repository

তীক্ষ্ণ মন্তব্য, এবং সর্বোপরি লেখকের স্পষ্ট তাত্ত্বিক জগতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাঠক জীবনের প্রতি আস্থা ফিরে পান। ফলে জীবনভাষ্য হিসেবেও গল্পগুলোর সার্থকতা বিদ্যমান।

বাঙালি মুসলমানের বাংলা ভাষা চর্চার প্রতি অনীহা বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্তও ক্রমাবশেষ সক্রিয় থেকেছে। ফলে ভাষার অন্তর্জগত অনুধাবন, শব্দের উপর দখল ও তার বহুমাত্রিক ব্যবহারে ত্রুটি দেখা দিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে এস. ওয়াজেদ আলি অন্যতম ব্যতিক্রম। সর্বাধুনিক চলিত গদ্যে তিনি তাঁর প্রবন্ধ, গল্প ও অন্যান্য রচনাগুলো লিখেছেন। কোথাও আঞ্চলিকতায় বাধাগ্রস্ত হতে হয় না, মান বাংলা গদ্যের বিচ্যুতি কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। তিনি তৎসম শব্দবহুল গদ্যে আকৃষ্ট হলেও বিষয়ানুযায়ী আরবি-ফারসি শব্দও প্রচুর ব্যবহার করেছেন। চরিত্র ও ঘটনার যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই কেবল ছোটগল্প শিল্প-সার্থকতা লাভ করে না। আধুনিক জীবনবোধের উন্মোচনে বিচিত্র সাহিত্য আন্দোলনের সারমর্মকে আত্মস্থ করতে হয়। এস. ওয়াজেদ আলি তাঁর গল্পে চিত্র, চিত্রকল্প, পরাবাস্তববাদী ব্যঞ্জনা আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। মূলত বিষয় সচেতনতা প্রাধান্য পেলেও গল্পের রূপ-প্রসাধনেও এস. ওয়াজেদ আলি কম সচেতন ছিলেন না এবং এই সমন্বিত সচেতনতাই তাঁকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধকারের সাথে সাথে একজন গল্পকার হিসেবেও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

তথ্যনির্দেশ

১. এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী, প্রাগুক্ত, পৃ. [৮]

২. সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বাগত*, পৃ.

৩. গ্রন্থের "পরিচয়-অংশ" দ্রষ্টব্য, উদ্ধৃত, এস. ওয়াজেদ আলী রচনাবলী ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৩

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৪

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এস. ওয়াজেদ আলির ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী

ঐতিহাসিক উপন্যাস

এস. ওয়াজেদ আলির ইতিহাস জ্ঞান ও মননশীলতা ছিল বিস্ময়কর। জীবনঘনিষ্ঠ এ-শিল্পীর ঐতিহাসিক উপন্যাসের যথার্থ মূল্যায়নের জন্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূচনা ও তাঁর সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনা করা প্রয়োজন। ঐতিহাসিক উপন্যাসের পটভূমি, কিছু চরিত্র ও ঘটনা ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা হয়। ইতিহাসের ঘটনা বা চরিত্রের সাহিত্যিক তথা কল্পনাসমৃদ্ধ সৃজনশীল ব্যবহারের প্রশ্নে সর্বদাই বিতর্কের একটা অবকাশ থাকে। অতীতের প্রতি ঔপন্যাসিকের শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও প্রেম-বিমুগ্ধ চিত্তই তাঁর উপন্যাসকে মাধুর্য দান করে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হচ্ছে এক ধরনের 'কল্পিত গল্পকথা'। এখানে কল্পনার সাহায্যে ইতিহাসকে পুনর্নির্মান করা হয়। এখানে ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক উভয় প্রকার চরিত্রেরই সমাবেশ থাকতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাস যদিও কল্পনার সাহায্যে লিখিত তবু ভাল ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক তার লেখনীর মধ্যে সেই সময়ের সাদৃশ্য আনার চেষ্টা করেন। বৃটেনে এ ধরনের উপন্যাস লিখেছেন Mme de La Fayette। তাঁর *Princesse de Cleves* গ্রন্থটি ১৬৭৮ সনে প্রকাশিত হয়। গথিক (Gothic) কথাবস্তু থেকে এ-উপন্যাসের সূচনা। মধ্যযুগ থেকে বেশির ভাগ গথিক উপন্যাসের সূচনা। Sir Walter Scott-ই ইংরেজি সাহিত্যের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের পুরোধা। ১৮১৪ সনে তার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস *waverley* প্রকাশিত হয়। তাঁর সৃজনশীল অবদানের জন্যে এই শ্রেণীর উপন্যাস উনিশ শতকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার আদর্শ ইংরেজি সাহিত্য থেকে এসেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য হলো একটি বিশেষ অতীতযুগের বৈচিত্র্যময় জীবনের চিত্র উপস্থাপন। কিন্তু কোন কোন সমালোচক মনে করেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের মূল কাহিনী হবে ঐতিহাসিক কোন ঘটনা এবং কোন কারণেই সেই ঘটনার পরিণতি বা ফলাফলের কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হবে ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এ উপন্যাসে কাল্পনিক ঘটনা বা চরিত্র সৃষ্টির অবকাশ থাকলেও তা ঐতিহাসিক পরিবেশ, পরিস্থিতি বা যুগসত্যকে জীবন্ত করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করে। "ঔপন্যাসিক কোন ইতিহাসের নিষ্প্রাণ তথ্য পরিবেশন করবেন না, সেই তথ্যকে আশ্রয় করে তিনি জীবনরস সৃষ্টি করবেন, আপন কল্পনা প্রতিভার সাহায্যে ইতিহাসের তথ্যের শূন্য স্থান পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ঘটনা, চরিত্রে এবং যুগ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা দান করবেন। .... এই উপন্যাসকে ঐতিহাসিক রস নিষ্পন্ন করতে হবে। যদি কোন উপন্যাস পাঠ করে পাঠকচিত্তে এই রসানুভব জন্মায় তবে সে উপন্যাসকে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে মেনে নিতে কোন বাধা থাকবে না।"[১]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের শুরুর দিকে কেদারনাথ চক্রবর্তীর *চন্দ্রকেতু*, হেমচন্দ্রের *মিলন কামনা* ও ললিত মোহন ঘোষের *অচলাবাসিনী* উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এগুলি কোনটিও সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস হয় নি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের *সফল স্বপ্ন, অঙ্গুরীয় বিনিময়* সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস না হয়ে ঐতিহাসিক রোমান্সে পরিণত হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্তের (১৮৪৮-১৯০৯) *মাধবী কঙ্কন* (১৮৭৭), *জীবন প্রভাত* (১৮৭৮), *জীবন সন্ধ্যা* (১৮৮৯), *রাজপুত* ইত্যাদিও সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা পায় নি। স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫০-১৯৩২) *দীপনির্বাণ* (১৮৭৬) ও *ফুলের মালা* নামে দু'খানি ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু এগুলোও সার্থক উপন্যাস হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *দেবী চৌধুরানী* (১৮৭৫), *আনন্দমঠ* (১৮৮২) প্রভৃতি উপন্যাসগুলোতে ইতিহাসের ভূমিকা থাকলেও এগুলোকে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস বলাই অধিকতর সঙ্গত। তবে তাঁর *রাজসিংহ* (১৮৮২) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের *বৌ ঠাকুরাণীর হাট* (১৮৮৩) এবং *রাজর্ষি* (১৮৮৭) উপন্যাস দু'খানি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে এদের কোন গুরুত্ব নেই। বস্তুত বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রচেষ্টা যত বেশি, ততখানি শিল্প সার্থকতা অর্জন করা বাঙালি ঔপন্যাসিকের পক্ষে সম্ভব হয় নি।[২]

ঐতিহাসিক উপন্যাস নির্ভুল ও কঠোর বাস্তবকে অবিকল গ্রহণ করে রচিত হয় না। এ উপন্যাসে বাস্তবকে হুবহু তুলে ধরা সম্ভব নয় এবং সমগ্র ইতিহাসকে অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা যায় না। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস নয় – সাহিত্য। সাহিত্যের সত্য এবং ঐতিহাসিক উপন্যাসের সত্য এখানে এক নয়। অতীতে যা ঘটে গেছে তার মূল সত্যকে স্থির রেখে ঔপন্যাসিক যখন মানবচরিত্রগুলোর সুখ-দুঃখের জীবনপ্রবাহকে সংলগ্ন করেন তখন তা যথার্থই ঐতিহাসিক উপন্যাস হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রয়োজনে ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে লঙ্ঘন না করে অথবা সত্যের কোন গুরুতর পরিবর্তন না করে ঐতিহাসিক চরিত্রের অনাবিষ্কৃত ও অনুদ্ঘাটিত রহস্য ও সৌন্দর্য শিল্পমণ্ডিত করে তুলতে পারেন। কোন মহৎ ব্যক্তি ও ঘটনা সম্বন্ধে দেশে বিচিত্র জনশ্রুতি প্রচলিত থাকে। ইতিহাসের ঘটনাকে যারা পরিচালনা করেন তারা কেউ সাধারণ মানুষ নয়। কোন জাতি বা কোন দেশ একজন মহৎ মানুষের নেতৃত্বের গুণে প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। সেই প্রবল প্রতাপশালী মানুষটিই হয়ে উঠে ইতিহাসের নায়ক। এই মানুষটিকে ঘিরে বিচিত্র জনশ্রুতি ও প্রচারণা গড়ে উঠে। অনেক দিন পর এই মহৎ মানুষের জীবনাচরণ নিয়েই রচিত হয় ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসও থাকে আবার উপন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যও থাকে। বিশুদ্ধ ইতিহাস পেতেই হবে এমন কোন অঙ্গীকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাছে প্রত্যাশা করা সঙ্গত নয়। উপন্যাসের ঘটনা, চরিত্রের প্রবাহ এবং উপন্যাসের সৌন্দর্য বিকাশের জন্যে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক ভাব সত্যকে গ্রহণ করেন এবং ইতিহাসের সম্ভাব্য সত্যকেও আবিষ্কার করার চেষ্টা করেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঘটনার পরিবর্ধন, পরিবর্জন করে মূল সত্যকে অধিক উজ্জ্বল করতে ঔপন্যাসিক নিজ কল্পনা সত্যকেও সংযোজন করেন ইতিহাসের সঙ্গে।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তব জীবনের শূন্যতা পূর্ণ করে আমাদেরকে বিচিত্র রসের আস্বাদ দেয়। এস. ওয়াজেদ আলি এই রস আমাদের প্রচুর পরিমাণে দিয়েছেন। তাঁর *গ্রানাডার শেষ বীর* (১৯৪০) ঐতিহাসিক উপন্যাস। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের একটা প্রধান আকর্ষণ এই যে, এ উপন্যাস আমাদেরকে নীরস জীবন থেকে অতীতের এক বীরত্বপূর্ণ গৌরবমণ্ডিত যুগে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা একটি মুক্ত ও বিশাল জীবনের আস্বাদ পাই, যেখানে জীবন দু'টি পরস্পর বিরোধী মহান আদর্শের দ্বন্দ্বক্ষেত্র। এখানে শুধু বেঁচে থাকবারই প্রবল চেষ্টায় মানুষের জীবনীশক্তি ব্যয়িত হয় না। তাঁর এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমরা বিপদসঙ্কুল গৌরবময় বীরত্ব কাহিনীপূর্ণ অতীত যুগে ফিরে যাই। এখানে বিরোধপূর্ণ কলহের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা ইতিহাসের বিশাল ঘটনার অন্তরালে মানুষের সংকীর্ণ সামাজিক জীবনের বাস্তব ছবি বলে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে। এখানে ঐতিহাসিক ঘটনার এমন একটা বাস্তব তথ্য পরিপূর্ণ জীবন্ত চিত্র দেয়া হয়েছে যে, আমরা একটা গুরুতর রাজনৈতিক কলহ হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।

গ্রানাডার শেষ বীর উপন্যাসের নায়ক একজন ইতিহাসখ্যাত ব্যক্তি এবং তার ভাগ্য বিপর্যয়ই এ উপন্যাসের আখ্যানবস্তু। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব যে নায়ক হবে এমন কোন কথা নেই। ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে গ্রানাডার খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর সংঘঠিত যুদ্ধের পটভূমিতে *গ্রানাডার শেষ বীর* রচিত। খ্রিস্টান বাহিনীর নেতৃত্ব দেন রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইজাবেলা এবং মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন আবু আবদুল্লা। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয় এবং কঠিন কিছু শর্ত স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মুসলিম বাহিনীর প্রধান আবু আবদুল্লার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে স্পেনে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে।

এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের পটভূমি মুসলিম শাসক ও খ্রিস্টান রাজার মধ্যে সংঘঠিত যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ঐতিহাসিক সত্যতা কতটুকু তা বিশ্লেষণের জন্যে ইতিহাসের একটু আলোচনা করা প্রয়োজন। 'বনু নাসের' বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহম্মদ ইবন ইউসুফ ইবন নাসের। তিনি ইবনুল আহমার নামে সমধিক পরিচিত। তিনি খ্রিস্টানদের সহযোগিতায় গ্রানাডার আশেপাশে একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং সেভিল-এর লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করেন। এই বংশের লোকেরা বহু বছর ধরে খ্রিস্টান শক্তির সাথে যুদ্ধ করে স্পেনে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। তিনি এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা ক্যাস্টিল-এর রাজার অধীনতা স্বীকার করে তাকে করদান করতেন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি স্পেনের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন এবং পরবর্তিকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির ফলে গ্রানাডা স্পেনের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হয়। ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যাস্টিল' ও 'এ্যারাগন' রাজ্য দুটির একত্র সমাবেশ ঘটে এবং ঐ বছরই এ্যারাগনের রাজা ফার্ডিন্যান্ডের সাথে ক্যাস্টিলের রানী ইজাবেলার বিয়ে হয়। এভাবে এ রাজ্য দু'টির স্থায়ী মিলন ঘটায় স্পেনে মুসলিম শক্তির শেষ পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। উনিশতম সুলতান আবুল হাসানের অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে গ্রানাডার পতন ত্বরান্বিত হয়। তিনি ক্যাস্টিলের রাজ সরকারের দেয় রাজস্ব আদায় করতে অস্বীকার করে খ্রিস্টান রাজ্য আক্রমণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

আবুল হাসান কিছুদিন গ্রানাডার সিংহাসনে বসেন এবং পরে তাঁর ভাই মুহম্মদ জাগালকে সিংহাসন ছেড়ে দেন। ফার্ডিন্যান্ড ও ইজাবেলা বন্দি বোয়ারদিল-কে অর্থ, সৈন্য ও অস্ত্র সাহায্য করে তাঁর পিতৃব্যের বিরুদ্ধে আক্রমণে উৎসাহ দেন এবং বোয়ার দিল গ্রানাডা অধিকার করেন। তারা বোয়ারদিলকে 'গ্রানাডা' ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করেন। কিন্তু বোয়ারদিল রাজি না হওয়ায় ১৪৯১ খ্রিস্টাব্দে ফার্ডিন্যান্ড দশ হাজার অশ্বারোহীসহ গ্রানাডা আক্রমণ করেন। অবশেষে মুসলমানেরা নিম্নলিখিত শর্তে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি আত্মসমর্পণ করেন :

১. আবু আবদুল্লা, তাঁর কর্মচারী ও প্রজাগণ ফার্ডিন্যান্ড ও ইজাবেলার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করবেন ;
২. আবু আবদুল্লা 'আর বুশরা'য় একটি জায়গীর পাবেন ;
৩. মুসলমানগণ জানমালের নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করবেন ;
৪. তাঁরা আপন আপন আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ ও ভাষা রক্ষা করে চলবেন ;
৫. খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে কোন বিবাদ হলে মিশ্র আদালতে তার মীমাংসা হবে ;
৬. মুসলমানগণ মুসলমান রাজা বাদশাদেরকে যে রাজস্ব দিতো তা-ই তাদের উপর ধার্য হবে ;
৭. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁরা অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে স্পেন ত্যাগ করে চলে যেতে পারবেন। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেলে এই সম্পত্তির এক-দশমাংশ রাজ সরকারে জমা দিতে হবে ;
৮. নও-মুসলিমগণকে তাদের পূর্বধর্মে ধর্মান্তরিত করা হবে না, কিন্তু মুসলমানগণ খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তাদেরকে চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হবে এবং পরে একজন খ্রিস্টান ও একজন মুসলমান বিচারকের সম্মুখে তাকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে হবে।

কিন্তু সাত বছর পর এই সকল শর্ত অগ্রাহ্য করে ফার্ডিন্যান্ড মুসলিম নির্যাতন নীতি আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে স্পেনের সব মুসলমানকে জোর করে বের করে দেয়া হয়। এই সব মুসলমান প্রথমে আফ্রিকায় ও পরে অন্যান্য দেশে চলে যায়। গ্রানাডার পতন থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় ত্রিশ লাখ মুসলমান স্পেন থেকে নির্বাসিত হয় কিংবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

এক যুগের ইতিহাসের কাছ থেকে পরবর্তী যুগ নানা জ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করে। এই পাঠ গ্রহণ সার্থক হয় না ইতিহাস অখণ্ড সত্য-নির্ভর না হলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এক একটি জাতি যুগের সীমানা অতিক্রম করে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখবার জন্যে ইতিহাসকে পছন্দমতো নির্মাণ করে। আবার কখনো তাদের স্বার্থানুযায়ী ইতিহাস নির্মিত হওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ফলে অসংখ্য অসত্যের স্তূপে সত্যের হয় সমাধি। নতুন নতুন কণ্ঠে অসত্য নতুন সুরে ঝংকৃত হয়। জমে উঠে বিভ্রান্তির পাহাড়। গ্রানাডায় মুসলিম বাহিনীর পরাজয় সেই কলংককে আরো মর্মান্তিক ও দীর্ঘায়িত করেছে। *গ্রানাডার শেষ বীর* এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যই প্রতিফলিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। উল্লেখ্য যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস নিছক ইতিহাস নয় – ইতিহাস এবং উপন্যাস। ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনার অবকাশ আছে, অবশ্য ইতিহাসের মূল সত্যকে বিকৃত করার অধিকার ঔপন্যাসিকের নেই। ইতিহাসকে প্রায় অবিকৃত রেখেই লেখক কল্পনার আশ্রয় নেন – ঔপন্যাসিকের ভাবনা ও নান্দনিক অনুষঙ্গ সংযুক্ত করেন। দক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

ঔপন্যাসিকের হাতে অনেক সময় এ কর্মটি ইতিহাসকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে এবং একটা অতিরিক্ত সত্য পাঠক হৃদয়ে অনুরণিত হয়। সেই সৃষ্টি মৌলিকত্বের মর্যাদা পায়।

এস. ওয়াজেদ আলির *গ্রানাডার শেষ বীর* উপন্যাসের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক ঐতিহাসিক উপন্যাসিকের সঙ্গে এস. ওয়াজেদ আলির স্বাতন্ত্র্যও এখানে। *গ্রানাডার শেষ বীর* এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনী আলোচনা করে এর ঐতিহাসিক সত্যটা নিরূপণ করা যেতে পারে।

এক সময় গ্রানাডা ছিল অপরূপ সৌন্দর্যের নগরী। ধনে-জনে, ফুলে-ফলে, লতায়-পাতায় ঘেরা নগরী ছিল এক সুশোভিত সৌন্দর্যের নগরী। এই মহানগরী এখন অতীতের স্মৃতি বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। রাজ দম্পতি ফার্ডিন্যান্ড ও ইজাবেলার সেনাবাহিনী অল্প সময়ের মধ্যে দুইবার ভেগা প্রান্তর আক্রমণ করে এবং সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়।

এক শীতকালে ফার্ডিন্যান্ড যুদ্ধের জন্য বিরাট আয়োজন করলেন। এ যুদ্ধ গ্রানাডার ভাগ্য নির্ণয় করবে। খ্রিস্টান ধর্মের গৌরব বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ যুদ্ধের অনুষ্ঠান। রাজা ফার্ডিন্যান্ড ঠিক করলেন এ যুদ্ধের খরচ তাঁর শত্রুদেরই বহন করতে হবে। রাজ্যের এহুদিদের উপর তিনি যুদ্ধ কর নির্দিষ্ট করলেন। বিভিন্ন জেলায় এবং সিনাগগের কর্তৃপক্ষের উপর আদেশ জারি হলো। কর সেভিল নগরের রাজকোষে জমা হলো। ১৪৯১ সনের এপ্রিল মাসের ১১ তারিখে গ্রানাডা নগরীকে অবরোধ করা হলো। চল্লিশ হাজার পদাতিক, দশ হাজার অশ্বারোহী সেনা নিয়ে রাজ দম্পতি এই যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। রানী ইজাবেলা, রাজপুত্র জোয়ান ও তিন রাজকন্যা জুয়ানা, মারায়া ও ক্যাথালিনাকে সঙ্গে নিয়ে কাউন্ট ডি টেনাভেলার পার্বত্য দুর্গ আলকালো লা রিয়াল নামক সুরক্ষিত দূর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে তিনি সেনাবাহিনীর খাবার সরবরাহ করবেন এবং প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

এদিকে গ্রানাডার আমীর আবদুল্লা আল-হামরা প্রাসাদে এক মন্ত্রণা সভা ডাকলেন। আমীরকে সবাই আত্ম-সমর্পণের পরামর্শ দিল। কিন্তু পরামর্শের প্রতিবাদ করে এক বীর সেনানী মুসা। সে জানালো যে, দেশের জন্যে, দেশ রক্ষার সংগ্রামে এই শহরের প্রায় ২০ হাজার যুবক গণযুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছে। মুসার কথা শুনে আমীর আবদুল্লা সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন : "যা দরকার আপনারা তা করুন। দেশের এবং জনসাধারণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার আপনাদের হাতেই আমি সমর্পণ করলুম। আপনারাই হচ্ছেন এ রাজ্যের রক্ষক।"[৩] সভায় প্রত্যেকের করণীয় কাজ ঠিক হলো। কে কোন দায়িত্বে থাকবে তা-ও ঠিক হলো।

রাজা ফার্ডিন্যান্ড যুদ্ধ করে যে কোন কৌশলে রাজ্য জয় করার পক্ষপাতী। রাজা ফার্ডিন্যান্ড ভাবলো চারদিক অবরোধ করে নগরের মধ্যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করতে পারলে যুদ্ধ জয় সহজ হবে। তাই বিভিন্ন পথে ঘাটে হানা দিয়ে রসদ সম্ভার লুটপাট করতে লাগলো। এ ঘটনায় মুসা অশ্বারোহীদের নিয়ে ফার্ডিন্যান্ড বাহিনীর ছাউনি পর্যন্ত হানা দিলো। এমনকি ছাউনির ভিতর ঢুকে লুটতরাজ করলো। এসব

Dhaka University Institutional Repository

আকস্মিক আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ফার্ডিন্যান্ড ছাউনির চারদিকে পরিখা খনন করলো। উদ্দেশ্য গ্রানাডাবাসীর মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি করা। ফার্ডিন্যান্ডের সেনা ছাউনির কাছে রানী ইজাবেলার সৈন্য নিবাস তৈরি করা হলো। ছাউনীতে এসে রানী ইজাবেলা সেনানিবাস ও বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে বের হলো।

রানীকে দেখে আরব বীরদের মনে আতংক সৃষ্টি হলো না। মুসা তরুণ যোদ্ধাদের উদ্দেশ্য করে বললো : "আমরা লড়ছি আমাদের থাকবার ঘরটুকুর জন্য ; আমাদের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির জন্য। এও যদি হারাতে হয়, তাহলে মাথা রাখবারও আমাদের স্থান থাকবে না। এস, সবে দেশের জন্যে, বীরের মত আত্ম বিসর্জন করি।"[৪] মুসা যখন বুঝতে পারলো খ্রিস্টান বাহিনী আক্রমণ থেকে বিরত রয়েছে তখন সে তার সৈন্যদের ছোট ছোট দল নিয়ে আক্রমণ করার পরামর্শ দিলো। এর পর দুই বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হতে লাগলো। মুসলমান বাহিনীর এক দুঃসাহসী যোদ্ধা তারেক একদিন রানী ইজাবেলার শিবির আক্রমণ করে একটা বর্শা নিক্ষেপ করে গেলো। বর্শার গায়ে একটা চিঠি বাঁধা ছিল। তাতে লেখা ছিল – "বিশেষ করে রানীর জন্যই এই বর্শা নিক্ষেপ করা হয়েছে।"[৫] এটা দেখে খিস্ট্রান বাহিনীর ফার্নান্ডো নামে দুঃসাহসী যোদ্ধা গভীর রাতে পনের জন যোদ্ধাকে নিয়ে গ্রানাডা শহরের ফটক দখল করলো। পরে ফার্নান্ডো নগরীর সবচেয়ে বড় জামে মসজিদে এসে তা দখল করে মেরির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলো এবং মসজিদের দরজায় আভে-মারায়া ফলক ঝুলিয়ে দিলো। এই কাজ করে সে যথাসময়ে শিবিরে ফিরে এলো।

খ্রিস্টান রাজ শিবির গ্রানাডা থেকে এতদূরে স্থাপন করা হয়েছিল যে, দূর থেকে অস্পষ্ট একটা ছবির মতো দেখা যেতো। এ শহর ভেগার প্রান্তর থেকে গড়ে উঠেছিল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে প্রাসাদ ও মিনারগুলো অসামান্য সৌন্দর্যের সঙ্গে বিরাজ করছিল। রানী ইজাবেলা চায় কাছ থেকে গ্রানাডার সৌন্দর্য দেখতে। এ সৌন্দর্য দেখানোর দায়িত্ব নেয় মারকুইস অব কেডিজ। ফার্নান্ডোর ঘটনার পরদিন খ্রিস্টান বাহিনী এক জাঁকজমকপূর্ণ মিছিল বের করে। রাজা, রানী, রাজকুমার ও রাজকুমারীরা এ মিছিলে অংশগ্রহণ করে।

রাজা-রানী সুরক্ষিত হয়ে গ্রানাডার আল-হামরা প্রাসাদ দেখলো এবং পুলকিত মনে তারা শুভদিনের অপেক্ষায় থাকলো। মুসলিম বাহিনী যখন দেখলো খ্রিস্টান বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে তখন তারা আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে গেলো। কিন্তু খ্রিস্টানদের রানী ইজাবেলা আক্রমণ করতে নিষেধ করলো। এত মানুষের প্রাণ যাবে তা কোমলহৃদয়া রাণী সহ্য করতে পারলো না। রাজা ফার্ডিনান্ডের কঠোর আদেশ – দ্বন্দ্বযুদ্ধে কেউ যেন অংশ না নেয়। মুসলিম বাহিনীর দুঃসাহসিক যোদ্ধা তারেক আভে-মারায়া ঘোড়ার লেজের সাথে বেঁধে নিয়ে খ্রিস্টান শিবিরের সামনে ঘোড়ায় চড়ে অপূর্ব ভঙ্গিমায় নাচতে লাগলো। তারেক-এর এই ব্যবহার দেখে খ্রিস্টান বাহিনীর দুঃসাহসিক যোদ্ধা ফার্নান্ডোর এক তরুণ শিষ্য গ্রাকিলামো মেরীর অপমান সহ্য করতে না পেরে রাজার কাছে এসে এ অবমাননার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলো। ধর্মের গৌরব রক্ষার জন্য রাজা এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারলো না। গ্রাকিলামো রণসাজে সজ্জিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে এসে এক আরবকে

Dhaka University Institutional Repository

আক্রমণ করলো। এ যুদ্ধে উভয়েই নৈপুণ্য দেখায় এবং অবশেষে আরব যোদ্ধা তারেক-এর বুকে তরবারি ঢুকিয়ে হত্যা করে। এই যুদ্ধে সামরিক নীতি পরিপূর্ণ মাত্রায় মেনে নেয়া হয়েছিল। এরপর মুসা খ্রিস্টান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করলো। উভয় বাহিনী প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ করলো। এই যুদ্ধে দুই হাজারের বেশি আরব মারা যায়। খ্রিস্টান বাহিনীর সাথে তারা টিকতে না পেরে কেউ কেউ গ্রানাডা নগরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলো। খ্রিস্টানেরা এই যুদ্ধকে 'রানীর যুদ্ধ' নামে অভিহিত করে থাকে। এই জয়ের স্মৃতি রক্ষার জন্য রানী পরবর্তীকালে সেখানে মঠ স্থাপন করে এবং সেই মঠ 'সেন্ট ফ্রান্সিসকো' নামে অভিহিত করা হয়।

একদিন রাতে খ্রিস্টান শিবিরে আগুনে কিছু তাঁবু পুড়ে গেলে মুসলমান বাহিনী মনে করলো যে, এটা তাদের কোন কৌশল। পরে জানা গেল যে রানী প্রার্থনায় বসবার আগে তাঁবুর কাছে প্রদীপ রেখেছিল। সেই প্রদীপ থেকে হঠাৎ করে আগুন লেগে যায়। এরপর খ্রিস্টান বাহিনী যুদ্ধের বাজনা বাজিয়ে যুদ্ধ শুরু করলো। এরা শহরের খুব কাছে এসে শহরতলীর বাগান ও সব কিছু নষ্ট করে দিলো। এমন সময় আবু আবদুল্লা যুদ্ধের পোষাক পরে সেনা বাহিনী নিয়ে এগিয়ে গেলো। প্রকৃতপক্ষে সেদিন যুদ্ধ হয় নি, হয়েছিল কয়েকটা খণ্ড যুদ্ধ। এক ইঞ্চি জমির জন্য মুসলমানেরা প্রাণপাত করে যুদ্ধ করেছিল। এদিকে খ্রিস্টানেরা নগরের অনেকগুলো বুরুজ (tower) দখল করে নেয়। যুদ্ধের খারাপ অবস্থা দেখে আবু আবদুল্লা পালিয়ে গিয়ে নগরের মধ্যে আশ্রয় নেয়। মুসা প্রাণপণে যুদ্ধ করে অবশেষে মারা যায়।

একদিন রাজা ও রাণী এক আদেশ জারী করে, সেনা নিবাসের জায়গায় এক স্থায়ী নগর তৈরি করার। মুসলিম বাহিনী আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে। পরবর্তীকালে এই নতুন শহর একটা নগরে পরিণত হলো। চারদিক থেকে সওদাগরেরা এখানে আসতে থাকলো। এখানে বিদেশের পণ্যদ্রব্য বেচাকেনা শুরু হলো। কিন্তু গ্রানাডা নগরী অবরোধের নগরী হয়ে থাকলো।

গ্রানাডা শহরে দুর্ভিক্ষ হবে এবং মানুষ না খেয়ে মারা যাবে এই কথা ভেবে সবার পরামর্শ মতো আবু আবদুল্লা অবশেষে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। গ্রানাডার প্রবীণ দূত আবুল কাসেম আব্দুল মালেক আত্মসমর্পণ করার খবর নিয়ে রাজা-রাণীর সাথে দেখা করে। তারা যে সব শর্ত দেয় সেই সব শর্ত মেনে নিয়ে অবশেষে সুলতান আবু আবদুল্লা আত্মসমর্পণ করে।

এই আত্মসমর্পণপত্র ১৪৯১ সালের ২৫ নভেম্বর তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের পর দীর্ঘ কয়েক বছরের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আবু আবদুল্লা ও তার পরিবার-পরিজন আলহামরা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গ্রানাডা ত্যাগ করলো। রাজা-রানী প্রাসাদের দখল বুঝে নিলো। আবু আবদুল্লা প্রাসাদের চাবি রাজা ফার্ডিন্যান্ডের হাত সমর্পণ করলো। রাজাকে সম্বোধন করে আবদুল্লা বললো : "এই চাবি হচ্ছে স্পেনে আরব সাম্রাজ্যের শেষ নিদর্শন। রাজন, আমাদের রাজ্য, আমাদের জন-সম্পদ, আমাদের প্রাণ পর্যন্ত আজ আপনার করায়ত্ত। এসব আল্লাহর ইচ্ছা। আপনি অঙ্গীকার করেছেন আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। আমরা আপনার

Dhaka University Institutional Repository

কাছে সেই দয়াই প্রত্যাশা করি। আপনি আমাদের সর্বস্ব গ্রহণ করুন।"[৬] খ্রিস্টান রাজার বিজয় উসব দেখে সে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে তার মা ভর্ৎসনার কণ্ঠে বললো : "যে রাজ্য পুরুষের মত তুমি রক্ষা করতে পারো নি তার জন্য নারীর মতো অশ্রু বিসর্জন তোমাকেই শোভা পায়।"[৭]

এস. ওয়াজেদ আলি তাঁর এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে কল্পনার যে পরিচয় দিয়েছেন তা খুবই নগণ্য। এটা তাঁর ঐতিহাসিক সত্যের বিরোধী নয় – অনুগামী। এটা ইতিহাসকে বিকৃত করে না, শুধু বিস্মৃতি-মলিন সত্যের রেখাগুলির উজ্জ্বল আলোকপাত করতে চেষ্টা করে মাত্র। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর গতি কাল্পনিক থেকে সত্যনিষ্ঠার দিকে। এ উপন্যাসের গঠন কৌশল অনবদ্য। ঘটনার পর ঘটনা দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে ছুটে চলেছে। কোথাও অনাবশ্যক বর্ণনার বাহুল্য নেই। কোথাও কাহিনীর গতিবেগ মন্থর হয়ে আসে নি।

ভ্রমণকাহিনী

কর্মসূত্রে এস. ওয়াজেদ আলি বিভিন্ন শহর ও গ্রামীণ জীবন জনপদ অবলোকনের সুযোগ হয়। তাঁর সাহিত্যে এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনবোধের প্রভূত প্রতিফলন ঘটেছে। এস. ওয়াজেদ আলি তাঁর কর্মময় জীবনে বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেছেন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট-এর চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়ার পর এস. ওয়াজেদ আলি সাহিত্যকর্মে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। প্রবন্ধ, গল্প, রূপক সৃষ্টি, ভ্রমণকাহিনী – বিবিধ শাখায় তিনি হয়ে উঠেন তীক্ষ্ণ মননশীল ও স্বচ্ছন্দ। *পশ্চিম ভারতে* (১৩৫৫) ও *মটরযোগে রাঁচি সফর* (১৯৪৯) নামক দুটি ভ্রমণকাহিনীতে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ততা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য।

বর্তমানে সাহিত্যের একটি বিশেষ শাখা ভ্রমণ সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ভ্রমণ সাহিত্যের রূপটি ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ থেকে এসেছে। মধ্যযুগে চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলোতে ভ্রমণ সাহিত্যের চকিত উন্মেষ লক্ষ করা গেলেও সচেতন উদ্দেশ্যে তা পূর্ণতা পায় নি। ইউরোপীয় সাহিত্যিক জজ কুকের ভ্রমণকাহিনী *Voyages* (১৭৭৩), জনসনের *Johnson's Journey to the Western Island of Scotland* (১৭৭৫), ও সুইনবার্ণের *Swinburne's Travels through Spain* (১৭৭৫-৭৬) বিশ্ববিখ্যাত ভ্রমণকাহিনী।

ভ্রমণকাহিনীমূলক গ্রন্থ যারা রচনা করেছেন তারা অধিকাংশই কূটনীতিবিদ, ধর্মপ্রচারক, চিকিৎসক, আবিষ্কারক ও নাবিক। এ সব গ্রন্থ বিদেশ ভ্রমণকারীদের পথ প্রদর্শণের কাজ করে এবং এসব গ্রন্থে বিদেশীদের জীবনযাত্রার পরিপূর্ণ ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভ্রমণসাহিত্যে থাকে ভ্রমণের বিবরণ। যে সাহিত্য "একস্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণের ক্রমান্বয়ী বিবরণ, যানবাহনের যোগাযোগ, ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতির বিশেষত্বসমূহের বাস্তব বিবরণ,

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশভেদে লোকজনের জীবনযাত্রা, সামাজিক বা বিশেষ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা, লোকাচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক বিশেষত্ব বা সৌন্দর্য বর্ণনা এবং লেখকের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার অকপট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় – তাকেই ভ্রমণসাহিত্য বলে।"[৮] অনেকে প্রথম বাংলা ভ্রমণ সাহিত্য হিসাবে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৪-১৮৯৯) *পালামৌ* (১২৮৭-৮৯-এর নাম উল্লেখ করেন। শ্রী গিরিশচন্দ্র বসুর *ইউরোপ ভ্রমণ* (১২৯১), *বিলাতের পত্র* (১২৯১), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের *আত্মজীবনী* (১৮৯৪), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারী* (১৯২৮/১৩০০), *জাপান-যাত্রী* (১৩২৬), *জাভা-যাত্রীর পত্র* (১৩৩৬) ইত্যাদি, শিবনাথ শাস্ত্রীর *ইংলণ্ডের ডায়েরী* (১৮৮৮), স্বামী বিবেকানন্দের *পরিব্রাজক* প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী। "রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন চিঠিপত্রে ভ্রমণ সাহিত্যের যথার্থ উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যে ভ্রমণসাহিত্যের কিছু গুণ উপস্থিত। *রঘুবংশে*ও ভ্রমণ সাহিত্যের লক্ষণ রয়েছে কোথাও কোথাও। বাংলায় বিশেষ করে কালকূট [সমরেশ বসুর ছদ্মনাম] ভ্রমণ সাহিত্যের সঙ্গে গল্পরস মিশিয়ে ভ্রমণ সাহিত্যকে এক নতুন মাত্রা দান করেছেন। তাঁর 'কোথায় পাবো তারে', 'অমৃত কুম্ভের সন্ধানে', 'অমৃত বিয়ের পাত্র' থেকে 'শাম্ব' বিভিন্ন ভ্রমণ সাহিত্যমূলক গ্রন্থে এই গল্পরস রচনাগুলিতে উপন্যাসের আবেদন এনে দিয়েছে। শঙ্কু মহারাজের 'জাহ্নবী যমুনা বিগবিলত করুণা' থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'চলো বেড়িয়ে আসি' বাংলা ভ্রমণসাহিত্য এখন বিশাল ও বৈচিত্র্যময়।"[৯] বাংলা গদ্যের উন্মেষের পর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেভাবে সমৃদ্ধির দিকে যায় ভ্রমণ সাহিত্য সেভাবে প্রসার লাভ করে নি। কোন কোন রচনায় ভ্রমণ সাহিত্যের বিভিন্ন উপাদানের পরিচয় পাওয়া গেলেও তা পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণকাহিনীমূলক রচনার মর্যাদা লাভ করে নি। "সার্থক ভ্রমণ কাহিনী লেখক ... নতুন পুরাতন উভয় অভিজ্ঞতাকে সমাহিত চিত্তে স্মরণ করে রসস্বরূপ প্রকাশ করেন। ভ্রমণ উপলক্ষ মাত্র।"[১০] এ বিবেচনায় এস. ওয়াজেদ আলির *পশ্চিম-ভারতে* (১৩৫৫) এবং *মোটরযোগে রাঁচির সফর* (১৯৪৮) আলোচনাযোগ্য।

পশ্চিম-ভারতে

এস. ওয়াজেদ আলি তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে এলাহাবাদ থেকে আগ্রা পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। ভ্রমণকালে তাঁর বিভন্ন স্থান পরিদর্শন ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বর্ণনা এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। এই ভ্রমণকাহিনীতে তিনি সুজানগড়, রতনগড়, আজমীর শরীফ, কুতুর মিনার, দেওয়ানে খাস, দেওয়ানে আম মতি মসজিদ, আকবরের সমাধি ও তাজমহলের শুধু বর্ণনাই করেন নি এদের ঐতিহাসিক দিকও নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন স্থানের সৌন্দর্য বর্ণনা, সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবস্থার কথাও এখানে বর্ণিত হয়েছে। এই ভ্রমণকাহিনী বর্ণনামূলক হলেও এর ভাষায় আছে কাব্যিক দ্যোতনা।

> রাজপুতানা শুষ্ক দেশ, এখানকার বাতাসে জলীয় পদার্থ অতি কম, আর সেই জন্য এখানকার আকাশ অতি পরিষ্কার, বাতাস অতি স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছ পরিষ্কার পটভূমিকায় রং-এর জলুস বড় সুন্দর দেখায়,

Dhaka University Institutional Repository

> আর এই দেশের স্থাপত্যে, চিত্রশিল্পে এমনকি মানুষের বেশ-ভূষায়, পোষাক পরিচ্ছদে রং-এর প্রচুর ব্যবহার।[১১]

রেলগাড়িতে উঠেই লেখক পশ্চিম ভারতীয় এক মুসলমানের মধ্যে ইসলামিক সৌভ্রাতৃত্বের পরিচয় পান। তাঁর কামরায় তিন চার জন হায়দরাবাদী মুসলমান দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। তাঁরা কথায় কথায় যখন জানতে পারেন লেখক মুসলমান তখন একান্ত আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে তাঁদের সাথে আহারের অনুরোধ করেন। রাতে দিল্লিতে পৌছার পর তাঁরা করোনেশান হোটেলে ওঠেন। তারপর সেই রাতেই রাজপুতনার সুজানগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। সকালে উঠে দেখেন চারিদিকে মরুভূমি। আর মানুষ উটে চড়ে যাওয়া-আসা করছে। বিকালে এসে সুজানগড়ে পৌছালেন। সেখানে এক ধনী মাড়ওয়ারির বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হলো। এখানে এসে মাড়ওয়ারিদের সম্পর্কে তাঁর ধারণার পরিবর্তন হলো :

> ক্ষুদ্র সুজানগড়কে মাড়ওয়াড়ীরা এক উদ্যান নগরীতে পরিণত করেছে। চারদিকে সুন্দর সুন্দর বাড়ি। বাড়িগুলি সুন্দর সুন্দর আবসাবপত্রে ভরা। ব্যবহারের তৈজসগুলি মূল্যবান ধাতুর তৈরী – কারুকার্যের সুন্দর একটি নিদর্শন।[১২]

মাড়ওয়ারিরা শুধু ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তা-ই নয় তাঁরা দেশের জন্য বড় বড় মন্দির, বড় বড় ধর্মশালা, হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতি স্থাপন করেন। তাঁরা যেমন অর্থ আয় করেন, তেমনি খরচও করতে পারেন।

এটা একটা ভ্রমণকাহিনী হলেও এর মাধ্যমে লেখক কোন কোন সম্প্রদায়ের সামাজিক-পরিচয়, তাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে মাড়ওয়ারি সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে তাঁদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। আবার সুজানগড়ের পঁচিশ হাজার বাসিন্দার মধ্যে যাঁরা মুসলমান তাদের মেয়েরা পরে চুড়িদার পায়জামা আর পুরুষেরা মাথায় দেন টুপি কিংবা পাগড়ি। হিন্দু মেয়েরা পরে ঘাগরা। এখানে কে মুসলমান আর কে হিন্দু তা সহজেই চেনা যায়। মাড়ওয়ারি বণিক সম্প্রদায়ের লোকে মাংস খান না। তাঁরা খান বিভিন্ন রকমের তরি-তরকারি, রুটি, ভাত, ডাল আর নানা রকমের মিষ্টান্ন। বিভিন্ন রকমের খাবার ছোট ছোট পাত্রে রেখে একটি থালায় করে পরিবেশন করা হয়। থালাটি একটি বড় চৌকির উপর রাখা হয়, আর বসার জন্য মেঝেতে পাতা হয় ছোট আসন। এ সম্প্রদায়ের লোকদের গুরুভক্তি দেখে অবাক হতে হয়। গুরুর সামনে তারা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন এবং একান্ত ভক্তি এবং নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করেন। এই সম্প্রদায়ের লোকে জৈন সম্প্রদায় বলে পরিচিত। জৈনরা খোদাকে মানেন বিশ্বের পালক হিসেবে। বিশ্বের স্রষ্টা হিসেবে তারা তাঁকে স্বীকার করেন না। "তাদের মতে, বিশ্ব অনন্ত কাল ধরে আছে এবং থাকবে। জড় জগত এবং জীব জগত হচ্ছে পরস্পর বিরোধী সত্তা। বিভিন্ন মোহের তাড়নায় আত্মা দৈহিক জীবনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। মোহকে দমন করা হল মুক্তি বা মোক্ষ লাভের একমাত্র পথ। ... জৈনদের মতে, সংসারধর্মও অবাঞ্ছনীয়, কেননা প্রত্যেক প্রকার কামনাই মানুষকে পুনর্জন্মের পথে টেনে আনে। তবে যারা সংসার ছাড়তে অক্ষম, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সংসার থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

বৈরাগ্যের অনুশীলন করা।"[১৩] তেরুপন্থী সাধুরা কোন প্রকার মোহকে প্রশ্রয় দেন না। সাধুরা নিজের জন্যে কোন গৃহ নির্মাণ করেন না। কারো কাছ থেকে কোন দান গ্রহণ করেন না। এবং কখনো ভিক্ষা গ্রহণ করেন না। তাঁরা দিনে একবার মাত্র আহার করেন। কারও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন না। দিনে একবার তাঁরা কোন না কোন ভক্তের বাড়িতে যান এবং সেখানে ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করেন। তাঁরা কোন প্রকার ধাতব দ্রব্য ব্যবহার করতে পারেন না। তাঁদের বিশ্বাস, সেরূপ করলে ধাতুটির প্রতি হিংসা করা হয়। তাঁদের বিশ্বাস ধাতুরও প্রাণ আছে। তাঁরা রেলগাড়ি, জাহাজ, নৌকা কিম্বা কোন রকম যানবাহনে চড়ে সফর করেন না। তাঁদের বিশ্বাস, এরূপ করলে উক্ত জিনিসগুলির প্রতি হিংসা প্রকাশ করা হয়। যতদূর পায়ে হেঁটে চলা যায়, ততদূরই তাঁরা যান। পায়ে হেঁটে রাজপুতনা থেকে কলকাতা আসা যায় না বলে এ পর্যন্ত কোন জৈন সাধু কলকাতায় আসেন নি। তেরুপন্থী জৈনরা প্রতিমা পূজাকে পাপ বলে মনে করে। এই তেরুপন্থী জৈনেরা গুরুদের দীক্ষা গ্রহণ করে যেমন সাধু হন, নারীরাও তেমনি দীক্ষা গ্রহণ করে সাধ্বী হন। তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ অনেকটা Roman Catholic-দের মতো।

এস. ওয়াজেদ আলি *পশ্চিম ভারতে* ভ্রমণকাহিনীতে শুধু ভ্রমণের একস্থান থেকে অন্যস্থানের ক্রমান্বয়ী বিবরণই দেন নি। এখানে তিনি তুলে ধরেছেন ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতির বাস্তব বিবরণ এবং পরিবেশভেদে লোকজনের জীবনযাত্রা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির বিবরণ।

সুজানগড় থেকে রতনগড়-এ এসে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে তারা বিকানি শহরে আসেন। এ শহর সুন্দর ও পরিষ্কার। রাস্তা-ঘাট সুগঠিত, প্রশস্ত এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এখানে প্রত্যেক নগরেরই প্রকাণ্ড প্রাকার এবং গেট আছে। এখানকার ভাষা উর্দু বা হিন্দুস্থানি। পশ্চিমভারতের হিন্দুদের এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে লেখক মন্তব্য করেছেন :

> স্বাধীনতার আদর্শ, আমার মনে হয়, প্রাদেশিক ভিত্তির উপর গড়তে হবে, আর বাংলাদেশেই তার গোড়াপত্তন করতে হবে। কেননা, জাতীয়তার উপকরণ এই বাংলাদেশেই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।[১৪]

বিকানি শহর ছেড়ে তাঁরা আজমির শরীফে আসেন। সে রাতে সেখান থেকে সকালে তাঁরা খাজা মঈনউদ্দিন চিস্তীর মাজারে এসে লেখক আজমির শরীফের কোন বিবরণ না দিয়ে তাঁর ইতিহাস-জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় দিয়েছেন : "খাজা সাহেবের মাজার হচ্ছে ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রধান তীর্থ ; ইসলামের আধ্যাত্মিক শক্তির গৌরবময় কেন্দ্র। সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষে একটিও মুসলমান ছিল না, আর এখন এদেশে নয় কোটি মুসলমান।"[১৫] ভারতবর্ষে মুসলমানদের বাদশাহি গেলেও ইসলাম এখান থেকে বিলুপ্ত হয় নি। ইসলাম এখানে গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে – ধর্মে, রাষ্ট্রে, সাহিত্যে এবং সমাজ জীবনের বিভিন্ন পরিমণ্ডলে। ভারতবর্ষে ইসলামের এই বিস্তার সূফিপন্থি দরবেশদের সাধনার ফল। ভারতবর্ষে আগত দরবেশদের সম্পর্কে লেখকের সুচিন্তিত

Dhaka University Institutional Repository

অভিমত ও গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রণিধানযোগ্য :

> সুফী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হচ্ছে মুসলিম জগতের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বিজ্ঞান এবং দার্শনিক আলোচনার পথ যখন গাজ্জালী প্রমুখ রক্ষণশীল আলেমদের প্রচেষ্টায় রুদ্ধ হল, জনসাধারণ যখন পার্থিব জীবনের চিন্তায় ধর্মের উচ্চতর প্রেরণের কথা ভুলে গেল, শাহী দরবার যখন আত্মসর্বস্ব আমীর ওমরাহ, গতানুগতিক আলেম প্রভৃতির লীলাভুমিতে পরিণত হল, তখন উচ্চ মনোবৃত্তি সম্পন্ন একজন লোক মুসলিম জগতে আবির্ভূত হলেন – যাঁরা আত্মার পবিত্রতা রক্ষার জন্য সাংসারিক সর্ববিধ উচ্চাশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দরবেশদের বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করে খোদার প্রকৃত সত্তার চিন্তায় আত্মনিয়োগ করলেন। এই মহাত্মারাই ছিলেন সুফী বা দরবেশ নামে সুপরিচিত। গওসুল আজম আবদুল কাদের জিলানী হচ্ছেন সর্বপ্রথম সূফী এবং সূফীবাদের গুরু। এই জন্য তাঁকে পিরামপীর বা গুরুদের গুরু বলা হয়ে থাকে। আজমীরের খাজা মঈনউদ্দীন ছিলেন আব্দুল কাদের জিলানীর প্রশিষ্যদের অন্যতম।[১৬]

এই ভ্রমণকাহিনীতে লেখক ভ্রমণের ক্রমান্বয়ী বিবরণ লিপিবদ্ধ না করে যে সকল স্থান তিনি পরিদর্শন করেছেন সেই সব স্থানের ঐতিহাসিক দিক পর্যালোচনা করেছেন। খাজা মঈনউদ্দিনের ভারত আগমনের পর তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করে এস. ওয়াজেদ আলি বলেছেন :

> খাজা সাহেবের ভারত আগমনের অব্যবহিত পরই সুলতান শাহাবুদ্দীন ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তারপর প্রায় সহস্র বর্ষ অতিবাহিত হয়েছে, ইতিমধ্যে কত বাদশাহী এসেছে, কত বাদশাহী গেছে, খাজা সাহেবের বাদশাহী কিন্তু মুসলিমদের অন্তররাজ্যে সমানভাবে চলেছে আর চলবে। পার্থিব আর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভেদ এইখানে।[১৭]

পশ্চিম ভারতে এই ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনার মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু অলৌকিক কাহিনী পরিবেশন করে এস. ওয়াজেদ আলি ভ্রমণকাহিনীর একঘেয়েমি ও নীরস বর্ণনাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। রওশন আলি দরবেশের সাথে দুধ বিক্রেতার তর্কাতর্কির ফলে রাজাদেশে দরবেশের অঙ্গুলি কর্তন হওয়ার ঘটনা, দরবেশের আস্তানা ছেড়ে মদিনা গমন এবং হযরতের অলৌকিক নির্দেশে মদিনা ছেড়ে মেশেদ নগরে গিয়ে বিখ্যাত বীর এবং ধর্মযোদ্ধা সৈয়দ হোসেনের সাথে দেখা করা, সৈয়দ হোসেনের বিয়ে সমাপ্ত না করেই বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি বিরাট মোজাহেদ বাহিনী সঙ্গে নিয়ে পারস্য, বেলুচিস্থান, মূলতান এবং সিন্ধুদেশ অতিক্রম করে আজমীর নগরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হওয়ার ঘটনা, পৃথ্বীরাজের ঐন্দ্রজালিকদের সাথে সৈয়দ হোসেনের যুদ্ধের ঘটনা এবং পৃথ্বীরাজের যাদুকরেরা ইন্দ্রজালের সাহায্যে সমস্ত পর্বতটিকে ঘোরানোর ঘটনা এবং সৈয়দ হোসেনের আরবি ঘোড়ার খুরের আঘাতে সে যাদু ব্যর্থ করে দেয়ার কাহিনী, দরবেশদের তারাগড় দখলের কাহিনী এবং পরবর্তীকালে রাজপুতদের সাথে যুদ্ধে সৈয়দ হোসেনের শহীদ হওয়ার ঘটনা ভ্রমণকাহিনীকে অপরিসীম আকর্ষণীয়, মনোমুগ্ধকর ও শিল্পসমৃদ্ধ করে তুলেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তারাগড়ের প্রাকৃতিক শোভা, হিন্দু তীর্থ, পুকুরের হ্রদ, হ্রদের চারদিকে রাজা মহারাজাদের বাড়ি, মন্দির এবং আকবরের স্ত্রী যোধাবাইয়ের স্নানের প্রাসাদ ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

১. আজমীর থেকে আমরা বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ পুষ্কর দেখতে গেলাম। পুষ্করে একটি হ্রদ আছে, তার জল গঙ্গা ও যমুনার জলের মতোই পবিত্র। হ্রদের চারিদিকে রাজামহারাজাদের বাড়ি – তাছাড়া অনেক মন্দির, ঘাট প্রভৃতি আছে। আকবরের মহিষী যোধাবাইয়ের স্নানের প্রাসাদ দেখবার জিনিস। মহিষী যখন তীর্থ করতে আসতেন বাদশা তখন নিকটেই এক প্রাঙ্গণে অবস্থান করতেন।[১৮]

২. দরবেশ প্রবর সৈয়দ হোসেন নামাজ শেষ করে প্রস্তরটি দেখতে পান এবং দুই আঙ্গুলের সাহায্যে সেটিকে দূরে নিক্ষেপ করেন। তাঁর অঙ্গুলীদ্বয়ের চিহ্ন এখনও এই পাথরে দেখতে পাওয়া যায়। তারপর দুর্গদ্বার ভেদ করে দরবেশ বাহিনী গড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। সেখানে ভীষণ যুদ্ধ হয় আর সে যুদ্ধে দরবেশ বাহিনী সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করেন।[১৯]

৩. সরু, অসমান, আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। কি দুর্গম পথ! বহাবাহুল্য, ডুলি বাহকেরা ডুলিতে করে আমাদের উপরে নিয়ে যাচ্ছিল। পায়ে হেঁটে সে পথে উঠা আমার পক্ষে অসম্ভব।[২০]

আজমির থেকে লেখক তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে আগ্রায় আসলেন। আগ্রার যে বিবরণ এখানে বর্ণিত হয়েছে তা কাব্যিক, সঙ্গীতধর্মী, চিত্র ও চিত্রকল্পময় :

১. আগ্রার তাজমহল বিশ্ববিশ্রুত। স্থাপত্য শিল্পের এই অতুলনীয় নিদর্শন যিনি চর্মচক্ষে দেখেন নি, তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। এখানে এলে মনে হয় আমরা এক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করেছি। আমি বন্ধুদের বললাম, এ হচ্ছে তার কল্পনাবিস্ময়কর সার্থক রচনা। কল্পনা বিলাসী শাহজাহান চাঁদনীরাতে ফোয়ারার সঙ্গীত এবং মলয় সমীরণের সাহচর্যে এই বাগানের এক স্বপ্নরাজ্যে চলে যেতেন – যেখানে আছে কেবল সৌন্দর্য, আছে কেবল ভালবাসা, আছে কেবল প্রীতি আর আছে কেবল অফুরন্ত আনন্দ। ক্ষণিকের তরে তাঁর শিল্পীপ্রাণের প্রেরণায় তিনি জড়া মৃত্যু দুঃখ বিরহের কথা ভুলে যেতেন। পরীদের রানী মমতাজ বেগম, অনিন্দ্য সুন্দরী পরিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে মহল থেকে বের হতেন সম্রাটের অভ্যর্থনার জন্য, তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় প্রেমাস্পদকে সাদর চুম্বন দেবার জন্য। স্বপ্নের আবেশে বাদশা এই সুন্দরী শ্রেষ্ঠকে আলিঙ্গন করবার জন্য উঠে দাঁড়াতেন। বাদশার আবেশ তখন কেটে যেতো। স্বপ্ন ভেঙ্গে যেতো। 'কোথা গেলে মমতাজ, কোথা গেলে মমতাজ' বলতে বলতে ভারতেশ্বর আর্তকণ্ঠে তখন অশ্রু বিসর্জন করতেন। এইভাবেই প্রেমিক শ্রেষ্ঠ শাহজাহানের দিন কাটতো।[২১]

২. সত্যই এই মর্মর রচিত গীতিকাব্য মনকে অপার্থিব এক জগতে নিয়ে যায়। মনে ভাবের এক অভূতপূর্ব জোয়ার এনে দেয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পের এই হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

তাজমহল পরিদর্শন করে পরদিন তাঁরা কেল্লার মতি মসজিদ, দেওয়ানে খাস, দেওয়ানে আম প্রভৃতি মোগল স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন প্রাণভরে উপভোগ করলেন। মোগল স্থাপত্যের বর্ণনায় : "কোথাও রং-এর বাহুল্য নাই, অলঙ্কারের বাহুল্য নাই, ঐশ্বর্য দেখাবার প্রয়াসের চিহ্ন কোথাও নাই, অথচ রেখা এবং রং-এর সামঞ্জস্য মনকে বিস্ময় এবং আনন্দে অভিভূত করে ফেলে। মোগল স্থাপত্য এবং গ্রীক ভাস্কর্য হচ্ছে সুসংযত, সুনিয়ন্ত্রিত রুচির সঙ্গে কল্পনার ঐশ্বর্যের নিখুঁত মিলনের দুটি শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন।[২৩] সম্রাট শাহজাহানের বন্দি জীবনের ঘটনা, তাঁর মানসিক অবস্থার বর্ণনা, আগ্রার শহরতলি সেকেন্দ্রায় সম্রাট শ্রেষ্ঠ আকবরের সমাধি পরিদর্শন করে আবেগপ্রবণ হয়ে তাঁর সমাধির এককোণে বসে অশ্রু বিগলিত চোখে ভারতবাসীর কাছে প্রশ্ন রেখেছেন : "ভারতের এই আদর্শ সম্রাট, বিশ্বের ইতিহাসে যার তুলনা পাওয়া যায় না, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ভারতবাসীরা কি করেছেন ? ক'জন লোক তাঁর মোকবেরা দর্শন করতে আসেন, ক'জন সাম্বাৎসরিক স্মৃতিসভা বা উৎসবে যোগ দেন? ভারতের কয়টা জায়গায় তাঁর জন্মবার্ষিকী বা মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয় ? ক'জন ভারতীয় সাহিত্যিক তাঁর আদর্শের, তাঁর জীবনের, তাঁর সাধনার যথোচিত আলোচনা করেছেন?[২৪] আকবরের সমাধি পরিদর্শন করে এস. ওয়াজেদ আলির মন্তব্য :

> আকবরের মোকবেরা ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান প্রভৃতি সর্বজাতির এবং সর্বধর্মের তীর্থক্ষেত্র হওয়া উচিত, প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনে একবার অন্তত এ স্থান দর্শন করা উচিত। আমরা যদি এভাবে ভারতের এই রাষ্ট্রগুরুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি তাহলে যে আমাদের অশেষ কল্যাণ হবে সেটা সুনিশ্চিত। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন দৃঢ়তর হবে, ধর্মের ব্যাপারে লোকের পরমতসহিষ্ণুতা বাড়বে, বর্তমানের রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের মনে আগ্রহ এবং প্রেরণা আসবে, আর এসবের ফলে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় জীবন মঙ্গলের পথে অগ্রসর হবে। মহামানবের সম্মান করে আমরা সম্মানিত হব, মহাপুরুষের আশীর্বাদে আমাদের জীবন এবং সাধনা সার্থক হবে।[২৫]

আকবর সব ধর্মের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। এর নিদর্শন পাওয়া যায় আকবরের মোকবেরার ফাটলের উপর গাঁথা মুসলমানের মিনার, খ্রিস্টানের ক্রস আর হিন্দুর মন্দির-চূড়া। আকবর সব ধর্মের প্রতি তাঁর শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রধান প্রধান ধর্মের এই প্রতীকগুলিকে তাঁর মোকবেরায় স্থাপন করেন।

পরে আগ্রা থেকে তাঁরা ফতেহপুর শিকরিতে এসে উপস্থিত হন। এখানে আকবরের শয়নকক্ষ, যোধাবাইয়ের মহল, প্রাসাদের বাইরে মিনাবাজারের চত্বর এবং যোধাবাইয়ের হাতির কবর পরিদর্শন করেন। তারপর ফতেহপুর শিকরির জোম্মা মসজিদ, সুলতান বাবর ও মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধক্ষেত্র, বাবরের মানসিক অবস্থা পরিবর্তনের কাহিনী এবং বিরাট রাজপুত বাহিনীকে পরাজিত করে বাবরের অসামান্য বিজয় লাভ ইত্যাদি বিবরণ এ ভ্রমণকাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছে। এই ভ্রমণকাহিনী অনেক ঐতিহাসিক তথ্যে পরিপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

বাবরের পুত্র হুমায়ুনের পীড়িত হওয়া এবং মরণাপন্ন অবস্থা থেকে সুস্থ হওয়ার কাহিনী এবং হুমায়ুনের রোগ তাঁকে দিয়ে তাঁর প্রিয় সন্তানকে রোগমুক্ত করা হোক বলে খোদার কাছে প্রার্থনা ইত্যাদি ঘটনা এই ভ্রমণকাহিনীকে আরো বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ফতেহপুর শিকরীর জোম্মা মসজিদের সামনে বিরাট চত্বরে শ্বেত মর্মরে নির্মিত দরবেশ সেলিম শাহ চিস্তির মাজার। সেলিম শাহ দরবেশের দোয়ায় আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরকে লাভ করার কাহিনী, আকবর তাঁর পীর সেলিম শাহের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ফতেহপুর শিকরীতে রাজধানী স্থাপন করার ঘটনার সে বিবরণ এখানে দিয়েছেন তাতে তাঁর গভীর ইতিহাস-জ্ঞানের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। আগ্রা থেকে লেখক তাঁর সঙ্গীসহ আসেন দিল্লীতে। দিল্লির কুতুব মিনারের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে বিমুগ্ধ হন। পাঠান যুগের স্থাপত্যের কীর্তি দেখে কাব্যিক ভাষায় এর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন : "কি সুন্দর এর গঠন! কি অপরূপ এর কারুকার্য! কি বিস্ময়কর এর পরিকল্পনা! ... এ মস্‌জিদ যদি সম্পূর্ণ হতো তাহলে এ যে পিরামিড প্রভৃতির মত স্থাপত্য শিল্পের এক বিস্ময়কর নিদর্শন হয়ে থাকতো, স্পষ্টই তা বোঝা যায়।"[২৬] বিখ্যাত দরবেশ কুতুব সাহেব কিভাবে খাজা মইন উদ্দিন চিস্তির সঙ্গে ভারতে আসেন এবং নিজামউদ্দিন আউলিয়ার জীবন কথা, মহাকবি আমীর খসরুর বহুমুখী প্রতিভার পরিচয়, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার সঙ্গে আমীর খসরুর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি গালিবের মাজারের বিবরণ ইত্যাদি গভীর শ্রদ্ধার সাথে এই ভ্রমণকাহিনীতে বর্ণিত হয়ে ভ্রমণকাহিনী শৈল্পিক মর্যাদা লাভ করেছে।

মটরযোগে রাঁচির সফর

মোটর যোগে রাঁচির সফর (১৯৪৯) এস. ওয়াজেদ আলির দ্বিতীয় ভ্রমণকাহিনী। এক পুজোর ছুটিতে, ২রা অক্টোবরে, মোটর যোগে তাঁরা – এস. ওয়াজেদ আলি, মিসেস নেলী ওয়াজেদ, তিন সন্তান এবং তাঁর ছোটভাই শেখ শামসের আলি রাঁচি ভ্রমণ করেন। কলকাতার হাওড়া থেকে রাঁচি পর্যন্ত ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন স্থানের সৌন্দর্য বর্ণনা, তাদের রীতি-নীতি, সামাজিক উৎসব, বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি, সামাজিক আচার ব্যবস্থা ও বিপদ সংকুল দুর্গম পথের বর্ণনাই এই ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনীয় বিষয়।

এস. ওয়াজেদ আলি কলকাতা থেকে রাঁচি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। গাড়ি হাওড়া স্টেশন পার হয়ে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে বের হওয়ার পর যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। তাই সেওড়াফুলিতে পৌছাতে তাঁদের প্রায় দু'ঘণ্টা সময় লেগে যায়। সারাটা পথ বৃষ্টির মধ্য দিয়ে বর্ধমান পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। বালি-তে এসে লেখক যখন মোটর গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত তখন হঠাৎ দেখতে পান তাঁর চার বছরের ছেলে আহমদ একেবারে নদীর ধারে গিয়ে কাদায় ছুটোছুটি করছে। এ দৃশ্য চোখে পড়তেই একজন দৌড়ে গিয়ে তাকে তুলে আনলো। এরপর বেলা এগারোটার পর তারা এলো চন্দন নগরে। এখানে নদীর ধারে বাগানের মধ্যে হোটেল ডি প্যারি-তে খেল। এখান থেকে মেমরি পর্যন্ত পথটা বন-জঙ্গলে ভরা। বেলা একটার দিকে তারা বর্ধমানে এসে পৌছল। এখানে নূরজাহানের প্রথম স্বামী

Dhaka University Institutional Repository

শের আফগান খাঁর কবর দেখার খুব ইচ্ছে থাকলেও সময়ের অভাবে তা দেখা হয় না। তারপর মোটর গাড়ি ছুটে চললো দিগন্ত প্রসারী মাঠের মধ্য দিয়ে।

সন্ধ্যার দু'ঘণ্টা পর তারা আসানসোলে পৌছাল। এখানে পৌছার পর লেখক অতীত ইতিহাসের যে স্মৃতিচারণ করেছেন বর্ণনাভঙ্গির কৌশলে তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে :

> নির্জন অন্তহীন মাঠের মধ্যে কত রকমের খেয়ালই না আসতে লাগলো। এই সেই গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড, যা দিয়ে আকবরের ফৌজ বাঙ্গলা দেশে এসেছিল। এই সেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, যা দিয়ে নূরজাহান বেগম (তখন মেহের-উন্নিসা) তাঁর প্রথম স্বামী শের আফগানের সঙ্গে বর্ধমানে এসেছিলেন। এই সেই গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড, যা দিয়ে আমাদের পূর্ব পুরুষেরা রাজকার্য উপলক্ষ্যে, বাণিজ্য ব্যপদেশে এবং ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলাদেশে এসে মুসলিম উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এই পথ আমাদের জাতির একটি তীর্থক্ষেত্র – জেয়ারতগাহ।[২৭]

এস. ওয়াজেদ আলি তাঁর ভ্রমণকাহিনীর নিষ্প্রাণ বর্ণনা দেন নি। বর্ণনার অভিনব চাতুর্যে তা হয়ে উঠে এক স্বপ্নপুরী : "পথের চারদিকের মাঠ এবং পাহাড়ের মধ্যে খনির ইউরোপীয়ান কর্মচারীদের থাকবার কুঠিগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হতে লাগলো। কুঠিগুলি কি সুন্দর! আর কি মনোরম পারিপার্শ্বিক setting-এর মধ্যে অবস্থিত। সৌন্দর্যপ্রিয় ইংরাজ যেখানে যায়, সেইখানেই একটা ছোট ছোট বেহেশতের সৃষ্টি করে।"[২৮]

আসান সোল থেকে দশ-বার মাইল দূরে বরাকর নদী। নদীর তীরে সুন্দর সুন্দর মন্দির। হিন্দু স্থাপত্যের গৌরবের যুগে এগুলো নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরগুলো প্রাচীনকালের। কিংবদন্তী আছে, মহারাজ হরিশচন্দ্র এগুলো প্রতিষ্ঠা করেন। বছরে একবার এখানে খুব বড় রকমের একটা মেলা হয়। দেশ-দেশান্তর থেকে অনেক যাত্রীরা পুণ্য সঞ্চয় করতে এখানে আসে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব মনোরম। এখানকার অধিবাসীদের বেশীরভাগই সাঁওতাল। বরাকর-এর পর থেকে রাস্তার দু'দিকে মাঠ আর পাহাড়। একটা পাহাড় প্রায় তিন হাজার ফুট উঁচু। এর উপরে পরেশনাথের মন্দির রাজকিরীটের মতো শোভা পাচ্ছে। পরেশনাথের পাহাড়ের নীচেই ডুঙ্গরির ডাকবাঙ্গলা। এটি ছোট একটা পাহাড়ের উপরে। বেলা দুটোর দিকে তারা ডুঙ্গরি থেকে পাটনার দিকে এসে উপস্থিত হয় হাজারিবাগে। বড় সুন্দর শহর হাজারিবাগ। হাজারিবাগের মাধুর্যমণ্ডিত বর্ণনা যেমন কাব্যিক, তেমনি চিত্রাত্মক :

> চারিদিকে লাল ঝরঝরে রাস্তা ; আর তার পাশেই সুন্দর বাগানের মধ্যে villa-র ধরনের বাড়ি। শহরের বাইরে সুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্র – পাহাড়ের প্রাকার দিয়ে ঘেরা।[২৯]

মোটরযোগে রাঁচির সফর ভ্রমণকাহিনীতে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে হাওড়া পুল, হাওড়া স্টেশন, বালির পাটকলের দৃশ্য, চন্দন নগর, গভর্নমেন্ট হাউস, পাণ্ডুয়া, বর্ধমান শহরের নবনির্মিত প্রবেশদ্বার – স্টার অব ইণ্ডিয়া এবং আসানসোল। এই ভ্রমণকাহিনীতে বিভিন্ন স্থানের বর্ণনায় কখনো কাব্যিক ভাষার

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ করা হয়েছে, আবার কখনো বা সহজ সরল ভাষায় একটার পর একটা ঘটনা বর্ণিত। মাঝে মাঝে অতীত ইতিহাসের ঘটনাবলি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তাতে লেখকের ইতিহাস-জ্ঞানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনের বর্ণনা নীরস ও একঘেয়েমি না হয়ে শৈল্পিক বর্ণনার গুণে তা হৃদয়গ্রাহী, চিত্তাকর্ষক ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কাহিনীর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা আবেগ ও বহমান রয়েছে যা কোন বর্ণনার গতিকেই শ্লথ করে নি। এ কাহিনী নিছক ভ্রমণকাহিনী না হয়ে লেখকের ইতিহাস জ্ঞানের গভীরতায় পাঠক-পাঠিকাকে নিয়ে যায় ইতিহাসের অতীতযুগে। তবে ইতিহাসের তথ্যের ভারে এর কাহিনী কখনো নীরস, আড়ষ্ট ও শ্লথগতি বলে মনে হয় নি। এই ভ্রমণকাহিনীর ভাষায় যেমন ওজস্বিতা আছে, তেমনি আছে কাব্যিক দ্যোতনা ও রূপসৌন্দর্য। কখনো দীর্ঘ, কখনো ছোট ছোট শব্দ-বাক্যে বর্ণিত হয়েছে ভ্রমণকাহিনীর বক্তব্য বিষয় :

> ১. খোলা মাঠের নির্মল বাতাস এসে আমাদের ব্যজন করতে লাগলো। অপূর্ব এক আনন্দানুভূতিতে আমাদের মন প্রাণ প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে দ্রুত গতিশীল মোটরযানে পথ অতিক্রম করার মত বিমল আনন্দ অতি অল্প জিনিস থেকেই পাওয়া যায়। মনে হয় যেন আমরা সংসারে শোক-দুঃখের বন্ধন ছেদন করে মুক্ত বিহঙ্গের মতো অবাধ আনন্দে আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছি – কোন সুমধুর স্বপ্নের দেশে।[৩০]
>
> ২. ফুটফুটে সেই চাঁদনির রাতে গাছের ডালগুলি আমাদের মোটর গাড়ির সামনের আয়নার স্ক্রীনে অপূর্ব ধরনের সব ছবি রচনা করতে লাগলো। ... আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব মায়া শিল্প দেখতে লাগলুম।[৩১]
>
> ৩. রাস্তার দুদিকে সবুজ ঘাসের এবং ধান গাছের সুন্দর গালিচা বিছানো রয়েছে – তাঁরই ফাঁকে পুকুর শ্রেণী – তাদের মধ্যে রক্ত কমলের সারি উজ্জ্বল বার্লাক-কিরণে বড় বড় ইয়াকুতের মত জ্বলজ্বল করছে।[৩২]

এস. ওয়াজেদ আলির ভ্রমণকাহিনীতেও ভাষার সাবলীল প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষণীয় :

> রাঁচি শহরটি অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে অবস্থিত – তবে চারিদিকে সুন্দর সুন্দর পাহাড় স্থানটিকে বড় মনোরম করে রেখেছে। ... রাঁচির ফঁকে নামক অংশটি দেখতে বড় সুন্দর। এই অংশ দিয়ে সুবর্ণ রেখা নদী নিজের নামটি সার্থক করে নৃত্যশীল গতিতে, মৃদু গুঞ্জনে প্রেমের গীতি গাইতে গাইতে, তার সুদূর অভিসারের উদ্দেশ্যে চলেছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। তার মধ্যে একটি পাষাণের পাহাড় বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্যামলতার তাতে চিহ্ন মাত্র নাই। যেন কোন উদ্যমহীন, আদর্শহীন সমাজের মধ্যে একজন অতিমানব দাঁড়িয়ে আছেন ; অবজ্ঞার চোখে সকলকে দেখছেন, আর সমাজের কলুষ যাতে তার মহত্ত্বকে স্পর্শ না করে তার জন্য কঠোরভাবে লৌহবর্মে নিজেকে আচ্ছাদিত করেছেন।[৩৩]

তাঁর এই ভ্রমণকাহিনীতে আধুনিক কাব্যিক ভাষার ব্যবহার, উপমা, তুলনা, চিত্রকল্প এক দক্ষতায় শিল্পরূপ পেয়েছে :

> ১. সূর্য আস্তে আস্তে আকাশের কোণে ঢলে পড়লো। পশ্চিম কোণের মেঘগুলি বিচিত্র লাল রঙে রঞ্জিত হল। দূর চক্রবালে পরেশনাথের পাহাড় আর মন্দির দেখা যাচ্ছিল। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় তাদের পাষাণময় দেহ দেখতে লাগলুম।[৩৪]

Dhaka University Institutional Repository

২. একদিকে উচ্চ জঙ্গল সমাকীর্ণ পাহাড়, আর অপরদিকে সুগভীর খাদ – তার পাদদেশে সুদূর সতমল ভূমি – তাকে বেষ্টিত করে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য শৈলশ্রেণী।[৩৫]

বিদেশি শব্দ বিশেষ করে আরবি-ফার্সি শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এস. ওয়াজেদ আলির দক্ষতা সুস্পষ্ট :

১. রাস্তার অপর পারে শাহ সুফি সুলতানের মোকবেরা। সেখানে আমরা জেয়ারত করতে গেলুম। শাহ-সাহেব ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান ওলি-আল্লাহ। দিল্লীর বাদশাহ জালালউদ্দিন তাঁর মুরিদ ছিলেন। সিলেটের শাহজালালের মত তিনিও ইসলাম প্রচারের জন্য বাঙ্গলা দেশে তশরিফ আনেন। পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে এখনও তাঁর দরগাহ বর্তমান আছে।[৩৬]

২. মোকবেরার মসজিদে এখনও নিয়মমত আজান দেয়া এবং নামাজ পড়া হয়। তবে দু'একজন খাদেম ছাড়া নামাজ পড়ার অন্য লোক নাই।[৩৭]

এই ভ্রমণকাহিনীতে এস. ওয়াজেদ আলি বাক্যের মধ্যে মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দ ইংরেজিতেই ব্যবহার করেছেন :

১. এই আসানসোল থেকেই বিখ্যাত 'Coal district' বা কয়লার দেশ আরম্ভ হয়েছে।[৩৮]

২. ছুটিতে ঘুরে-ফিরে বেড়াবার জন্যই আমরা বেরিয়েছিলুম – 'Systematic'ভাবে দেশ পরিদর্শনের উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না।[৩৯]

ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী দু'টিতে এস. ওয়াজেদ আলি ইতিহাস-জ্ঞানের গভীরতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের কাঠামো নির্ধারিত রেখেও ঐতিহাসিক তথ্য ও সত্যকে কোথাও বিকৃত করতে হয় নি। সমকালে মুসলিম ঐতিহ্য-রূপায়ণে দায়বদ্ধতা থাকলেও শিল্পীর অভিনিবেশও উপন্যাসটিতে অলক্ষ্য নয়। ভ্রমণকাহিনীতে ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রকাশ ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এস. ওয়াজেদ আলির তত্ত্বনিষ্ঠা, দার্শনিক মনোনিবেশ, ঐতিহাসিক জ্ঞান ও ঐতিহ্যসচেতনতা ইত্যাদি সমন্বিত হয়ে ভ্রমণকাহিনীকে প্রথাবদ্ধ করে নি।

তথ্যনির্দেশ

১. কৃষ্ণগোপাল পাল, সাহিত্যের পরিভাষা, সোমা প্রকাশন, ৬ রঘুনাদ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৪০-৪১

২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১

৩. এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী – ২, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪২৬

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৯

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩০

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪

৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৫

Dhaka University Institutional Repository

৮. ড. কৃষ্ণগোপাল রায়, সাহিত্যের পরিভাষা, সোমা প্রকাশন, ৬ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলিকাতা – ৯, ১৯৯৫, পৃ. ১৯১

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯১

১০. সৈয়দ মুজতবা আলী, *মুসাফির*, ১ম সংস্করণ, পৃ. ৫২

১১. *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* –২, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৪৬২

১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬২

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৪

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৬

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭১

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০

২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭০

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭২

২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩

২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৪

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৪

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৩

২৭. এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী – ১, সংগ্রহ ও সম্পাদনা : সৈয়দ আকরম হোসেন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫, পৃ. ৪৩৫

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪০

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৫

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৯

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৩

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫০

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫০

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই বাঙালি মুসলমান মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিপণ্ন বোধ করছিল। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদ ও ব্রিটিশদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখার সচেতন আগ্রহ বাঙালি মুসলমান সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত, সামাজিকভাবে সংকীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিম সমাজ পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক বাস্তবতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামিকে লালন করলেও দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বৃহত্তর সমাজ-মানসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে সচেষ্ট হয়েছে। তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে সমাজ, ধর্ম, জাতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি সম্পর্কে নবতর সচেতনতা। মূলত মানবমুখ্য ভাবনা তাদেরকে আগ্রহী করে তুলেছে পুরাতন অন্ধ কুসংস্কারকে মূলোৎপাটনের জন্য। অবশ্য প্রাথমিক পর্যায়ে সমাজ-জাতি-ধর্ম ভাবনায় বিশৃঙ্খলা থাকলেও ধীরে ধীরে কালপ্রবাহে সুস্থির ইতিবাচকতায় পরিণতি পায়।

বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনকে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাঁরা সংস্কারবাদী আন্দোলনকে প্রাধান্য দিয়েছেন, ধীরে ধীরে শান্তিপূর্ণভাবে সামাজিক মুক্তির বাণী আত্মস্থ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ইংরেজি শিক্ষায় আলোকিত মুসলিম-মানস, বিশেষত প্রাগ্রসর বুদ্ধিজীবীগণ সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করেছেন। ফলে সমাজের যাবতীয় অন্ধতা, কুসংস্কার, অনৈতিকতা, অমানবিকতা তাঁদের সংস্কার-চর্চার অংশ হিসেবে প্রতিরোধ আন্দোলনের রূপ নিয়েছে। অশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্যে তাঁরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছেন। এই প্রেক্ষাপটে এস. ওয়াজেদ আলি কেবল প্রথাগত সমাজ-সংস্কারক হিসেবেই অবতীর্ণ হন নি। শিক্ষা, বিজ্ঞান-মনস্কতা, পাশ্চাত্য-আদর্শ ও ঐতিহ্য-অঙ্গীকার, সচেতন স্বাতন্ত্র্যবোধ সমকালীন সংস্কারবাদীদের কর্মপ্রক্রিয়া থেকে তাঁকে প্রাগ্রসর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে এবং এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর মননশীল প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলোতে। প্রবন্ধে এস. ওয়াজেদ আলির সমাজ, জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র, শিল্প ও সাহিত্য-ভাবনার স্বরূপটি সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত।

এস. ওয়াজেদ আলি সমাজ বলতে কেবল বাঙালি মুসলমান সমাজকেই বুঝান নি। তাঁর চেতনা-অন্তর্গত ছিলো ভারতীয় একত্ববোধ। তবে তা একত্বের বহুত্ব এবং বহুত্বের একত্ব-আদর্শে সমন্বিত ও বিশিষ্ট। তিনি সামাজিক মুক্তির জন্যে উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে অস্বীকার করে সকল ধর্মের মানবীয় সহাবস্থান কামনা করেছেন। শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হবে আত্মিক জাগরণের ক্ষেত্রে এবং নারী-পুরুষ সকলকেই সমমানের মানবমুখী বাস্তব শিক্ষা দিতে হবে। নারীর পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের ওপরই সামাজিক উন্নতির মূল ভিত্তি স্থাপিত হবে। পর্দাপ্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন, এবং তিনি ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার উন্নতির পক্ষে নারীর সক্রিয়-সচেতন উপস্থিতিকে মূল্যায়ন করেছেন। যুবকেরা সামাজিক শক্তি এবং তাদের প্রাণশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহারের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর সমাজচিন্তা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক উপযোগিতাবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

এস. ওয়াজেদ আলি ধর্ম-জীবনকে অস্বীকার করেন নি। তিনি মনে করেছেন ধর্ম ব্যক্তিগত আবেগ-উপলব্ধির ব্যাপার। কিন্তু ধর্মের সামাজিক আরোপে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই তিনি ধর্মভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রকে অবাস্তব মনে করেছেন। ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর সর্বাপেক্ষা অপছন্দ, এ-জন্যে তিনি গোঁড়া ধার্মিককে দেশপ্রেমিক হিসেবেও স্বীকার করেন নি। তবে ধর্মজীবনের নৈতিকতা, আদর্শ – যা মানবীয় মুক্তির স্বপক্ষে তাকে গ্রহণ করেছেন। ধর্মের সামাজিক অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি অশিক্ষিত ধর্মযাজকদের অনাচার ও অনৈতিকতার উল্লেখ করেছেন।

এস. ওয়াজেদ আলির জাতিভাবনা মুসলিম সমাজকেন্দ্রিক সর্বাংশে না হলেও ধর্ম, কৃষ্টি, ভাষা প্রভৃতি জাতিগত উপাদানগুলো অস্বীকার করেন নি। মূলত তিনি ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় হিন্দু-মুসলমান সমস্যাটি সামনে রেখেই জাতিভাবনার আদর্শটি স্থির করেছিলেন। সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে জাতি তার গুরুত্ব নিয়ে অবস্থান করে এবং তখন সকল সম্প্রদায়কে একাত্ম হতে হয়। অবশ্য এখানেও অস্তিত্ব বিলোপের প্রশ্ন আসে না, স্বতন্ত্র অবস্থানে থেকেই মৌলিক কিছু উপাদানের ভিত্তিতে একাত্মতা অনুভব করা যায়। মুসলিম সমাজ ভারতীয় জাতির অংশ হলেও তাদের স্বতন্ত্র চিন্তাকেও তিনি অস্বীকার করেন নি। এ-সমাজের কল্যাণ কামনায় তিনি নিবিষ্ট চিত্তে যাবতীয় সমস্যার সমাধান সন্ধান করেছেন। ভৌগোলিক বাস্তবতা, ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি জাতি গঠনের অন্যতম উপাদান বিবেচনা করতে গিয়েই তিনি সর্বপ্রথম বাঙালির জাতি-স্বাতন্ত্র্য অনুভব করেছেন।

রাষ্ট্র সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলি স্বতন্ত্র তত্ত্ব আবিষ্কার করেন নি। তবে বাঙালি মুসলমান ও ভারতীয় জনগোষ্ঠীর জন্যে উপযোগিতামূলক রাষ্ট্রচিন্তা তাঁর ছিলো। তিনি একক ভারতীয় রাষ্ট্রাদর্শের বিরোধী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে চাপিয়ে দেয়া জবরদস্তিমূলক ক্ষমতাপ্রয়োগ-যন্ত্র হিসেবে মানতে চান নি। তাঁর মতে, রাষ্ট্র গঠনের জন্যে ভৌগোলিক একত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের কথা বিবেচনা করতে হবে, তেমনি দেখতে হবে জনগোষ্ঠির কৃষ্টি ও ভাষা। তিনি জাতীয়তার ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠনের পক্ষপাতি। এ জন্যে ভারতীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভিত্তিতে বিভক্ত ও সম্মানের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ধর্মের সম্পর্ক অস্বীকার করেছেন, কেননা তাতে ধর্ম ও রাষ্ট্র কারোই মর্যাদা রক্ষিত হয় না। এ ছাড়াও তিনি ভারতীয় ব্যবস্থায় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকে স্বীকার করেন নি।

শিল্পী হিসেবে এস. ওয়াজেদ আলি সামাজিক দায়িত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। শিল্পসর্বস্বতাবাদ তাঁর সাহিত্যকর্মে স্থান পায় নি। মানুষের মঙ্গলের জন্যেই সাহিত্যকর্ম। সমাজের যাবতীয় অনাচার-অবিচার, অসত্য-অশিক্ষাকে দূরিভূত করার চেষ্টা শিল্পী-সাহিত্যিককে একজন সমাজ-সংস্কারকের মতোই চালিয়ে যেতে হবে।

এস. ওয়াজেদ আলি তাঁর গদ্যচর্চায় সর্বাধুনিক রীতিকে অত্মস্থ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। সমকালীন আধুনিক গদ্যচর্চার ক্ষেত্রে 'সবুজপত্রে'র মাধ্যমেই তাঁর সাহিত্য ক্ষেত্রে পদার্পণ। তাঁর গদ্যে চলিতরীতির ব্যতিক্রম কখনোই ঘটে নি। প্রবন্ধের যে যৌক্তিক পারম্পর্য তা তাঁর গদ্যের কাঠামোতে শব্দ প্রয়োগের অনিবার্যতায় নিশ্চিত হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ নয়, সামাজিক একটা দায়িত্ব নিয়ে লেখনি ধারণ করতে গিয়ে তর্ক-বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। সেই তর্ক কখনোই বহির্মুখী চটুল চমৎকারিত্বে পর্যবসিত হয় নি ; বরং বিষয়কে আত্মস্থ করার ফলে গদ্যে এসেছে স্থির প্রাজ্ঞতা। অন্তর্গত বিবেচনা, যুক্তিবিন্যাস তাঁকে শব্দ ও বাক্যের পরিমিত ব্যবহারে উৎসাহী করেছে। ফলে দৃঢ় কাঠিন্য তাঁর গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিষয়ের সামাজিকায়নের জন্যে প্রায়শ পরিভাষা তৈরিতে

Dhaka University Institutional Repository

মনোনিবেশ করতে হয়েছে তিনি মূলত তৎসম শব্দবহুল গদ্যে আকৃষ্ট হলেও বিষয়ানুসারে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন নি।

সৃষ্টিশীল প্রতিভা এস. ওয়াজেদ আলি ছোটগল্প রচনায়ও কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমকালীন ছোটগল্প ধারায় তাঁর গল্প আবেগ-পরিমিতি ও যুক্তিনিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রাবন্ধিকের লেখা ছোটগল্প হিসেবে তা যেমন বিবেচ্য হতে পারে, তেমনি তার শিল্পমূল্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। মুসলিম সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা তাঁর গল্পেও স্বীকৃত। ফলে গল্পের জীবন-উপকরণ প্রধানত গৃহীত হয়েছে মুসলিম সমাজের নানা বাস্তবতা, ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে। এর মধ্য দিয়ে তিনি সমকালীন অন্ধতা ও কুসংস্কার থেকে যেমন উদ্ধারের পথ সন্ধান করেন, তেমনি ঐতিহ্যের উদাহরণে সমকালকে জাগ্রত করতে উৎসাহী। তাঁর গল্পে বাস্তব জীবনের উপস্থাপন আছে, আছে বাস্তব ও কল্পনার সৃষ্টিশীল মিশ্রণ। তবে তিনি রূপকধর্মী গল্পে সর্বাপেক্ষা প্রেরণা অনুভব করেছেন। ফলে তাঁর গল্পের তিনটি পর্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে : বাস্তবধর্মী গল্প, ভাবধর্মী গল্প এবং চিন্তনপ্রধান গল্প।

গল্পের শিল্প সৌকর্য নিয়েও এস. ওয়াজেদ আলি সচেতন ছিলেন। তিনি বাস্তবধর্মী গল্পে বর্ণনার সরলতা, চরিত্রের পূর্ণাঙ্গতার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাবধর্মী গল্পে আত্মস্থ থেকেছেন রূপকী আবরণে। অন্যদিকে গল্পে প্রবেশ ঘটেছে যুক্তিতর্ক, তত্ত্ব-দর্শন। মনে হয় যেন, যা কিছু প্রবন্ধে প্রকাশ করেন নি, তা সৃষ্টিশীল পথে গল্পের রূপ নিয়েছে। তাঁর গল্পে রূপকথার ভঙ্গিটি চমৎকারভাবে ব্যবহৃত হয়েছে – তা কখনো এসেছে গদ্যের চলমানতায়, আবার কখনো মোটিফের ক্ষেত্রে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনীতেও এস. ওয়াজেদ আলির সৃষ্টিশীল ও ইতিহাস সচেতন দায়বদ্ধ শিল্পী-মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের কাঠামো রক্ষা করেই কল্পনার সহায়তা নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রস-নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন। ভ্রমণ কাহিনী কেবল ব্যক্তিগত কথকতায় পরিণত হয় নি। তা ঐতিহাসিক নিরিখে এস. ওয়াজেদ আলির সামাজিক দায়িত্ব পালনেরও অংশ।

এস. ওয়াজেদ আলি আমৃত্যু যে সামাজিক অন্ধতা-রুদ্ধতার বিরুদ্ধে লেখনি চালনা করেছেন, সে-সামাজিক পরিস্থিতি থেকে আমরা এখনও সর্বাংশে উত্তীর্ণ হতে পারি নি। আজকের বাস্তবতায় ধর্মীয় কুসংস্কার ও রাষ্ট্রধর্মের অপব্যবহার অনুধাবন প্রতিরোধে এস. ওয়াজেদ আলি প্রাসঙ্গিক নিঃসন্দেহে। তিনি যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চর্চায় আস্থা রেখেছিলেন তা আজও আমাদের অনেকাংশে অর্জিত হয় নি। দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এস. ওয়াজেদ আলি বাঙালির স্বতন্ত্র রাষ্ট্রকাঠামোর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অস্তিত্বে প্রমাণিত। আমাদের বিজ্ঞানমনস্কতা, উদারমানবিকতা, গণতান্ত্রিকতাবোধ – সর্বোপরি আত্ম-আবিষ্কার প্রবণতার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে এস. ওয়াজেদ আলির নিকট ঋণ স্বীকার ব্যতীত উপায় নেই।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

ক. আলোচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থ

জীবনের শিল্প

জীবনের শিল্প-এর প্রকাশক ডাঃ এস আমজেদ আলি; প্রোপাইটার—গুলিস্তাঁ পাবলিশিং হাউস; ৪৮ ঝাউতলা রোড, পার্ক সার্কাস, কলকাতা। ২১, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ক্লাসিক প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার কর্তক মুদ্রিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১+২+২৬৬। মূল্য: ১।। (এক টাকা আট আনা মাত্র)

গ্রন্থে প্রকাশকাল মুদ্রিত হয় নি; নিবেদন-পত্র কিংবা ভূমিকাও নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুসারে জীবনের শিল্প-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে।

জীবনের শিল্প গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে ২৬টি প্রবন্ধ। পুস্তকের প্রবন্ধ সমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ:

"সাহিত্য; বাঙ্গালী মুসলমান; মুসলমান ও বাঙ্গালা সাহিত্য; নারী ও সমাজ; শিক্ষার আদর্শ; তরুণ ও প্রবীণ; তরুণের কাজ; মোস্‌লেম নারী; অতীতের বোঝা; নির্দোষ আমোদপ্রমোদ ও মুসলমান; মোসলেম ও কাফের; তুর্কি হানুম; বিহারের ভূমিকম্প ও পর্দা প্রথা; হাজি মোহসেন; তুর্কি শিশুর পাঠ্য; তাজপুর ইনষ্টিটিউট; ধর্ম্মের প্রচার; মিঃ আমীর আলী: সভ্যতার কষ্টিপাথর, গণ-সেবায় ইসলাম; সাহিত্য সম্বন্ধে দুচার কথা; একবাল; বাগান; বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যসমস্যা; জীবনের শিল্প: কোরানের ব্যাখ্যা।"

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

প্রকাশক ডি.বসু; ৩৬ নং মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা। প্রিন্টার: বিণয়ভূষণ ঘোষ; ললিত প্রেস, ৫ মদন মিত্র লেন, কলকাতা। প্রাপ্তিস্থান: দি বুক হাউস, ১৫ নং কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা। পৃষ্ঠা: ৪+২+১৫৪। মূল্য: ১।। গ্রন্থে প্রকাশের তারিখ মুদ্রিত হয় নি। তবে উৎসর্গপত্রের তারিখ অনুসারে *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য*-এর প্রকাশকাল ১৯৪৩ (১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩৫০ সাল) খ্রিস্টাব্দ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য গ্রন্থে ৩৩টি রচনা স্থান পেয়েছে। সূচিপত্র নিম্নরূপ: "সাকী ও কবিতা; নদী; সমুদ্রের কথা; মাছধরা; পটভূমিকা; কবির প্রেরণা, চাঁদমামার ভরসা; জীবনে প্রকৃতির প্রভাব; পিক্‌নিক; এভারেষ্ট পর্ব্বতের কথা; প্রদীপ ও পতঙ্গ, একটা স্বপ্ন; ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক; হেরেম মহিলা; একটী গল্প; জীবনে শিল্পের স্থান; মুক্তমানব; প্রাচ্য ও প্রতীচ্য; প্রকৃতির কবিত্ব; চলার শেষ; ভিক্ষুক; রাজর্ষি মার্কাস অরেলিয়াস;স্মৃতির ফসল; শিল্পী আর মহাশিল্পী; রেলভ্রমণ; পাহাড় ও প্রান্তর; সাধনার লক্ষ্য; বাক্যালাপ; অজেয় সোনালী ঈগল; বোকামীর চূড়ান্ত; মসজিদ; বাংলার প্রকৃতি, বাদলের দিন; বেড়ানর আনন্দ।"

উৎসর্গ পত্র অনুরূপ: উৎসর্গ পত্র/ জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লার হাতে আমার *প্রাচ্য ও প্রতীচ্য* দিলাম/ ১৩ই অগ্রহায়ণ/ ১৩৫০ সাল/ বাবা।

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যতের বাঙালী

ভবিষ্যতের বাঙালী প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। প্রকাশক: শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি.এ; প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১ বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা। প্রিন্টার শ্রীফণীভূষণ রায়, প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ, ৫২-৩ বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা। পৃষ্ঠা: ১+২+১১২। মূল্য: দেড় টাকা।

*ভবিষ্যতের বাঙালী*র বিষয়বস্তু ৭টি প্রবন্ধে বিন্যস্ত —'ভবিষ্যতের বাঙালী' 'রাষ্ট্রের রূপ', 'রাষ্ট্র ও নাগরিক', 'হিন্দু-মুসলমান', 'ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য', 'প্রেমের ধর্ম্ম' ও 'জাতীয় জাগরণ'। এর মধ্যে 'হিন্দু-মুসলমান' এবং 'রাষ্ট্র ও নাগরিক' প্রবন্ধ দুটি যথাক্রমে প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষ-এর ফাল্গুন ১৩৪৭ ও আষাঢ় ১৩৪৯ সংখ্যায়।

প্রবর্তক পাবলিশার্স কর্তৃক *ভবিষ্যতের বাঙালী*-এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ১৯৪৪; তৃতীয় মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৪৪; চতুর্থ মুদ্রণ জানুয়ারি ১৯৪৬। চতুর্থ মুদ্রণের পৃষ্ঠা সংখ্যাও প্রথম অনুরূপ: ১+২+১২২। মূল্য: দেড় টাকা।

আকবরের রাষ্ট্রসাধনা

প্রকাশক; ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'দি সিটি বুক কোম্পানী', ১৫ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ; ৫২-৩ বহু বাজার স্ট্রিট, কলকাতা থেকে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্তক মুদ্রিত। প্রথম সংস্করণ: ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা। ২+১৫২। মূল্য: এক টাকা বারো আনা।

আকবরের রাষ্ট্রসাধনা "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫২ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের বাংলা দ্রুত-পাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত" হয়।

মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ

মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'ইতিকথা বুক ডিপো' থেকে। প্রকাশক: কাজী আকামউদ্দীন, ইতিকথা বুক ডিপো, ৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলেজ স্কয়ার, কলকাতা। প্রিন্টার: শ্রীবলদেব রায়, দি নিউ কমলা প্রেস, ৫৭/২ কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা। মূল্য: দুই টাকা মাত্র।

গ্রন্থে প্রকাশকাল মুদ্রিত হয় নি। এ-গ্রন্থের প্রিন্টার্স লাইনের পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা মুদ্রিত হয়েছে। তালিকার ৩ সংখ্যক গ্রন্থের নাম *আকবরের রাষ্ট্র -সাধনা; আকবরের রাষ্ট্র-সাধনার* প্রকাশকাল ১৯৪৯। সুতরাং প্রকাশক্রম-অনুসারে *মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, আকবরের রাষ্ট্র সাধনা*-এর পরবর্তী গ্রন্থ।

ইকবালের পায়গাম

প্রকাশক: ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, দি সিটি বুক কোম্পানী, ১৫ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। তারকানাথ প্রেস, ৯ নং ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা থেকে শ্রীবিমলকুমার ব্যানার্জি কর্তক মুদ্রিত। পূর্ব-পাকিস্তানের একমাত্র পরিবেশক: নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৫ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল নেই। পৃষ্ঠা: ১+৪+১২৩। মূল্য: দেড় টাকা মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

ইক্‌বালের পায়গাম গ্রন্থকার-প্রতিষ্ঠিত গুলিস্তাঁ মাসিক পত্রে 'একবালের পায়গাম' শিরোনামায় প্রথম বর্ষ (১৩৪০) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। *ইকবালের পায়গাম* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'ইক্‌বাল', প্রকৃতপক্ষে জীবনের শিল্প গ্রন্থ– অন্তর্গত 'একবাল' প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ মাত্র। গ্রন্থটির অধ্যায়-শিরোনামা নিম্নরূপ: প্রথম অধ্যায়: ইক্‌বাল, দ্বিতীয় অধ্যায়: ইক্‌বাল-দর্শন, তৃতীয় অধ্যায়: ইক্‌বালের ধর্ম: চতুর্থ অধ্যায়: মুসলিম ও মিল্লাত।

খ. আলোচিত গল্প-গ্রন্থ

গুল-দাস্তা

ইসলামিয়া আর্ট প্রেস, ১৩৮ বড়েয়া রোড, কলিকাতা থেকে মুহম্মদ শামসুদ্দীন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৩৩৪ সাল (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ)। এন্‌টিক কাগজে ছাপা পৃষ্ঠা: ২+১+১২৩: মূল্য একটাকা।

গুল-দাস্তায় ১০টি গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর অধিকাংশ গল্প বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। নিম্নে তালিকা দেয়া হলো :

জমিলা	সওগাত	আষাঢ় ১৩৩৩
ভাই	ইসলাম দর্শন	পৌষ ১৩৩২
রাজা	ইসলাম দর্শন	অগ্রহায়ণ ১৩৩২
ভাঙ্গাবাঁশী	বঙ্গবাণী	মাঘ ১৩৩২
কবির কিসমৎ	ভারতবর্ষ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৪
মেয়ে	সাহিত্যিক	পৌষ ১৩৩৩

গুল-দাস্তা প্রকাশিত হওয়ার পরের বৎসর ১৩৩৫ -এর কার্তিক সংখ্যার সওগাত 'নিকষমণি' শীর্ষক গ্রন্থ পরিচয় বিভাগে নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করা হয়:

> – ইহাতে দশটা ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ ওয়াজেদ আলি চিন্তাশীল রসজ্ঞ লেখক্‌ই গ্রন্থের গল্পগুলি পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ভাল গল্পলেখক মুসলমান সাহিত্যে এক রকম নাই বলিলেই চলে। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন আছেন, তন্মধ্যে মিঃ ওয়াজেদ আলি অন্যতম। আমরা এই সুন্দর গল্পগ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

মাশুকের দরবার

প্রকাশক: এস. ওয়াজেদ আলি, ৫২ লোয়ার সারকুলার রোড, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৩০ (১৩৩৭সাল)। পৃষ্ঠা: ৪+১১৭। মূল্য: এক টাকা। গ্রন্থটির 'তৃতীয় সংস্করণ' প্রকাশ করেন—কাজী আকাম উদ্দীন, ইতিকথা বুক ডিপো, ৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলেজ স্কয়ার, কলকাতা। মুদ্রক: শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, বসাক প্রিন্টিং ওয়ার্কস: ১২৭ নং মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা। প্রকাশকাল নেই। প্রষ্ঠা: ৪+১১৮। মূল্য: এক টাকা বারো আনা।

গ্রন্থের সূচিপত্র : "মাশুকের দরবার, ভারতবর্ষ, মাতাল, চাঁদের আলো, চণ্ডুর আড্‌ডা, গালিভারের নিদ্রাভঙ্গ, বিরহ, বসন্তের বধূ, ছবির কথা, গোলাপের কথা, প্রেমের পুষ্পরথ, কিউপিডের দুষ্টামি, পূর্ব্বাভাষ, কালি ও কলম, শুভদৃষ্টি, অনুশোচনা, অভিমান, আদর্শ প্রেম, মুক্তির গান।"

Dhaka University Institutional Repository

মাশুকের দরবার-এর ভূমিকা হিসেবে শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত 'পরিচয়' প্রথম সংস্করণ থেকে মুদ্রিত এসেছে।

দরবেশের দোয়া

প্রকাশক: গ্রন্থকার, ৫২ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৮ সাল)। পৃষ্ঠা ১+১২৩। মূল্য: এক টাকা।

দরবেশের দোয়া-এর প্রথম সংস্করণে ৫টি গল্প সংযোজিত হয়েছিল; গল্পগুলি হলো 'দরবেশের দোয়া', 'ফেরেশতাদের কলহ', 'নবীদর্শন, 'প্রেমের মোসাফের', ও 'প্রচারক'।

দরবেশের দোয়া-এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সালে। প্রকাশক: কাজী আকাম উদ্দীন, ৮/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। মুদ্রাকর: শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়, বসাক প্রিন্টিং ওয়ার্কস;১২৭ নং মসজিদ বাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা। পৃষ্ঠা: ১+৪+১৬৭+৪। মূল্য: ২ টাকা মাত্র। তৃতীয় সংস্করণে ৪টি গল্প সংযোজিত হয়েছে; 'তরুণ আরব' ও 'সুরাটের কাফিখানা' নতুন; এবং 'পৌত্তলিক' ও 'তারা' গল্প-দুটি পুরাতন। পুরাতন গল্পদুটি গুল-দাস্তা (১৩৩৪ সাল) গল্পগ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।

দরবেশের দোয়া-এর উৎসর্গ-পত্র নিম্নরূপ:বাপজি/ও/মা'র খেদমতে! শিক্ষা, দীক্ষা, এমনকি জীবনের জন্যও/ যাঁদের অপরিশোধনীয় ঋণে আমি ঋণী,/ তাঁদের কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ব্যর্থ চেষ্টা/ না করাই ভাল/ গ্রন্থকার

ভাঙ্গাবাঁশী

ভাঙ্গাবাঁশী ডি.এম, লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল মুদ্রিত হয় নি। প্রকাশক: শ্রীগোপাল দাশ মুজুমদার। মুদ্রাকর: শ্রীগুরুদাস বসু, প্রবর্তক প্রিন্টিং এণ্ড হাফটোন লিঃ, ৫২-৩ বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা। পৃষ্ঠা: ১+৪+১১২। মূল্য: দুই টাকা মাত্র।

ভাঙ্গাবাঁশীতে, অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১১টি গল্প। সূচিপত্রের প্রথম ৮টি গল্প—'ভাঙ্গাবাঁশী', 'কবির কিসমৎ', 'বিবাহ', 'রোস্তম খাঁ', 'জমিলা', 'ভাই', 'রাজা', ও 'মেয়ে' গৃহীত হয়েছে লেখকের গুল-দাস্তা (১৩৩৪) পুস্তক থেকে। এ-গ্রন্থে নতুন সংযোজিত হয়েছে, 'আফ্রিদি তরুণী,' 'মোহ-মুক্তি', 'মিলন'–এই ৩টি গল্প।

গ. আলোচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী

গ্রানাডার শেষ বীর

প্রকাশক: মঈনউদ্দীন হোসায়েন বি.এ.; নূর লাইব্রেরি, ১২/২ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ: ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকশিত হয় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশক: মঈনউদ্দীন হোসায়েন বি.এ.; নূর লাইব্রেরি। মুদ্রাকর: শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি.এ., শ্রী সরস্বতী প্রেস লিঃ, ৩২ নং আপার সারকুলার রোড, কলকাতা। পৃষ্ঠা: ১+১+৮৬+২। মূল্য: বার আনা।

Dhaka University Institutional Repository

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তক ১৯৪০ সনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্রুতপঠন পাঠ্যরূপে নির্বাচিত (৫/১২/১৯৪০ কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য'- *গ্রানাডার শেষ-বীর* পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্রের শীর্ষে এ বাক্যটি মুদ্রিত হয়। *গ্রানাডার শেষ বীর* সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এস. ওয়াজেদ আলি প্রতিষ্ঠিত'গুলিস্তা পত্রিকায় (২৯ চৈত্র ১৩৪১ সংখ্যা থেকে)।

পশ্চিম-ভারতে

প্রকাশক: বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড। স্বত্ত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরি। ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। ৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ। স্কুল সাপ্লাই বিল্ডিংস, ঢাকা। মুদ্রাকর: শ্রী গৌরচন্দ্র পাল, নিউ মহামায়া প্রেস, ৬৫/৭ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা। মূল্য: এক টাকা। প্রথম সংস্করণ: ১৩৫৫।

পশ্চিম ভারতে ভ্রমণকাহিনী গুলিস্তাঁ পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫১ সংখ্যা থেকে) পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রসমূহ হলো: 'আজমীর শরীফ, কুতুবমিনার, দেওয়ানে খাস, দেওয়ানে আম, মতি মস্‌জিদ, আকবরের সমাধি, তাজমহল।'

উৎসর্গ/ তরুণ বন্ধু অনিলকুমার দেব এই সফরে আমার অন্যতম/ সঙ্গী ছিলেন। স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ/ এই পুস্তকটি তারই নামে উৎসর্গীকৃত হইল। কলিকাতা ২৪/৮/৪৮। এস. ওয়াজেদ আলি।

মটর যোগে রাঁচির সফর

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর, বৃন্দাবন ধর বুক হাউস, ২/১এ নয়ান সুর লেন, কলকাতা-৫; ৩/৮ জনসন রোড, ঢাকা। প্রিণ্টার: শ্রীমধুসূদন নাগ, বৃন্দাবন ধর, প্রিন্টিং হাউজ, ২/১ এ নয়ান সুর লেন, কলকাতা-৫। প্রথম সংস্করণ ১৯৪৯। পৃষ্ঠা : ২+৪৫। মূল্য: চৌদ্দ আনা।

মোটরযোগে রাঁচির সফর-এর প্রথম কিস্তি ১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যক *ইসলাম দর্শন* পত্রিকায় মুদ্রিত হয়, অতঃপর তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। তৎসত্ত্বেও পরের বৎসর ঐতিহাসিক স্থানসমূহের চিত্র সম্বলিতহয়ে *মোটরযোগে রাঁচির সফর* ধারাবাহিকভাবে *সওগাত*-এ (কার্তিক ১৩৩৫-ফাল্গুন ১৩৩৫) প্রকাশিত হয়। মুদ্রিত চিত্রসমূহ হলো: 'হাওড়া পুল, হাওড়া স্টেশন, বালি (পাটকলের দৃশ্য), চন্দননগর গবর্নমেন্ট হাউস, বর্ধমান শহরের নবনির্মিত প্রবেশদ্বার স্টার অব ইন্ডিয়া, আসানসোল।'

আলোচিত গ্রন্থাবলি পরিচয়

ক. প্রবন্ধ

আকবরের রাষ্ট্র সাধনা

প্রকাশক: ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, দি সিটি বুক কোম্পানী, ১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলিকাতা প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিঃ, ৫২-৩, বহুবাজার স্ট্রীট্, কলিকাতা থেকে শ্রীফণিভূষণ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। প্রথম সংস্করণ : ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ। পৃষ্ঠা সংখ্যা: ২+১৫২; মূল্য: একটাকা বারো আনা।

Dhaka University Institutional Repository

আকবরের রাষ্ট্র সাধনা 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৫২ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের বাংলা দ্রুতপাঠ্য পুস্তকরূপে অনুমোদিত' হয়।

মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ

মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইতিকথা বুক ডিপো থেকে। প্রকাশক : কাজী আকামউদ্দীন, ইতিকথা বুক ডিপো, ৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কয়ার কলিকাতা। প্রিণ্টার: শ্রীবলদেব রায়, দি নিউ কমলা প্রেস, ৫৭/২ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুইটাকা মাত্র।

গ্রন্থে প্রকাশকাল মুদ্রিত হয় নি। এ গ্রন্থের প্রিণ্টার্স লাইনের পরবর্তী পৃষ্ঠায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলীর একটি তালিকা মুদ্রিত হয়েছে। তালিকার ৩ সংখ্যক গ্রন্থের নাম *আকবরের রাষ্ট্র সাধনা; আকবরের রাষ্ট্র সাধনার* প্রকাশকাল ১৯৪৯। সুতরাং প্রকাশক্রম অনুসারে *মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ, আকবরের রাষ্ট্র সাধনার* পরবর্তী গ্রন্থ।

আব্দুল কাদির তাঁর 'এস. ওয়াজেদ আলি' শীর্ষক প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন:

> সূফীর কাম্য Life Divine, স্বর্গীয় জীবন। আল্লাহর সাযুজ্যলাভ সূফী সাধনার মর্ম কথা। সূফী সাধকের জীবনে ধর্মের গোঁড়ামি নাই, আচারের অত্যাচার নাই, অন্ধ গতানুগতিকতার বালাই নাই, অজ্ঞতাপ্রসূত কুসংস্কার নাই। কোনো প্রকার জাত্যাভিমান নাই। সূফীর মহৎ লক্ষ্য: মানবপ্রীতি ও মানবতা প্রীতি,—অন্তরের আলোকিত আসনে আল্লাহর পবিত্র দীদার লাভ। পৌত্তলিকতা এবং প্রতীক প্রীতিকেও সূফী সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে। "ভক্তের পৌত্তলিকতার কুসংস্কারপূর্ণ নিবেদনও খোদার প্রিয় বস্তু— উজ্জ্বলতর সত্যকে দেখবার সৌভাগ্য যদি তার না হয়ে থাকে," —এই মহাসত্যটি মওলানা জালালুদ্দিন রুমী তাঁর মসনভী'তে মুসা ও মেষপালকের কাহিনীতে অতি সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন; সেই কাহিনীটিকে এস. ওয়াজেদ আলি তাঁর *মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ* পুস্তকে সবিস্তারে বিবৃত করেছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, রূপকপুজারী মেষপালক পরিশেষে 'সাদরাতুল্ মানতাহা' (দৃশ্যমান বিশ্বের শেষ প্রান্ত) অতিক্রম করে অমৃতময় আত্মিক জীবনের মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ লাভ করেছে।... [উত্তরাধিকার, ৫: ৩-৪, মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৭]

ইক্‌বালের পায়গাম

প্রকাশক: ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, দি সিটি বুক কোম্পানী, ১৫ নং চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। তারকনাথ প্রেস, ৯নং ম্যাঙ্গো লেব্যন, কলিকাতা থেকে শ্রীবিমল কুমার ব্যানার্জী কর্তৃক মুদ্রিত। পুর্ব-পাকিস্তানের পরিবেশক—নওরোজ কিতাবিস্তান, ৪৬ বাংলাবাজার, ঢাকা। প্রকাশকাল নেই। পৃষ্টা: ১+৪+১২৩। মূল্য: দেড় টাকা মাত্র।

ইকবালের পায়গাম গ্রন্থকার প্রতিষ্ঠিত গুলিস্তা মাসিক পত্রে ইকবালের পায়গাম শিরোনামায় প্রথম বর্ষ (১৩৪০) থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। *ইকবালের পায়গাম* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় 'ইক্‌বাল', প্রকৃতপক্ষে *জীবনের শিল্প* গ্রন্থ অন্তর্গত 'একবাল' প্রবন্ধের পূণর্মুদ্রণ মাত্র।

এস. ওয়াজেদ আলির ইকবাল চর্চা সম্পর্কে, ১৩৫৮ এর ভাদ্র সংখ্যার মাহে নও 'মরহুম ওয়াজেদ আলি' শীর্ষক প্রতিবেদনে নিম্নরূপ মন্তব্য করে:

Dhaka University Institutional Repository

...পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'গুলিস্তাঁ' নামক মাসিক কাগজের মারফত ওয়াজেদ আলি সাহেবই বাংলাদেশে আল্লামা ইকবালের বাণী প্রচারের পহেলা কোশেশ করেন।...

খ. গল্প

মাশুকের দরবার

প্রকাশক: এস. ওয়াজেদ আলি, ৫২ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ: সেপ্টেম্বর ১৯৩০ (১৩৩৭ সাল) পৃষ্ঠা: ৪+১১৭; মুল্য —এক টাকা। গ্রন্থটির 'তৃতীয় সংস্করণ' প্রকাশ করেন— কাজী আকম উদ্দীন, ইতিকথা বুক ডিপো, ৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কয়ার, কলিকাতা। মুদ্রক: শ্রীসুধীর চন্দ্র রায়, বসাক প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১২৭ নং মস্‌জিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশকাল নেই। পৃষ্ঠা: ৪+১১৮; মূল্য—এক টাকা বারো আনা।

মাশুকের দরবার-এর ভূমিকা হিসেবে শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত 'পরিচয়' প্রথম সংস্করণ থেকে মুদ্রিত হয়ে আসছে। নিম্নে তা সংকলিত হলো:

> শ্রীযুক্ত এস, ওয়াজেদ আলি বি.এ, (ক্যান্টার) মহাশয়ের লেখা গল্প গুলি আমার বড় ভালো লাগে। গল্পগুলিতে জ্ঞান আছে, বস্তু আছে, এবং গল্পবলিবার কৌশলটুকু ওয়াজেদ আলি সাহেব বেশ জানেন। তিনি সুপণ্ডিত কিন্তু তাঁর রচনায় পণ্ডিত্যের হুঙ্কার নাই, ইব্‌সেন হামশুনকে বাঁধিয়া মারিবার কসরৎ নাই। হাল্‌কা ঝরঝরে ভাষায় ভাবের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, অজস্র, বেশ স্বচ্ছন্দ মুক্ত ধারায়! রচনায় thoughtআছে, তা সত্যই too deep for tears, মানব-চিত্ত নিমেষে তাহা স্পর্শ করে। রচনার সার্থকতা এইখানে।
>
> তাঁর রচিত "গুলদাস্তা" পড়িয়া এই কথাই মনে হইয়াছিল। "গুলদাস্তা"র গল্পগুলিতে প্লট ছিল বিচিত্র এবং তার প্রকাশের ভঙ্গীও ছিল মনোরম। "মাশুকের দরবার" বইখানিতে যে "গল্প" গুলি বাহির হইয়াছে, তার সবগুলিতে বেশ "লাগসৈ" প্লট নাই; কিন্তু গল্পের যা প্রাণ, মৃদু ইঙ্গিতে জীবনের সুখদুঃখের আভাস জাগাইয়া তোলা... "মাশুকের দরবারের" প্রতি গল্পে সেই প্রাণ বিদ্যমান আছে। প্রত্যেকটি গল্প প্রাণের দরদে আগাগোড়া ভরা। তবে এগুলিকে বোধ হয় ঠিক গল্প বলা চলে না। এর জুড়ি পাই টুর্গেনিভের prose poems নামক রচনায়। দু'চারটি রচনা লইয়া আলোচনা করিলে আমাদের কথা বুঝা যাইবে।
>
> প্রথম গল্প—"পূর্ব্বাভাষ"। স্টীমারে চড়িয়া নায়ক চলিয়াছেন। নদীর তীরে আশেপাশে গ্রামের নরনারীর কাজকর্ম, অলসভাবে বসিয়া থাকা, ছেলেদের ছুটোছুটি—এগুলি যেমন দেখিয়াছেন, তেমনি বলিয়া গিয়াছেন—সেগুলি যেন নিখুত ফটো! আমাদের চোখের সামনে দুষ্টু ছেলেদের দৌরাত্ম্য ঘোমটায় মুখঢাকা বধূর কলসীতে জল ভরিতে ভরিতে ঘোমটার আড়ে ষ্টীমার দেখা, লাঙ্গল লইয়া চাষার মাঠচষা—এগুলি একেবারে সজীব হইয়া ওঠে। এদের এই হাসিখেলা দেখিয়া লেখক বলিতেছেন—"বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কত অল্প ঠাঁই নিয়েই এরা সন্তুষ্ট! জীবনের কর্মকোলাহল থেকে অতি দূরে অবস্থিত ঐ গণ্ডগ্রামে এরা জন্মেছে, আর এই গন্ডগ্রামেই এরা মরবে। বাহিরের জগৎ কখনো এদের নামও শুনবে না, আর এদের গাঁয়ের নামও শুনবে না।" চমৎকার! মনস্তত্ত্বের অনেক সত্য এই কটি ছত্রে আশ্চর্য সহজভাবে ব্যঞ্জিত হইয়াছে। শেষে গাছের ছায়ায় ঐ যে ছেলেটি "উপুড় হয়ে শুয়ে নদীর স্রোতের দিকে চাহিয়াছিল! গাছের ডালে পাখির আনন্দ কররব, নদীর ঢেউ, বয়স সুলভ সারল্য-বশে সে সবের পানে সে চাহিতে

Dhaka University Institutional Repository

জানে না— মন তার কোথায় কোন দূর-দূরান্তে চলিয়াছে!" এ ছেলেটির এই স্বাতন্ত্র্য লেখক লক্ষ্য করিয়াছেন! এই লক্ষ্য করাতেই তাঁর দরদী প্রাণের পরিচয় পাই।

ষ্টীমারে চড়িয়া অনেকেই বেড়ান, কিন্তু এমন করিয়া দেখার চক্ষু এবং দেখিয়া এ-ভাবে তা ভাষায় ফুটাইবার শক্তি আমাদের ক'জনের আছে!

"প্রেমের পুষ্পরথ" – প্রাণের চমৎকার ছবিটুকু। প্রথম প্রণয়ে উচ্ছ্বসিত-চিত্ত প্রেমিক-প্রেমিকা পথে চলিতেছিল, নয়নে তাদের হাসির মাধুরি ... প্রেমের পুষ্প রথে চড়িয়া আনন্দ-লোকে চলিয়াছে! গতির বিরাম নাই, যাত্রীদের মনে ভয় নাই, ভাবনা নাই। ক'মাস পরে পথ চলা আছে, কিন্তু সে বাহুতে-বাহুতে মালা গাঁথার স্পৃহা নাই! তারা পাশাপাশি চলে না। তরুণ চলিয়াছে আগে আগে, আর দশ-পনেরো হাত পিছনে তরুণী! "পুষ্পপথে'র গতি আজ স্বচ্ছন্দ নয়। তারপর ? মুখে অকারণ আনন্দের সে অফুরাণ হাসির লেশমাত্র নাই! হায়রে, সে পুষ্পরথ আজ যেন মেরামত করা একখানা গাড়ীমাত্র! আনন্দলোকে পৌছাইয়া দেবার তার সাধ্য কি! তারপরে? তরুণ একা পথে চলে, তরুণী সঙ্গে নাই! পুষ্পরথ তবে অচল হইয়াছে! তাই হয়। কবিও বলিয়াছেন – "সুখ-দিন হায় যবে চলে যায়, আর ফিরে কভু আসে না।" পুলকের হাসি নিমেষের ; চিরদিন দীর্ঘশ্বাসের বোঝা লইয়াই নর-নারীর দিন কাটে। এই সনাতন সত্য লেখক অপরূপ কৌশলে এত মৃদু ইঙ্গিতে বুঝাইয়াছেন, আর সে ইঙ্গিতে এমন কবিত্ব যে প্রাণে চিরদিনের জন্য রেখাপাত করে! লেখার আর্ট ইহাকেই বলে!

"ভারতবর্ষ" – গল্পটি অভিনব সৃষ্টি! অল্প পরিসরে এক মুদির ছোট্ট কথাটুকু – তাও তার কাজ-কারবার, লাভ-লোকসান বা সুখ-দুঃখ লইয়া নয়। ছোট দোকানে বসিয়া মুদি রামায়ণ পড়ে, নাতি-নাৎনীরা শোনে ; মুদির ছেলে অদূরে বসিয়া সওদা বেচে – দোকান-ঘরখানি খোলার, ঘরে তেলের প্রদীপ জ্বলে। পঁচিশ বৎসর পরে পাড়ার চারিদিকে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল – মাঠ কোঠা ভাঙ্গিয়া প্রাসাদ উঠিল, জলা-বস্তীর বুকে পার্ক দেখা দিল, মুদির কিন্তু তেমনি। বুড়া মুদির মৃত্যু হইয়াছে – তার জায়গায় তার ছেলে আজ সেই রামায়ণ খুলিয়া বসিয়াছে এবং তার নাতি-নাৎনীকে পড়িয়া শুনাইতেছে। শুধু এইটুকু কথা।

এমনি স্বচ্ছ অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গী, এমনি ভাবুকতায় এ বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠা পূর্ণ! বাঙলা ভাষায় বিলাতী Sex-সমস্যার ধূমধাড়াক্কার মধ্যে এই বইখানির সরল সহজ ভাষা, তার বিচিত্র ভাব, আর Suggestiveness আমাকে একান্ত মুগ্ধ করিয়াছে ; এবং আমার বিশ্বাস Sex-তত্ত্ব লইয়া যাঁরা মাথা ঘামাইতে বসেন নাই তাঁরাই এই বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইবেন। ভাবিবার অনেক কথা এ বইয়ে আছে। কিন্তু এত কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। জ্যোৎস্না-কিরণ দেখাইতে প্রদীপ ধরা বাতুলতা। ইতি

কলিকাতা
২০শে শ্রাবণ, ১৩৩৭

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

সওগাত-এর ১৩৩৭ শ্রাবণ সংখ্যার 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে *মাশুকের দরবার* সম্পর্কে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করা হয় :

মাশুকের দরবারে ১৯টি গল্প স্থান পাইয়াছে। এগুলিকে ঠিক গল্প বোধ হয় বলে না, —জীবনের সামান্য সামান্য অনুভূতির রেখাচিত্র বলিলেই বোধ হয় শোভন হয়। গ্রন্থের 'পরিচয়' লেখক শ্রী সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় এ-গুলিকে টুর্গেনিভের Prose-poemsএর সঙ্গে তুলিত করিয়াছেন। আমাদের সেইরূপ

Dhaka University Institutional Repository

ধারণা। টুর্গেনিভের রচনায় যেমন অনুভূতিতর গভীর intensityর পরিচয় পাওয়া যায়, ইহাতেও অনুভূতির সেইরূপ intensity প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, কোন কোন স্থানে অতিরিক্ত কথন দোষে সেই intensity নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলেও *মাশুকের দরবারের* রচনা এমনি অভিনব যে, আমরা ইহা পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। স্বভাববর্ণনে স্থানে স্থানে লেখকের অসামান্য ক্ষমতার পরিচয় পাওযা যায়। রচনা সহজ সরল, ভাষাভঙ্গী আধুনিক রুচিসম্মত;...

গ্রন্থ-অন্তর্গত ১১টি গল্পের সাময়িক পত্রে প্রকাশের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল:

ভারতবর্ষ	মোহাম্মদী	কার্তিক	১৩৩৪
চণ্ডুর আড্ডা [রূপক]	ভারতবর্ষ	পৌষ	১৩৩৪
গালিভারের নিদ্রাভঙ্গ	মোহম্মদী	ফাল্গুন	১৩৩৫
বসন্তের বধূ [উচ্ছ্বাস]	ভারতবর্ষ	বৈশাখ	১৩৩৪
প্রেমের পুষ্পরথ	মোহাম্মদী	অগ্রহায়ণ	১৩৩৫
কিউপিডের দুষ্টামী	নওরোজ	ভাদ্র	১৩৩৪
পূর্ব্বাভাষ	ভারতবর্ষ	ভাদ্র	১৩৩৪
শুভদৃষ্টি	ভারতী	ভাদ্র	১৩৩৩
আদর্শ প্রেম	সওগাত	ফাল্গুন	১৩৩৬
মুক্তির গান	ইসলাম দর্শন	অগ্রহায়ণ	১৩৩৪

দরবেশের দোয়া

প্রকাশক: গ্রন্থকার, ৫২ লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩৩৮ সাল)। ['উত্তরাধিকার' (মার্চ, এপ্রিল ১৯৭৭) পত্রিকায় প্রকাশিত "এস. ওয়াজেদ আলি" প্রবন্ধে আব্দুল কাদির লিখেছেন... *দরবেশের দোয়া* ১৩৫২ সালে ইতিকথা বুক ডিপো, ৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়,...”। আবদুল কাদিরের উপর্যুক্ত তথ্য তৃতীয় সংস্করণের, প্রথম প্রকাশের নয়।]

দরবেশের দোয়ার প্রথম সংস্করণে ৫টি গল্প সংযোজিত হয়েছিল; গল্পগুলি হলো—'দরবেশের দোয়া', 'ফেরেশেতাদের কলহ,' 'নবীদর্শন,' 'প্রেমের মোসাফের' ও 'প্রচারক'।

দরবেশের দোয়া-র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৫২ সালে। প্রকাশক; কাজী আকামউদ্দীন, ৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মুদ্রাকর: শ্রীসুধীর চন্দ্র রায়, বসাক প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১২৭নং মস্‌জিদ বাড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা: ১+৪+১৬৭+৪; মূল্য: ২টাকা মাত্র। তৃতীয় সংস্করণে ৪টি গল্প সংযোজিত হয়েছে; 'তরুণ আরব' ও 'সুরাটের কাফিখানা' নতুন; এবং 'পৌত্তলিক' ও তারা' গল্প দুটি পুরাতন *গুল-দাস্তা* (১৩৩৪ সাল) গল্প-গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণ *দরবেশের দোয়া* পুস্তকের অন্তর্গত নতুন ৭টি গল্পের মধ্যে ৪টি বিভিন্ন সময়ে পত্রে প্রকাশিত হয়। তার বিবরণ নিম্নরুপ:

দরবেশের দোয়া	বার্ষিক মোহাম্মদী	১৩৩৫
ফেরেশতাদের কলহ	সওগাত	ফাল্গুন ১৩৩৫
নবীদর্শন	মোহাম্মদী	কার্তিক ১৩৩৬
তরুণ আরব	গুলিস্তা	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ ১৩৪০

Dhaka University Institutional Repository

ভাঙ্গাবাঁশী

ভাঙ্গাবাঁশী ডি.এম. লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল মুদ্রিত হয় নি। প্রকাশক: শ্রীগোপাল দাশ মজুমদার। মুদ্রাকর: শ্রীগুরুদাস বসু, প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিঃ, ৫২-৩ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা: ১+৪+১১২: মূল্য: দুইটাকা মাত্র।

*ভাঙ্গাবাঁশী*তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১১টি গল্প। সূচীপত্রের প্রথম ৮টি গল্প—'ভাঙ্গাবাঁশী', 'কবির কসিমৎ', 'বিবাহ', 'রোস্তম খাঁ', 'জমিলা', 'রাজা' ও 'মেয়ে' গৃহীত হয়েছে লেখকের 'গুল-দাস্তা' (১৩৩৪) পুস্তক থেকে। এ-গ্রন্থে নতুন সংযোযিত হয়েছে 'আফ্রিদি তরুণী', 'মোহ-মুক্তি' ও 'মিলন'—এই ৩টি গল্প।

গ. ঐতিহাসিক উপন্যাস

গ্রানাডার শেষ-বীর

প্রকাশক: মঈনউদ্দীন হোসায়ন বি.এ, নূর লাইব্রেরী ১২/১ সারেঙ্গ লেন, তালতলা, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ: ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে। প্রকাশক: মঈনউদ্দীন হোসায়ন বি.এ, নূর লাইব্রেরী।

মুদ্রাকর: শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায় বি.এ, শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, ৩২নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা: ১+১+৮৬+২; মূল্য: বার আনা।

'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯৪৩ সনের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার দ্রুতপঠন পাঠ্যরূপে নির্বাচিত (৫।১২।১৯৪০ কলিকাতা গেজেট দ্রষ্টব্য)।' —*গ্রানাডার শেষ-বীর* পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের নামপত্রের শীর্ষে এ-বাক্যটি মুদ্রিত হয়।

গ্রানাডার শেষ-বীর -এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হ'লে পত্র-পত্রিকায় এ- পুস্তক সম্পর্কে নানা অভিমত প্রকাশিত হয়। *আনন্দবাজার পত্রিকা* (৮।১।১৩৭) বলে :

> বাঙ্গলা সাহিত্যেক্ষেত্রে মিঃ এস. ওয়াজেদ আলী সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থখানি কিশোরদের উপযোগী করিয়া লেখা। সহজ ও সাবলীল ভাষায় লিখিত। মাঝে মাঝে বিষয়বস্তুর পরিচায়ক ছবি সঙ্গে থাকায় পুস্তকের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমরা পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।...

ভারতীপত্রিকা (৭।৪।১৯৪০) *গ্রানাডার শেষ বীর* সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখে :

> ... মরু-সংস্কৃতির সহিত এশিয়ার জাতিগুলির যোগাযোগ শিথিল নয়। সুতরাং স্পেনে গ্রানাডা হইতে বিচ্যুত শেষ মূরবীর আবদুল্লার পরাভব সকল এশিয়াবাসীর সমবেদনা আকর্ষণ করিবে। পুস্তকখানির ভাষা সরল, অথচ হৃদয়গ্রাহী। বস্তুতঃ গ্রন্থকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নবাগত নহেন। তাঁহার রচিত বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত আরও কয়েকখানি পুস্তক বঙ্গবাসীর সমাদর লাভ করিয়াছে। আশা করি এখানিও যাঁহাদের উদ্দেশ্যে লিখিত তাঁহাদে চিত্তে স্থায়ী আসন বিস্তার করিবে।

Amrita Bazar Patrika *গ্রানাডার শেষ-বীর* সম্পর্কে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল সংখ্যায় যে- মন্তব্য করেন তার অংশ বিশেষ সংকলিত হলো:

Mr Wajed Ali a writer of distinction and he has reproduced the story of the last hero of Granada in a very fascinating way all his own. The whole story as

Dhaka University Institutional Repository

presented here is of consuming interest and contains wholesome truth and lesson. The Bengali reading public will remain under a deep debt of obligation to the writer for this eminently readable valume will be read by every Bengali with real pleasure and profit.

কার্তিক ১৩৪৭ -এর *উদয়াচল*-এ লেখে :

> ... লেখক এই পুস্তকখানিতে গ্রানাডার নষ্ট গৌরবের কাহিনী অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আরবদিগের দেশের প্রতি ভালবাসা, জাতি ও ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক টান এবং সর্ব্বশেষে দেশরক্ষার জন্য জীবন দান পুস্তকখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখকের ভাষা স্বচ্ছ ও বেগবতী।...

ঘ. ভ্রমণ কাহিনী

পশ্চিম-ভারতে

প্রকাশক: বৃন্দাবন ধর এন্ড সন্স্ লিমিটেড্। স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী। ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ; স্কুল সাপ্লাই বিল্ডস, ঢাকা। মুদ্রাকর: শ্রীগৌরচন্দ্র পাল, নিউ মহামায়া প্রেস, ৬৫/৭ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য: এক টাকা। প্রথম সংস্করণ—১৩৩৫।

পশ্চিম-ভারতে ভ্রমণ কাহিনী গুলিস্তা পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৫১ সংখ্যা থেকে) পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায়। গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রসমূহ হলো: আজমীর শরীফ, কুতুবমিনার, দেওয়ানে খাস, দেওয়ানে আম, মতি মস্‌জিদ, আকবরের সমাধি, তাজমহল।

আলোচনা বহির্ভূত রচনাবলি পরিচয়

ক. প্রবন্ধ

সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান

প্রকাশক: শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'দি সিটি বুক কোম্পানী', ১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। মুদ্রক: শ্রীফণিভূষণ রায়, প্রবর্তক প্রিন্টিং এন্ড হাফটোন লিঃ; ৫২-৩ বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ: ১৯৪৮। দ্বিতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯। পৃষ্ঠা: ১+২+৭১। মূল্য: দেড় টাকা মাত্র।

ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান

প্রকাশক : বীণা লাইব্রেরি : ২৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। প্রথম সংস্ককরণ : ১৯৪৯। মূল্য : দেড় টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে 'ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান' ধারাবাহিকভাবে সওগাত, ১৩৫৩ মাঘ থেকে ১৩৫৫ মাঘ সংখ্যাসমূহে প্রকাশিত হয়। 'ইবনে খালদুনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়' অংশটি প্রকাশিত হয় সওগাত, ১৩৫৫ মাঘ সংখ্যায়। সওগাত, ১৩৫৬ ভাদ্র সংখ্যার 'পুস্তক পরিচয়' বিভাগে আহসান হাবিব গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ইসলামের ইতিহাস

প্রকাশক : শ্রীক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায়, 'দি সিটি বুক কোম্পানী', ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা। মুদ্রক : শ্রীসুকুমার চৌধুরী, বাণীশ্রী প্রেস, ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা। সংস্করণ উল্লেখ নেই। পৃষ্ঠা : ২+১৭৮। মূল্য : ছয় টাকা।

খ. নাটক

সুলতান সালাদীন

প্রকাশক: গুলিস্তাঁ পাবলিশিং হাউস। ৪৮, ঝাউতলা রোড, বালীগঞ্জ, কলকাতা। মুদ্রকের নাম নেই। প্রাপ্তিস্থান: প্রবর্তক পাবলিশিং হাউস, ৬১, বহুবাজার স্ট্রিট, কলকাতা। প্রকাশকাল নেই। নাটকটি পঞ্চাঙ্কের। নাটকের চরিত্র-পরিচয়: সুলতান সালাদীন, সীতা (সুলতানের ভগ্নী); নাথান (জেরুজেলাম বাসী ধনী এহুদী); রেখা (নাথানের পালিতা কন্যা); দাজা (রেখার খৃষ্টান সহচরী); তরুণ টেম্পলার যোদ্ধা: দরবেশ: জেরুজালেম পেট্রিয়ার্ক; ফ্রায়ার সন্ন্যাসী; আমীর মনসুর; এবং মমলুক সৈনিকগণ।'

নাটকটির উৎসর্গ পত্র নিম্নরূপ:

উৎসর্গ/ আমার তরুণ বন্ধু আনিল দেবের/ উদ্দেশ্যে স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ/ এই গ্রন্থটী উৎসগীত হইল/ লেখক

গ. শিশু সাহিত্য

বাদশাহী গল্প

প্রকাশক : বৃন্দাবন এণ্ড সন্স লিমিটেড, আশুতোষ লাইব্রেরি, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। মুদ্রক: পরেশনাথ ব্যানার্জি, শ্রী নরসিংহ প্রেস, ৫ কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। প্রথম সংস্করণ: ১৩৫১ (১৯৪৪)। পৃষ্ঠা: ১+৮২। মূল্য: বার আনা।

গল্পের মজলিস

প্রকাশক : বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড; ৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা। প্রাপ্তিস্থান: ইতিকথা বুক ডিপো, ৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা। প্রথমসংস্করণ: ১৯৪৪। পৃষ্ঠা ১+১০৫। মূল্য: বারো আনা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

এতদ্ব্যতীত *সওগাত*, ১৩৫৩ শ্রাবণ ১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠ এবং ১৩৫৫ অগ্রহায়ণ সংখ্যার "বিজ্ঞাপন"-সূত্রে এস. ওয়াজেদ আলি রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থাদির তথ্য পাওয়া গেছে [১] পীর পায়গাম্বরদের কথা (শিশু সাহিত্য); মূল্য: পাঁচ সিকা; [২]

Dhaka University Institutional Repository

ইরান তুরানের গল্প (শিশু সাহিত্য); মূল্য: এক টাকা: [৩] Bengalees of to-morrow: Rs. 3/00. [৪] Aligarh Memories and Persian Boquet: Rs 2/8-;[৫] Songs of Hafiz: Rs. 3/-। বিজ্ঞাপনে নির্দেশিত প্রাপ্তিস্থান: ইতিকথা বুকডিপো, ৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাসমূহ

[প্রবন্ধ=প্র; গল্প=গ, কবিতা=ক; ভ্রমণ=ভ্র; উপন্যাস=উ; নাটক=না]

রচনার নাম	সাময়িক পত্রের বিবরণ
অতীতের বোঝা [প্র]	সবুজপত্র, ১৩২৬ বৈশাখ-আশ্বিন
অভিভাষণ [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৬ মাঘ
অমৃতের সন্ধান [ক]	গুলিস্তাঁ, ১৩৪১ চৈত্র
আদর্শ প্রেম [গ]	সওগাত, ১৩৩৬ ফাল্গুন
আবু হামেদ [গ]	গুলিস্তাঁ, ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ
আসামে কয়েকদিন [ভ্র]	মোয়াজ্জিন, ১৩৩৬ ফাল্গুন-চৈত্র
ইবনে খলিদুনের সমাজবিজ্ঞান [প্র]	সওগাত, ১৩৫৩ মাঘ-১৩৫৫ মাঘ
ইসলাম ও খেদমত (সেবা) [প্র]	মোয়াজ্জিন, ১৩৩৭ পৌষ-মাঘ
ইসলামের দান [প্র]	সওগাত, ১৩৩৫, চৈত্র-১৩৩৬ আষাঢ়
ঈদের পযগাম [গ]	মোহাম্মদী, ১৩৩৮ ফাল্গুন
একটি স্বপ্ন [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৯ বৈশাখ
একবাল [প্র]	বুলবুল, ১৩৪৫ বৈশাখ
একবালের পায়গাম (জেন্দেগী) [প্র]	গুলিস্তাঁ, ১৩৪০ অগ্রহায়ণ থেকে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত
এভারেষ্ট পর্ব্বতের কথা [প্র]	সওগাত, ১৩৩৯ কার্তিক
কবির কপাল [গ]	ভারতবর্ষ, ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ
কাফেরী আগুন [ক]	গুলিস্তাঁ, ১৩৪২ আষাঢ়
কিউপিডের দুষ্টামী [গ]	নওরোজ ১৩৩৪ ভাদ্র
কোরাণের ব্যাখ্যা [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৪৬ ভাদ্র
খেয়ালের ফেরদৌস [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৮ আশ্বিন
গজল [ক]	গুলিস্তাঁ, ১৩৪৪ কার্তিক
গালিভারের নিদ্রাভঙ্গ [গ]	মোহাম্মদী, ১৩৩৫ ফাল্গুন
গ্রানাডার শেষ বীর [উ]	গুলিস্তা, ১৩৪১ চৈত্র থেকে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত
চণ্ডুর আড্ডা [গ]	ভারতবর্ষ, ১৩৩৪ পৌষ
চড়ুই পাখীর কথা [প্র]	ভারতী, ১৩৩৩ আষাঢ়
ছেলেবেলার ঈদ [গ]	গুলিস্তাঁ, ১৩৫১ আশ্বিন-কার্তিক
জমিলা [গ]	সওগাত, ১৩৩৩ আষাঢ়
জাতি ও মহাজাতি [প্র]	সওগাত, ১৩৫৪ চৈত্র
জীবনের শিল্প [প্র]	সাহিত্যিক, ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ
ডাক [ক]	গুলিস্তাঁ, ১৩৪২ শ্রাবণ

Dhaka University Institutional Repository

তরুণ ও প্রবীণ [প্র]	সওগাত, ১৩৩৬ কার্তিক
তরুণের কাজ [প্র]	সওগাত, ১৩৩৩ আশ্বিন
তারা [গ]	ইসলাম দর্শন, ১৩৩৩ বৈশাখ
দরবেশের দোয়া [গা]	মোহাম্মদী, ১৩৩৫ বার্ষিক
দর্শন ও ঈমান [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৪ মাঘ-ফাল্গুন
দিদার নবী [গ]	মোহাম্মদী, ১৩৩৬ কার্তিক
ধর্ম ও সমাজ [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৫ ভাদ্র
নবী দিবস [প্র]	গুলিস্তাঁ, ১৩৫১ শ্রাবণ
নানার বাড়ী [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৪ মাঘ
পশ্চিম-ভারতে [ভ্র]	গুলিস্তাঁ, ১৩৫১ অগ্রহায়ণ থেকে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত
পাহাড় ও প্রান্তর [প্র]	বঙ্গবাণী, ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ
পূর্ব্বাভাষ [গ]	ভারতবর্ষ, ১৩৩৪ ভাদ্র
প্রকৃতি ও মানবজীবন [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৫ মাঘ
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য [প্র]	সাহিত্যিক, ১৩৩৪ বৈশাখ
প্রাণের দোসর [ক]	গুলিস্তাঁ, ১৩৪৪ কার্তিক
প্রেমের পুষ্পরথ [গ]	মোহাম্মদী, ১৩৩৫ অগ্রহায়ণ
ফাতেমা [অনুবাদ]	ইসলাম দর্শন, ১৩৩৪ কার্তিক
ফাতেমা দোয়াজদহম [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৮ ভাদ্র
ফেরেশতাদের কল্‌হ্‌ [গ]	সওগাত, ১৩৩৬ কার্তিক
বসন্তের বধূ (উচ্ছ্বাস) [প্র]	ভারতবর্ষ, ১৩৩৪ বৈশাখ
বাক্যালাপ [প্র]	ভারতী, ১৩৩৩ বৈশাখ
বাঙালী না 'মুসলমান' [প্র]	ভারতবর্ষ, ১৩৫১ আষাঢ়
বাঙ্গলা বর্ণমালা [প্র]	সাহিত্যিক, ১৩৩৪ শ্রাবণ
বাঙ্গালী মুসলমান [প্র]	সওগাত, ১৩৩৭ শ্রাবণ/ শীশু-মহল, ১৩৪৭ শ্রবণ
বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যসমস্যা [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৫ বৈশাখ
বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যসাধনার পথ [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৬ পৌষ
বাংলা রেকর্ড [প্র]	গুলিস্তাঁ, ১৩৫১ ভাদ্র
বেলফুল [কথিকা]	ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ শ্রাবণ
বেড়ানর আনন্দ [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৭ আষাঢ়
ভাই [গ]	ইসলাম দর্শন, ১৩৩২ পৌষ
ভাঙ্গাবাঁশী	বঙ্গবাণী, ১৩৩২ মাঘ
ভারতবর্ষ [গ]	মোহাম্মদী, ১৩৩৪ কার্তিক
মর্ম্ম কথা [ক]	গুলিস্তাঁ, ১৩৪২ আষাঢ়
মহরম [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৮ শ্রাবণ
মুক্তির গান [গ]	ইসলাম দর্শন, ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ
মুসলিম কালচারের আদর্শ [প্র]	শীশ্‌মহল, ১৩৪৯ জ্যৈষ্ঠ
মেয়ে [গ]	সাহিত্যিক, ১৩৩৩ পৌষ

Dhaka University Institutional Repository

মোটরযোগে রাঁচির সফর [ভ্র]	ইসলাম দর্শন, ১৩৩৪ পৌষ থেকে প্রকাশিত
	সওগাত, ১৩৩৫ কার্তিক—১৩৩৫ ফাল্গুন
মোস্‌লেম নারী [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৮ কার্তিক
মোহরম-কারবালা! [প্র]	গুলিস্তাঁ, ১৩৫১ পৌষ
রাজা [গ]	ইসলাম দর্শন, ১৩৩২ অগ্রহায়ণ
রাষ্ট্র ও নাগরিক [প্র]	ভারতবর্ষ, ১৩৪৯ অষাঢ়
শাদ্দাদের স্বর্গ [আরবী পুরাণ অবলম্বনে]	ভারতবর্ষ, ১৩৩৬ মাঘ
শুভদৃষ্টি [গ]	ভারতী, ১৩৩৩ ভাদ্র
শ্যামা ও পরওয়ানা [গ]	নওরোজ, ১৩৩৪ শ্রাবণ
সমুদ্রের কথা [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৩৫ পৌষ
সাহিত্য শাখার অভিভাষণ (সাহিত্য) [প্র]	মোহাম্মদী, ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ
সাহিত্যের লক্ষ্য [প্র]	সওগাত, ১৩৫২ বৈশাখ
সুফিবাদের উদারতা [প্র]	ভারতবর্ষ, ১৩৪৮ আশ্বিন
হিন্দু-মুসলমান [প্র]	ভারতবর্ষ, ১৩৪৭ ফাল্গুন

সহায়ক গ্রন্থাবলি

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা : ড. কাজী আবদুল মান্নান, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা বাজার, ঢাকা, ১৯৬৯

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ রচনাবলী (১ম খণ্ড) : আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৭

ইবরাহীম খাঁ রচনাবলি (১ম খণ্ড) : মোহাম্মদ আবদুল মজিদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

ইসলাম ও খিলাফত : মফীজুল্লাহ কবীর, নওরোজ কিতাবিস্থান, ঢাকা, ১৯৭৪

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক : বদরুদ্দীন উমর (ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ১৩৭৯)

ছোটগল্পের কথা : রথীন্দ্রনাথ রায়, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, মোহনবাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৯

বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২, চতুর্থ পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯

প্রমথ চৌধুরী : জীবেন্দ্র সিংহ রায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৪

বাংলা ছোটগল্প : শিশিরকুমার দাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৩

বাংলার জাগরণ : কাজী আব্দুল ওদুদ, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৬৩

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত : মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলি আহসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার : শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৮৯ (প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২)

বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় খণ্ড) : গোপাল হালদার, এ মর্খ্যাজি অ্যান্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬০

বীরবল বাংলা সাহিত্য : অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যলোক, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮ (প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০)

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ : শেষ হাবিবুর রহমান, মুখদমী লাইব্রেরি, কলিকাতা, ১৯৩৪

মুসলিম বাংলা সাহিত্য : ড. মুহম্মদ এনামুল হক, পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৫৭

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য : আনিসুজ্জামান, মুক্তধারা, ঢাকা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৩, (প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৪)

মুসলিম সাহিত্য সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম : খোন্দকার সিরাজুল হক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪

মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী (১ম খণ্ড) : সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫

মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী (১ম খণ্ড): সম্পাদনা : মনিরুজ্জামান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৩

সহায়ক-পত্রিকা

অভিযান : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩৩

ইসলাম প্রচারক : ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন, ১২২৮

মাসিক মোহাম্মদী : ১ম বর্ষ, ৯ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৭৫

মাসিক মোহাম্মদী : ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৩৫

মাহে নও : ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৬১

শিখা : ১ম বর্ষ, ১৩৩৩

জীবনপঞ্জী

১৮৯০ : ৪ঠা সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার শ্রীরামপুর মহকমা-অন্তর্গত জনাই এর সন্নিহিত বড় তাজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা : শেখ বেলায়েত আলি। মাতা: খদিজা বেগম।

১৮৯৫ : বড়তাজপুরের পাঠশালায় শিক্ষাজীবন শুরু।

১৮৯৭ : প্রথম বিবাহ। স্ত্রীর নাম : আয়েশা খাতুন। আয়েশা খাতুন ১৯৬০ সালে ঢাকায় পরলোক গমন করেন।

১৮৯৮ : শিলং গমন। মোখার হাইস্কুলে ভর্তি হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৬ : স্বর্ণপদক পেয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯০৮ : আই. এ. পাশ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আলীগড় কলেজ থেকে।

১৯১০ : বি.এ. ডিগ্রি লাভ। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

১৯১২ : বার এট্-ল ডিগ্রির জন্য ইংল্যান্ড গমন।

১৯১৫ : কেম্ব্রিজ থেকে বি.এ. এবং বার-এট-ল হয়ে দ্বিতীয় পত্নী মিসেস নেলী ওয়াজেদ সহ স্বদেশ প্রত্যাবর্তন।

: হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন।

১৯১৯ : প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত সবুজপত্র-এ 'অতীতের বোঝা' শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

: Bulletin of the Indian Rationalistic Socitey নামক ইংরেজি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন।

১৯২৩ : কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত।

১৯৩৫ : *ইসলাম দর্শন* পত্রিকায় ছোটগল্প 'রাজা' প্রকাশিত। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি নির্বাচিত।

১৯২৬ : ডিসেম্বর। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির' সভাপতি পুন-নির্বাচিত।

১৯২৭ : মার্চ। বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি পদ থেকে, সম্পাদক গোলাম মেস্তফাসহ, এস. ওয়াজেদ আলি পদত্যাগ করেন।

: *গুল-দাস্তা* গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।

১৯২৮ : দুইপুত্র ও এক কন্যার জননী মিসেস নেলী ওয়াজেদ স্বামী এস. ওয়াজেদ আলিকে পরিত্যাগ করেন। এবং তিনি এস. ওয়াজেদ আলির ছোট ভাই এস. শমসের আলিকে বিবাহ করেন।

১৯২৯ : ডিসেম্বর। কলকাতা এলবার্ট হলে কাজী নজরুল ইসলামের জাতীয় সম্বর্ধনা কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন। অভিনন্দন পাঠ।

: 'আসাম মুসলিম ছাত্র সমিতির' সাম্বৎসরিক সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে যোগদান।

: এস. ওয়াজেদ আলির সঙ্গে এক বার্মিজি কন্যার বিবাহ। স্ত্রীর ধর্মান্তরিত নাম বদরুন্নেসা আলি।

১৯৩০ : মাশুকের দরবার গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।

: এপ্রিল। নোয়াখালী মুসলিম ইন্সটিটিউটে'র বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে যোগদান।

১৯৩১ : *দরবেশের দোয়া* গল্পগ্রন্থ প্রকাশ।

: অক্টোবর ২৬। মিসেস বদরুন্নেসার আলি লোকান্তরিত হন।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩২ : ডিসেম্বর। এস. ওয়াজেদ আলি প্রতিষ্ঠিত হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অগ্রদূত সচিত্র পত্রিকা গুলিস্তাঁ প্রকাশিত। *ইকবালের পায়গাম* গ্রন্থের প্রথম কিস্তি *গুলিস্তাঁয়* প্রকাশ এবং অতঃপর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ : 'গ্রানডার শেষ-বীর' গ্রন্থের প্রথম কিস্তি 'গুলিস্তাঁ'য় প্রকাশ এবং তা পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়।

১৯৩৫ : ফেব্রুয়ারি। সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত 'নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনী'তে সভাপতি হিসেবে যোগদান।

: জুলাই। হুগলি জেলার বড় তাজপুর গ্রামের 'তাজপুর ইনস্টিটিউট'- এর প্রথম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে যোগদান।

১৯৪০ : *গ্রানাডার শেষ-বীর* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত।

১৯৪১ : *জীবনের শিল্প* প্রকাশিত।

১৯৪৩ : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, *ভবিষ্যতের বাঙালী* গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ : *গুলিস্তার* চতুর্থ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত।

: *বাদশাহী গল্প* এবং *গল্পের মজলিশ* প্রকাশিত হয়।

১৯৪৫ : অক্টোবর ৩১। কলিকাতার তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদ থেকে অবসর গ্রহণ।

: পুনরায় স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা শুরু।

১৯৪৮ : প্রকাশ – 'সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান' : 'পশ্চিম-ভারতে'।

১৯৪৯ : প্রকাশ – 'আকবরের রাষ্ট্র-সাধনা' ; 'মোটরযোগে রাঁচির সফর' ; 'ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান'।

: এস. ওয়াজেদ আলি 'সেরিবেরাল থ্রমবসিস'-এ আক্রান্ত হন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

১৯৫১ : জুন ১০। রবিবার সকাল ৯টায় এস. ওয়াজেদ আলি ৪৮, ঝাউতলা রোডের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এস. ওয়াজেদ আলিচর্চা

এস. ওয়াজেদ আলি বিষয়ক প্রবন্ধ

সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলি : ডক্টর গোলাম সাকলায়েন, সওগাত, ৫৬:১, অগ্রহায়ণ ১৩৮০

সাহিত্যিক এস ওয়াজেদ আলি সম্পর্কে দুটি কথা : এম. নাসির উদ্দীন, সওগাত, ৫৬:১, অগ্রহায়ণ ১৩৮০

এস. ওয়াজেদ আলী : আবদুল কাদির, উত্তরাধিকার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, মার্চ-এপ্রিল ১৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository

এস. ওয়াজেদ আলী	:	মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, *সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, মুক্তধারা, ঢাকা১৯৭৮
এস. ওয়াজেদ আলী	:	সৈয়দ আলী আহসান, *সতত স্বগত*, ইউনিভার্সিটি প্রেস, লিমিটেড, ঢাকা, আগস্ট ১৯৮৩
একজন বাঙালী জাতীয়তাবাদী	:	আবদুল হক, *নিঃসঙ্গ চেতনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪
এস. ওয়াজেদ আলির		
'ভবিষ্যতের বাঙালী'	:	রফিকউল্লাহ খান, *উত্তরাধিকার*, বাংলা একাডেমী, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৮৫

পত্র পত্রিকায় এস. ওয়াজেদ আলি-প্রসঙ্গ

মরহুম ওয়াজেদ আলী	:	মাহেনও, ভাদ্র ১৯৫৮ আগস্ট ১৯৫১
এস. ওয়াজেদ আলী	:	প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৮, জুলাই ১৯৫১
পরলোকে ওয়াজেদ আলি	:	ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৫৮, জুলাই ১৯৫১
সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয়	:	বার্ষিক সওগাত ১৩৩৩

ইতিহাস ও জীবনস্মৃতিতে এস. ওয়াজেদ আলি

বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ	:	মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন, সওগাত প্রেস, ঢাকা ১৯৮৫
অতীত দিনের স্মৃতি	:	আবুল কালাম শামসুদ্দীন, নওনোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা ১৯৬৮
বাতায়ন	:	ইব্রাহীম খাঁ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৭
রেখাচিত্র	:	আবুল ফজল, বইঘর, চট্টগ্রাম ১৯৬৫
চলমান জীবন (১ম পর্ব)	:	পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, ক্যালকাটা বুক লিমিটেড (প্রকাশকাল নেই) কলিকাতা
বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	:	মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, তু-স, বইঘর, চট্টগ্রাম ১৯৬৮

এস. ওয়াজেদ আলির পুস্তক-পরিচয়

গুল-দাস্তা	:	ইসলাম দর্শন, ৬:৩, পৌষ ১৩৩৪
		গুলিস্তাঁ, ৫:১২ চৈত্র ১৩৫২
		সওগাত, ৬:৪, শ্রাবণ ১৩৩৫

Dhaka University Institutional Repository

মাশুকের দরবার	:	সওগাত, ৮:৭, শ্রাবণ ১৩৩৭
ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান	:	সওগাত, ভাদ্র ১৩৫৬
গ্রানাডার শেষ-বীর	:	উদয়াচল, কার্তিক ১৩৪৭
		Amrita Bazar Patrika, 21 April 1940
		আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই বৈশাখ, ১৩৪৭
ভবিষ্যতের বাঙালী	:	সওগাত, ২৭:১ অগ্রহায়ণ ১৩৫১
সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান	:	সওগাত অগ্রহায়ণ ১৩৫৫
		ইত্তেহাদ, ২৪শে নভেম্বর ১৯৪৮
		মোহাম্মদী: ২৮শে জানুয়ারী ১৯৪৯
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য	:	সওগাত, অগ্রহায়ণ ১৩৫১

Dhaka University Institutional Repository

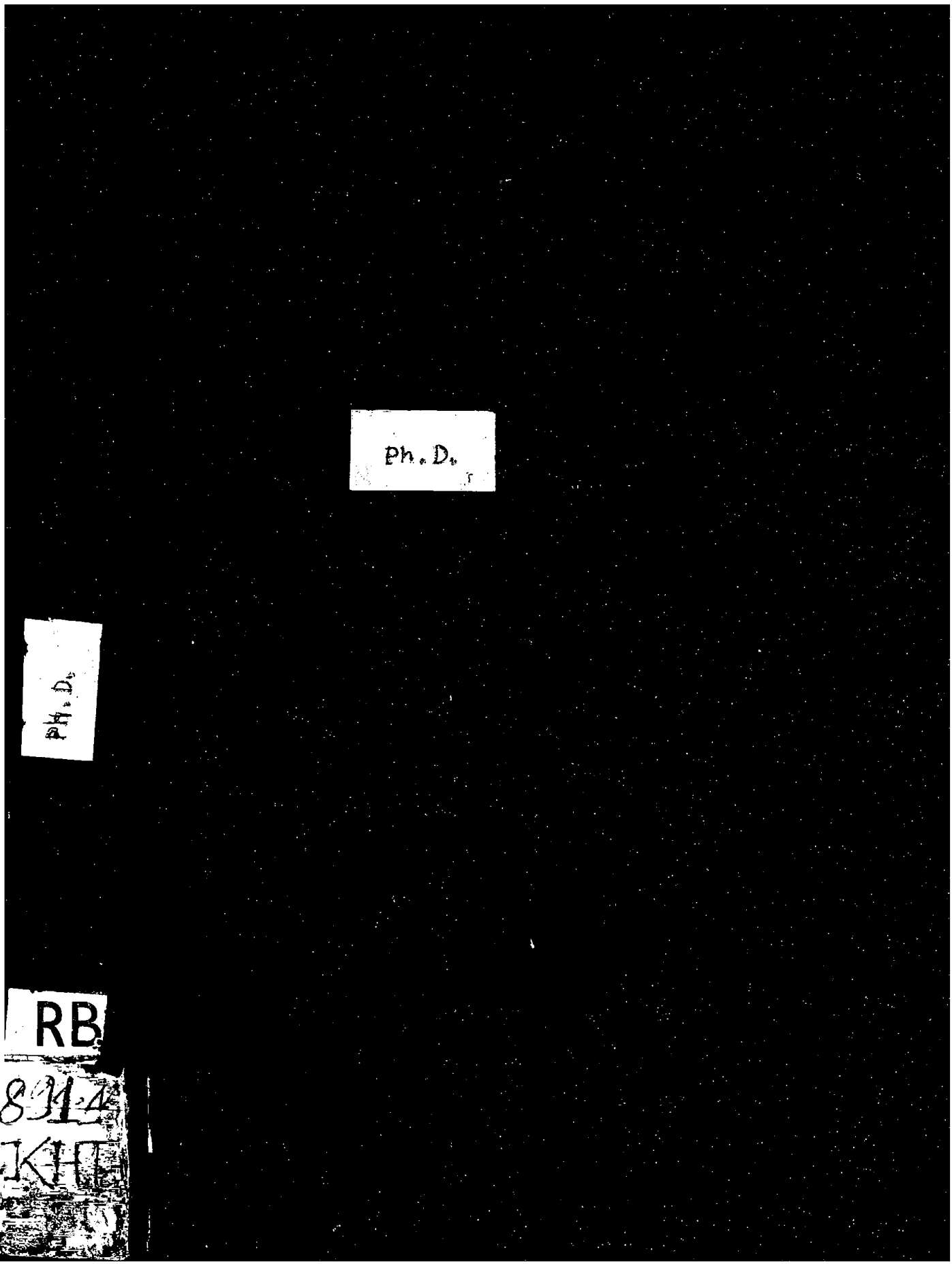

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম

মোঃ জামান খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুতকৃত অভিসন্দর্ভ
ডিসেম্বর ১৯৯৮

Dhaka University Institutional Repository

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ জামান খান কর্তৃক উপস্থাপিত 'বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

২৫/১২/৯৮

(ড. সৈয়দ আকরম হোসেন)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা ১০০০
বাংলাদেশ

382305

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ১ – ৪০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
এস. ওয়াজেদ আলির প্রবন্ধ ৪১ – ৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
এস. ওয়াজেদ আলির ছোটগল্প ৭৩ – ১২৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
এস. ওয়াজেদ আলির ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী ১৩০ – ১৪৮

উপসংহার ১৪৯ – ১৫১

পরিশিষ্ট ১৫২ – ১৭১

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

১৯৯৩ -৯৪ শিক্ষাবর্ষে *বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম* শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবন্ধনভুক্ত হই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় আমাকে চাকুরিরত অবস্থায় কলেজের স্বাভাবিক পাঠদানে কোন বিঘ্ন ঘটবে না – এই শর্তে অনুমতি প্রদানে সম্মত হন। ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করে নির্ধারিত সময়ে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করতে পেরে আমি আনন্দিত।

বর্তমান অভিসন্দর্ভ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর সৈয়দ আকরম হোসেনের তত্ত্বাবধানে রচিত। গবেষণা নির্দেশনার দায়িত্ব পালনে সম্মত হওয়ায় তাঁর প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনিই আমাকে গবেষণা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। গবেষণা-পরিকল্পনা ও বিষয়-মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর মীমাংসা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাঁর প্রেরণা ও নির্দেশনা ছাড়া আমার পক্ষে এ-গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা সম্ভব ছিলো না।

বাংলা সাহিত্যে এস. ওয়াজেদ আলি এক শক্তিমান সাহিত্যিক। তিনি বাংলা সাহিত্যকে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রজ্ঞাবান পথিকৃৎ। ইতোমধ্যে সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলি সম্পর্কে কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও, তা তাঁর বহুমুখী সাহিত্যকর্মের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন নয়। এই অপূর্ণতা লক্ষ করে আমি এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম বিবেচনায় মনোনিবেশ করি। এস. ওয়াজেদ আলির জীবন নয়, সাহিত্যকর্মই আমার গবেষণার মুখ্য বিষয়। তবে সাহিত্যসৃষ্টির প্রেক্ষাপট ও স্বরূপ বিশ্লেষণ এবং অন্তর্দৃষ্টি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যতোটা প্রাসঙ্গিক, তাঁর জীবন-কর্মাভিজ্ঞতা ততোটাই গ্রহণীয় হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে এস. ওয়াজেদ আলি এক প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব ও শক্তিমান স্থপতি। বিষয়বৈচিত্র্যে ও রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে তাঁর সাহিত্যকর্ম শিল্পসফল ও কালোত্তীর্ণ। প্রবন্ধ, গল্প, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি রচনায় তাঁর শক্তি অভিনব ও সাফল্য বিচিত্র।

সাহিত্যসাধক এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্মের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে মূল অভিসন্দর্ভ চারটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানসের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের সমাজচিন্তা, ধর্মচিন্তা, জাতিভাবনা, রাষ্ট্রচিন্তা, সাহিত্য ও শিল্পভাবনা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অন্তর্ভূত হয়েছে এস. ওয়াজেদ আলির প্রবন্ধ। তাঁর প্রবন্ধগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে ও রচনাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যে শিল্পসফল ও কালোত্তীর্ণ এবং তা নতুন চেতনা-সঞ্চারী এক অভিনব সাহিত্যসৃষ্টি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তারই মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে এস. ওয়াজেদ আলির গল্প। গল্প-সংগঠনে এস. ওয়াজেদ আলি সমকাল-অনুগত হয়েও পরীক্ষাপ্রবণ, বৈচিত্র্যসন্ধানী এবং নিজস্ব শৈলী উদ্ভাবনে যত্নশীল। তাঁর অনেকগুলি গল্পের বিষয়, ফর্ম ও ভাষারীতিতে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকলেও সেগুলি কারো পুনরাবৃত্তি নয়, বরং স্বভাবে স্বতন্ত্র। ঘটনাক্রম, চরিত্রাবলি এবং আবেষ্টনীকে অতিক্রম করে তাঁর গল্প সুস্থির হয় মহোত্তম দর্শনে। তাই তিনি রূপক গল্প রচনায় প্রেরণা ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন সর্বাধিক। তাঁর গল্পগুলি আধুনিক ভাষার এক নিপুণ শিল্প-দক্ষতায় নির্মিত। চরিত্রায়ন ও ঘটনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর গদ্যে বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, অনুপ্রাস, উপমা প্রয়োগ এবং চিত্রকল্প নির্মাণ-দক্ষতা প্রচলিত গল্পের ধারায় স্বতন্ত্র।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী। এস. ওয়াজেদ আলির ইতিহাস-জ্ঞান, বিবেচনাবোধ ও ভবিষ্যৎ-দর্শী মননশীলতাও ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ। ঐতিহাসিক উপন্যাসে তিনি ইতিহাসের নিষ্প্রাণ তথ্য পরিবেশন না করে সে তথ্যকে আশ্রয় করে আপন কল্পনা-প্রতিভার সাহায্যে জীবনরস সৃষ্টি করেছেন এবং ইতিহাসের তথ্যের শূন্যস্থান পূরণ করে সংশ্লিষ্ট ঘটনা, চরিত্র ও যুগ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণ ধারণা দান করেছেন। তাঁর ভ্রমণসাহিত্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণের ক্রমান্বয়ী বিবরণ, যানবাহনের যোগাযোগ, ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতির বিশেষত্ব সমূহের বিবরণই শুধু প্রকাশ করে নি – পরিবেশভেদে অধিবাসীদের জীবনযাত্রা, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা, অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা, লোকাচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং এর সঙ্গে গল্পরস মিশিয়ে একে শিল্পরূপ দান করেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* থেকে অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত উদ্ধৃতি-পাঠ (Text) গ্রহণ করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে এস. ওয়াজেদ আলির গ্রন্থপঞ্জি, প্রকাশিত রচনাসমূহের প্রকাশ-তথ্য, এস. ওয়াজেদ আলি-চর্চা এবং এ-বিষয়ে সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলি ও এস. ওয়াজেদ আলির জীবনের রূপরেখা সংযোজন করা হলো। আমার বিশ্বাস, সংযোজিত তথ্যাবলি ভবিষ্যত এস. ওয়াজেদ আলি-গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। সতর্কতা সত্ত্বেও বেশ কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল, এজন্যে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস

ব্রিটিশ শাসন-আমলে বাঙালি হিন্দু-সমাজেই প্রথম রেনেসাঁর স্ফুরণ ঘটে, অনুভূত হয় ভাবসংঘাত এবং বাঙালি মুসলমান সমাজে এর স্পন্দন জাগে অর্ধ-শতাব্দীরও পরে। মুসলমানদের মধ্যে যে ভাব-আন্দোলন দেখা দেয় তা ছিল ধর্মজীবনের আদর্শে পূর্ণ। বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতিপর্বে বাঙালি মুসলমান সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ বোধ করে নি। তাঁরা আরবি-ফারসি শব্দ বহুল কাব্যধারার সৃষ্টি করেছেন। এই রীতির কাব্যধারা রূপ-রসে বিচিত্র না হলেও বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার ঐতিহাসিক পেক্ষাপটে এর গুরুত্ব অপরিসীম। "একালে মুসলমান সমাজে যে সব ভাব-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার মূলে ছিল প্রাচীন ধর্ম জীবনের আদর্শে ফিরে যাবার ইচ্ছা। এসব আন্দোলনের মূল্য স্বীকার করে বলা যায় যে, বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে আধুনিক জীবন ও জগতের বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্য এদের দায়িত্ব যথেষ্ট। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের দিকে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কে সচেনতা দেখা দেয় এবং শিক্ষা গ্রহণে তার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ-সময়েই তারা আত্মনিয়োগ করেন, এর পূর্বে এদিকে মনোনিবেশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"[১] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাঁরা হিন্দুদের মতো সচেতন ছিলেন না, এবং হিন্দুদের তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে ছিলেন। এই থাকার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে।

১৭৯৩ সনে লর্ড কর্নওয়ালিশের (১৭৩৮-১৮০৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। জমির মালিকানা কৃষকের হাত থেকে চলে আসে জমিদারের হাতে। ১৭৯৭ সনে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'সপ্তম আইন' প্রবর্তন করে জমিদারদের অত্যাচার করার আরো সুযোগ করে দেয়। প্রজারা যাতে জমিদারের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করার সুযোগ না পায়, তার জন্য ১৮১২ সনে প্রবর্তিত 'পঞ্চম আইনে' জমিদার বা তার কর্মচারির বিরুদ্ধে মামলা করা নিষিদ্ধ হয়। তারপর ১৮২৮ সনে 'লাখেরাজ সম্পত্তি' (১৮২৮) ভোগকারীদের বিরুদ্ধে পর পর অনেকগুলো আইন পাশ করা হয়। এসব আইন আদালতের খাতায় থাকলেও জনগণ তা জানতে পারতো না। ফলে গ্রামের বেশির ভাগ মুসলমান যারা 'লাখেরাজ সম্পত্তি' ভোগ করতো তারা তাদের অগোচরেই সব সম্পত্তি হারাতো। এ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ফলে মুসলমান সমাজ আর্থিক দিক দিয়ে ভেঙে পড়ে এবং ধ্বংস হয়ে যায়। ব্যবসার নামে কোম্পানির লুণ্ঠন এবং শাসনের নামে খাজনা আদায়ে এ দেশের অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ ক্ষেত-মুজুরে এবং ক্ষেত-মজুর ভিখারিতে পরিণত হয়। শিক্ষার ব্যাপারেও মুসলমানদের শোচনীয় দুর্গতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুসলমানদের এ দুর্গতির প্রধান কারণ তাদের আর্থিক দৈন্য। ফারসি ভাষা বর্জন করতে গিয়ে হিন্দুর ধর্ম বা ঐতিহ্যের কোন টান পড়ে নি। সরকারি ভাষা হিসেবে তারা ফারসি ছেড়ে ইংরেজি গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। কিন্তু মুসলমানেরা তা সহজে পারে নি। এর ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরগুলোতে যে সব মুসলমান ফারসি-নবিশ সরকারি অফিস-আদালতে কাজ করতো তারা তাদের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হারিয়ে ফেলে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরেজরা বাংলাদেশের পণ্য ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে গড়ে তোলে বড় বড় কলকারখানা। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বস্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং তাঁতিদের জীবিকা কোম্পানি ও দেশী কর্মচারিদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকের প্রথম দিকে মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগ ও কুসংস্কারকে অবলম্বন করে এক ধরনের আরবি শিক্ষা এদেশে বিস্তার লাভ করে। কোরানের ভাষা হিসাবে আরবি শেখা মুসলমানেরা তাদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করতো। তথাকথিত একশ্রেণীর মোল্লারাই ছিল এ শিক্ষার প্রধান শিক্ষক। এক ধরনের আরবি মাদ্রাসা গ্রামে গ্রামে তাদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। এ সব মোল্লারা যা পড়াতো তার এক বর্ণও ছাত্ররা বুঝতো না।১

সেকালে মুসলমানেরা কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। এজন্যে ইংরেজদের সাথে তারা মেলামেশার সুযোগও পায় নি। তাই ইংরেজি শেখার জন্য তাদের গরজও জাগে নি। তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে জাগে হতাশা। আর এ হতাশার জন্যে তারা ইংরেজ সমাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে দূরে থাকার জন্যেই তাদের মধ্যে নতুন সভ্যতার প্রভাব পড়ে নি। মুসলমান সমাজ যখন পথে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক সেই সময়ে সকলের পরামর্শ অনুযায়ী লর্ড বেন্টিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষা প্রবর্তন করেন। এর ফলে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বেড়ে যায়। এতে বিভিন্ন চাকুরি হিন্দুদের অধিকারে চলে যায়। হিন্দু কলেজের (১৮১৭) প্রচেষ্টায় বাংলার হিন্দু সমাজ ইংরেজি ভাষা খুব সহজে আয়ত্ত করেছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিখতে এগিয়ে আসে নি।

> নানা রকম প্রতিবন্ধকতার ফলে বাঙালি মুসলমানের পক্ষে যেমন আশানুরূপ ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সম্ভব হয় নি, তেমনি এক বিভ্রান্তির কবলে পড়ে বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা দীর্ঘদিন সাড়া দেয় নি।২

সিপাহী অভ্যুত্থানের (১৮৫৭) ফলে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (১৭৬৫-১৮৫৮ অক্টোবর) পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ভারতবর্ষকে মহারানীর শাসনাধীনে নিয়ে আসে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এর বিরোধিতা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আবেদন করলেও তা কার্যকর হয় নি। বরং ১৮৫৮-এর পর থেকে কোম্পানির কার্যকলাপ ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর রানী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার আরো বৃদ্ধি পেলো। সহায়হীন চাষীর উপর শুরু হলো নির্মম অত্যাচার।

> ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ লক্ষ নীলচাষী ধর্মঘট করল। যে সব স্থানে নীলচাষ সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল যেমন, যশোর, নদীয়া, ফরিদপুর ও পাবনা জেলায়- সেইখানে এই ধর্মঘট ব্যাপক আকারে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

দিল। কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও প্রজাদের প্রতিরোধ চলতে থাকলো পরবর্তী দু'বছর ধরে। এই ঘটনাই 'নীল বিদ্রোহ' নামে বিখ্যাত।[৩]

পরবর্তীকালে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এ আন্দোলন প্রসার লাভ করে। ফলে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে সরকার নীল কমিশন বসান। কমিশনের রিপোর্ট বের হলে সরকার নীলকরদের অত্যাচার কমাবার জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন। 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট' (১৮৬১) অনুযায়ী ভাইসরয়ের মহাব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে সদস্য রাখা হয়। সরকারি চাকুরিতেও ভারতীয়দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উঁচু সরকারি পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (১৮৫৩) ব্যবস্থা গৃহীত হয়। "নীতিগতভাবে উচ্চ সরকারীপদে ভারতীয়দের নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও তার বাস্তব রূপায়ণের পথে যতদূর সম্ভব বাধা সৃষ্টিই ছিল এ সমস্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।"[৪]

সিপাহী বিদ্রোহের পর বাঙালি মুসলমান সমাজে নবাব আব্দুল লতীফ (১৮২৮-১৮৯৩) ও সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) একই সময়ে একই ধরনের আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ পাশ্চাত্য মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ইসলামের সঙ্গে প্রগতির কোন বিরোধ নেই। অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে শিক্ষাক্ষেত্রে সচেতন করার জন্যে নবাব আব্দুল লতীফ আন্দোলন করেন। তাঁরই আন্দোলনের ফলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহিতে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে নবাব আব্দুল লতীফ সমাজ সংস্কারমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি অনগ্রসর মুসলমান সমাজকে নবজাগরণের বাণী শোনাতে চেয়েছেন। নবাব আব্দুল লতীফের সঙ্গে সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য ছিল। আব্দুল লতীফ অনেক ক্ষেত্রেই স্যার সৈয়দের অনুসারী ছিলেন। বিশেষ করে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ এবং রাজনীতিতে যোগদানের ব্যাপারে উভয়ের মতামত ছিল একই ধরনের। স্বাভাবিকভাবেই আমীর আলীর সঙ্গে আব্দুল লতীফ একমত হতে পারেন নি।

> তাছাড়া আব্দুল লতীফের দৃষ্টিতে মুসলমানদের প্রয়োজন দাঁড়িয়েছিল শুধু ইংরেজি ভাষা-সাহিত্য ও ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানের সঙ্গে কিছু পরিচয় লাভ। কিন্তু এই নতুন শিক্ষাকে সত্যই কার্যকরী করার জন্য বিশেষ প্রয়োজন ছিল যে জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একটি পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির – সে বিষয়ে (তিনি) আদৌ সচেতন হন নি।[৫]

অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপান্তরের সাথে সাথে নতুন সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস দেখা দেয়। একদিকে জমিদার শ্রেণী আর একদিকে রায়ত শ্রেণী গড়ে ওঠে। গ্রাম এলাকায় এই দুই শ্রেণীর পাশাপাশি দেখা দেয় জোতদার, ক্ষেতমুজুর ব্যবসায়ী, বণিক ও শ্রমিক শ্রেণী এবং কিছু বৃত্তিভোগী ও পেশাজীবী শ্রেণী। "নবগঠিত এই সব শ্রেণী আবার ঐতিহাসিক নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের ভূমিকা পালন করে সামাজিক অগ্রগতি সম্ভবপর করে তোলে। বাংলার ভাগ্য বিপ্লবের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী বা ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদানই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ।"[৬] উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে হিন্দু প্রাধান্য দেখা দেয়। হিন্দু-সমাজ পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সহজেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়। সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতি ছিল স্বাভাবিক। "জমিদারী কেনা-বেচা করে, ব্যবসা-বাণিজ্য

Dhaka University Institutional Repository

দালালি-দেওয়ানী এজেন্সি করে যেভাবেই ধন সঞ্চয় করা হোক না কেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে সেই সঞ্চিত মূলধন শ্রম-শিল্প ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে নিযুক্ত করা সম্ভব নয় এবং তা না করতে পারলে ধনতান্ত্রিক যুগের পরিপূর্ণ বিকাশ ও হতে পারে না। এ দেশের উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর এই চেতনা থেকেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে জাতীয় আন্দোলনের সুত্রপাত হয়।"[৭] সিপাহি বিদ্রোহের দায়িত্বটা মুসলমানের ঘাড়ে এসে পড়ে। শাসক মহল মনে করেছিল যে, মোঘল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্যে মুসলমানেরা এ বিদ্রোহ ঘটিয়েছে। *রাজভক্ত ভারতীয় মুসলমান* (১৮৬০) বইটিতে সৈয়দ আহমদ এর প্রতিবাদ করেন। তিনি মুসলমান সমাজের মধ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তিনি সিপাহি বিদ্রোহেরও বিরোধিতা করেন। চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রগতিশীল। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানের ব্যাপক যোগাযোগ হয়।

পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের জন্যে নবাব আব্দুল লতীফ সারা জীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন করে শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে সারা ভারতে মুসলমানদের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার করেছিলেন। ১৮৭১ সনে নবাব আব্দুল লতীফ ভাইসরয় লর্ড মেয়োর সঙ্গে দেখা করে ভারতের মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপারে সরকারের অবহেলার প্রতি ভাইসরয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। "১৮৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার বিষয়টি 'কাউন্সিল অব এডুকেশনে'র গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। মি. জে. আর কলভিন তখন কাউন্সিলরের অন্যতম সদস্য। তিনি ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে আব্দুল লতীফকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে অনুরোধ করেন। এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্শিয়ান বিভাগ খোলা হয়।"[৮]

ইংরেজি শিক্ষায় মুসলমান সমাজের উৎসাহের পরিচয় পেয়ে আব্দুল লতীফ ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দানের জন্যে সরকারকে চাপ দিতে থাকেন। পরবর্তীকালে এই চাপের ফলেই প্রেসিডেন্সি কলেজে (১৮৭৩) মুসলমান ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়। "প্রকৃত পক্ষে ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লর্ড নর্থ ব্রুক প্রেসিডেন্সি কলেজের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার পর থেকেই মুসলমান সমাজে ইংরেজি শিক্ষার সব রকম প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।"[৯] ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে বিচারপতি আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৯) চেষ্টায় 'ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' নামে বাংলাদেশে আর একটি সংগঠন হয়। এ-সংগঠনও শিক্ষা কমিশনের কাছে মুসলমানদের দাবি সম্বলিত একটি 'মেমোরেন্ডাম' পেশ করে এবং এতে শুধু মুসলমানদের জন্যে কলকাতায় একটি কলেজ খোলার অনুরোধ জানায়।

উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমান সমাজে যে ভাব-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তার মূলে প্রাচীন ধর্মজীবনের আদর্শে ফিরে যাবার ইচ্ছা সর্বাংশে সক্রিয় ছিলো না। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণে অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে বর্তমান সম্পর্কে সচেনতা জাগে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তারা এগিয়ে আসে। উনিশ শতকের

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানের হাতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয় নি। তখন বাঙালি মুসলমানদের লেখায় যে পরিমাণ আবেগ প্রকাশ পেয়েছে সেই পরিমাণ জীবন জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ প্রকাশ পায় নি। তবে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) আগমনে বাঙালি মুসলমান লেখকদের চিন্তা ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। "উনিশ শতকের সপ্তম দশক থেকে শিক্ষা-দীক্ষা ও সভা-সমিতির প্রতি বাঙালি মুসলমান সমাজে আগ্রহ সৃষ্টি হলেও তা সর্ব স্তরের মুসলমানদের মনকে খুশি করতে পারে নি।"[১০]

সাহিত্যে আধুনিকতার অর্থই হলো নতুন মূল্যেবোধের প্রাগ্রসর চর্চা। সাহিত্যে মৌলিক পরিবর্তনের ফলে দেবদেবীর পরিবর্তে মানব জীবন প্রাধান্য লাভ করে। আধুনিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় বাঙালির সমাজ-জীবন, তার চিন্তা-ভাবনা ও দেশপ্রেম। বাংলা গদ্যের ব্যবহারই আধুনিক সাহিত্যের সূচনা করে এবং পরবর্তীকালে এ গদ্যই উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি সৃষ্টি করে। বাংলা গদ্য শুধু শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশেষ অবদান রাখে। গদ্য রীতির প্রবর্তনের ফলেই সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রের সৃষ্টি হয় এবং রচিত হয় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি গ্রন্থ। বাংলা গদ্যের সূচনায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (১৮০০) অবদান থাকলেও এ গদ্যের কোন সুনির্দিষ্ট রীতিবৈশিষ্ট্য ছিল না। "এসময় থেকে ১৮৫৭-৫৮ পর্যন্ত কালকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্ব হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।"[১১]

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫) পর্যন্ত কোন মুসলমান গদ্য লেখকের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় না। "তবে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত মীর মুশর্রফ হুসেনের (১৮৪৭-১৯১২) 'রত্নাবতী' নামক উপন্যাসই আধুনিক যুগে পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট প্রথম বাংলা গদ্য রচনা বলিয়া মনে হয়।"[১২]

কাজী নজরুল ইসলামের আগে বাঙালি মুসলমান লেখকদের দৃষ্টি মুসলমান সমাজের বাইরে বেশি প্রসারিত হয় নি। "বাঙালি মুসলমান সমাজে কাজী নজরুলই প্রথম মৌলিক প্রতিভা যিনি সমগ্র বাঙালি সামাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।"[১৩]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমান সাহিত্য সাধনার নতুন ধারার সূচনা করে। তবে উনিশ শতকের সপ্তম দশকের আগে বাঙালি মুসলমানের আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ দিকে। ফলে তারা সাহিত্য সৃষ্টি করলেও সে সাহিত্য জীবন জিজ্ঞাসায় পূর্ণতা লাভ করে নি।

ইংরেজি শিক্ষার ফলে শিক্ষিত বাঙালি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়। বাঙালির মধ্যে জাগে আত্মসম্মানবোধ, তারা আরও সচেতন হয় এবং জাতীয় গৌরব প্রকাশে তৎপরতা দেখায়। ইংরেজি সাহিত্যের সান্নিধ্যে ক্রমেই বাঙালির মনে দেশপ্রেম জাগে। মাতৃভূমির মর্যাদা নিয়ে বাঙালির মনে আগ্রহ জাগে এবং পরিণামে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে তারা এগিয়ে আসে। ইংরেজি সাহিত্যের রূপগত বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজি শিক্ষাই বাঙালি মুসলমানকে

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কার মুক্তির প্রেরণা দান করে এবং আধুনিক জীবনের সান্নিধ্যে নিয়ে আসে। বাঙালি মুসলমানের এই পরিবর্তন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রূপায়িত হয়েছে।

বাঙালি মুসলমানেরা যে শুধু ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়েছিল তা-ই নয়, তারা বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে পড়েছিল। ফলে যে সব চাকুরিতে ইংরেজি দরকার ছিল না সেখানেও মুসলমানেরা নিজেদের স্থান করে নিতে পারে নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নবাব আব্দুল লতীফ বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আন্দোলন শুরু করেন। এ আন্দোলন মুসলমান সমাজের উঁচু স্তরে কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও সমাজের সাধারণ মানুষের মধ্যে এর কোন গভীর যোগ ছিল না। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য।

উনিশ শতকের শেষে মুসলমানদের উঁচু ও নিচু শ্রেণীর মধ্যে ভাষার এক বিরাট পার্থক্য চোখে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে যে 'আশরাফ সমাজ' সৃষ্টি হয়েছিল তারা উর্দুকেই তাদের মাতৃভাষা বলে মনে করতো। উনিশ শতকের শেষ দশকে নতুন যুগের নতুন জীবনবোধ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক আকারে প্রকাশ পায় এবং এ সময় থেকেই তাদের মধ্যে সাহিত্যিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তারা তাদের ভাবনাকে সাধারণ মানুষের মনে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করে। নওয়াব আব্দুল লতীফ চেয়েছিলেন বাঙালি মুসলমান সমাজ আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, তারা ইংরেজি শিক্ষাকে গ্রহণ করুক। এভাবে শিক্ষাগত দিক থেকে এগিয়ে গেলেই বাঙালি মুসলমান সমাজ একটা শক্ত অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারবে। সৈয়দ আমীর আলী বাঙালি মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন :

> কলকাতা মাদ্রাসার সংগে একটি বি.এ কলেজ খোলা প্রয়োজন, যেখানে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য আবশ্যিক হিসাবে পঠিত হবে। এভাবেই মুসলমান সমাজ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে।[১৪]

মুসলমান সমাজের শিক্ষা বিষয়ক অভিমত সরকার প্রত্যাখ্যান করে। সৈয়দ আমীর আলীর শিক্ষা-বিষয়ক অভিমত আধুনিক চেতনার অনুসারী হলেও ইংরেজ শাসক তা গ্রহণ করে নি। সৈয়দ আমীর আলী বাঙালি মুসলমানের জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসলমানের স্বার্থ রক্ষার জন্যে তাদের মধ্যে সচেনতা ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশের জন্য ন্যাশনাল মহামেডান এ্যাসোসিয়েশন (১৮৭৭) গড়ে ওঠে। এ সময় ঢাকাতেও 'সমাজ সম্মিলনী' (১৮৭৯) ও 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) নামে বাঙালি মুসলমান সমাজের দুটো সংগঠন গড়ে উঠেছিল।

কলকাতাকে কেন্দ্র করে নওয়াব আব্দুল লতীফ ও সৈয়দ আমীর আলী যেভাবে সমাজ সংস্কারমূলক কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন, তেমনি ঢাকাকে কেন্দ্র করে 'সমাজ সম্মিলনী' পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান সমাজকে নবজাগরণের বাণী শোনাতে চেয়েছে। এ সংগঠন দুটির উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত অবস্থার উন্নতিসাধন করা। পরবর্তীকালে রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতা ও অসহযোগিতার জন্যে সম্মিলনীর উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে নি এবং শেষ পর্যন্ত সংগঠনটি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর টিকতে পারে নি।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের প্রায় দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানেরা ছিল রক্ষণশীল। কলকাতায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু সমাজ এ সময়ের মধ্যে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করে আরো গভীরভাবে ইংরেজি শেখার জন্য মনোনিবেশ করে। কিন্তু বাঙালি মুসলমানেরা তখন আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে এবং রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যে ইংরেজি ভাষা শিখতে পারে নি। এমনকি তাদের বাংলা ভাষা চর্চাও ছিল খুব সংকীর্ণ। তাই দেশীয় সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার সাথে তাদের গভীর যোগাযোগ ছিল না। নানা রকম অসুবিধা ও অর্থনৈতিক কারণে বাঙালি মুসলমানেরা যেমন ইংরেজি ভাষা শিখতে পারেনি তেমনি ধর্মীয় আবেগ ও বিভ্রান্তির কবলে পড়ে তারা বাংলা ভাষাও শিখতে পারে নি।

ইংরেজ শাসনামলে বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থার বেশ কিছু মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্রামীণ সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরে, জীবন হয়ে ওঠে শহরমুখী এবং দেখা দেয় নতুন শ্রেণীবিন্যাস। এই নতুন শ্রেণীই আবার সামাজিক অগ্রগতি সম্ভব করে তোলে। কিন্তু মুসলমানেরা সেই সামাজিক অগ্রগতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে নি। কারণ শহরকেন্দ্রিক জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মধ্যবিত্ত হিন্দু শ্রেণীই প্রধান্য পায়। তাই শহরমুখী জীবনে এরাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজ ও সাহিত্য আন্দোলনে প্রধান্য লাভ করে। অন্যদিকে মুসলমান সমাজ ধর্মসংস্কার আন্দোলনে যোগ দিয়ে সমাজের পরিবর্তন করতে চাইলেও সেই সমাজ আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে গভীর যোগ ঘটাতে পারে নি। বরং তাদের ধর্মীয় আন্দোলন প্রাচীন জীবন যাত্রার দিকে নিয়ে গেছে। ওহাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মনে দেশপ্রেম জেগে উঠলেও সে আন্দোলন ছিল প্রধানত ধর্মীয় আন্দোলন। হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন পরিচালিত হয়। পরবর্তীকালে এ আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ লাভ করে। বিধর্মী শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ আন্দোলন পরিচালিত হলেও অবশেষে তিতুমীরের নেতৃত্বে এ আন্দোলন সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। "তিতুমীরের বিদ্রোহের কাহিনী থেকে আমরা এটুকু বুঝতে পারি যে, তাঁর মূল অভিপ্রায় ছিল প্রচলিত ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধন।"[১৫]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলিম মানসের চিন্তা-ভাবনা ছিল মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাই সমাজ বলতে তারা মনে করতো মুসলমান সমাজকে। মুসলমান সমাজ বুঝেছিল সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করতে হলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে না পারলে তাদের উন্নতি হবে না। এর বিস্তারও মাতৃভাষার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই মাতৃভাষা নিয়েও বাঙালি মুসলমানকে চিন্তা করতে হয়েছে।

বিশ শতকের প্রথমদিকে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে তর্কবিতর্ক ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও পরবর্তীকালে এর মীমাংসার উপর গুরুত্ব দেয়। তখন এক শ্রেণীর মুসলমান যারা নিজেদেরেকে অভিজাত বলে মনে করতো, তারা বাংলা ভাষাকে অবহেলা করতে শুরু করে। পরে বাংলা ভাষার সাথে গভীর পরিচয় হলে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে ওঠে এবং তাদের চিন্তাশক্তি প্রসার লাভ করে। বিশ শতকের প্রথম দশকে বাঙালি মুসলমানেরা বুঝেছিল বাংলা ভাষাই তাদের মাতৃভাষা। 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' (১৯২৬) যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁরা ভেবেছিলেন সাহিত্য চর্চার

Dhaka University Institutional Repository

মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা সমাজের কাছে তুলে ধরবেন। সমাজ বলতে তারা মনে করতেন বাঙালি মুসলমান সমাজকে। তাই তাঁদের চিন্তাভাবনা ছিল বাঙালি মুসলমান সমাজ নিয়েই।

'মুসলিম সাহিত্যসমাজ'কে শুধু বাংলা ভাষা নিয়েই ভাবতে হয়েছে তাই নয়—শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়েও তাদের চিন্তা-ভাবনা করতে হয়েছে। মুসলিম সাহিত্য সমাজই প্রথম বুঝতে পেরেছিল যে, বাঙালি মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত করতে না পারলে শিল্প-সাহিত্য তাদের কাছে কোন অর্থ বহন করবে না।

নবাব আব্দুল লতীফ তাঁর 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি'র মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজের ভিত্তি গড়ে তোলার ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষাগত দিক থেকে মুসলমান সমাজকে একটা শক্ত পটভূমির উপর দাঁড় করাতে। এই সোসাইটি বাংলা ভাষার চর্চা না করলেও পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যে আধুনিক চিন্তা ও চেতনার সঞ্চার করেছিলো। নবাব আব্দুল লতীফের মতো সৈয়দ আমীর আলীও বাঙালি মুসলমান সমাজের জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুসলমান সমাজে রাজনৈতিক চেতনার অভাব লক্ষ করে তিনি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করেন।

ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ মনোভাবের জন্যে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ থেকে মুসলমানেরা বঞ্চিত হয়েছে। তবে বাঙালি মুসলমান সমাজের একটা অংশ যে রক্ষণশীল ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। এরা ইংরেজি শিক্ষাকে মেনে নিতে পারে নি। আর এ না পারার প্রধান কারণ ধর্মীয় কুসংস্কার।

অবশ্য বিশ শতকের প্রথম দশকের একটি ঘটনা বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। এ ঘটনাটি হলো বঙ্গভঙ্গের ঘটনা। "১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গ-ভঙ্গ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা। কারণ বঙ্গ-ভঙ্গের মধ্য দিয়েই বাঙালি জাতির ভবিষ্যত নির্ধারিত হয়ে যায়।"[১৬]

বিশ শতকের প্রথম দিকে কোন কোন মুসলমান সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা পেয়েছেন ইসলামের ইতিহাস, আদর্শ, ঐতিহ্য ও ধর্মনীতি থেকে। মুসলমান হিসাবে তাঁরা ভেবেছিলেন তাদের অস্তিত্বের কথা। তাঁদের স্বাতন্ত্র্যের কথা। তাই তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সেই সচেনতার জন্য কেউ কেউ স্বাতন্ত্র্যের পথে পা দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ স্বাতন্ত্র্যবাদী হয়েও হিন্দু -মুসলমানের মধ্যে মিলনের উপায় খুঁজেছেন।

> ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবরে সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সংগে উচ্চবিত্ত ভারতীয় মুসলমানের একটি প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করেন। মহামান্য আগা খাঁ ছিলেন দলের নেতা। সম্প্রদায় হিসাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের উপরে এঁরা খুব জোর দেন। ঐ বছরই ডিসেম্বরে এদের উদ্যোগে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় একটি শিক্ষা সম্মেলন। সম্মেলনের শেষেই জন্ম হয় 'নিখিল ভারত মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

লীগে'র। এই সম্মেলনে বঙ্গ-ভঙ্গের ব্যবস্থা সমর্থিত হয় এবং স্বতন্ত্র নির্বাচনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।[১৭]

এ দেশে ইংরেজদের আগমনে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন আসে তার প্রভাব সাহিত্যের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়েছিল। মুসলমানদের বাংলা সাহিত্যে পিছিয়ে থাকার কারণ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ না করা। হিন্দুরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইংরেজ শাসকদের সাথে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করেছে। এ জন্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁরা মর্যাদার সাথে স্থান করে নিয়েছে। আধুনিক যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে সাহিত্যের যে বিচিত্র বিকাশ তা প্রধানত হিন্দু সাহিত্যিকদের জন্যেই হয়েছিল। অন্যদিকে মুসলমানদের অতীতমুখী মন ওহাবী আন্দোলনের (১৮১৮) মানসিকতার জন্য 'দোভাষী' পুথির মধ্যেই সাহিত্যের স্বাদ নেয়ার চেষ্টা করেছে।

পরবর্তীকালে ইংরেজদের প্রতি মুসলমানদের অসহযোগিতামূলক মনোভাব দূর হয় ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের পর। এটা সম্ভব হয়েছিলো স্যার সৈয়দ আহমদের আপোসমূলক প্রচেষ্টার ফলে। তিনিই প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা না করলে মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকবে। হিন্দুরা ইংরেজদের সাথে সহযোগিতা করে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর মুসলমানেরা তা না করে নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে এনেছে। তাই তিনি ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির জন্য মুসলমান সমাজে প্রচারণা চালিয়েছেন। তাঁর এ প্রচারণার ফলে মুসলমানেরা তাদের ভুল বুঝতে পারে। তারা ইংরেজদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ ও অভিমান ছেড়ে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে।

তখনকার অনেক মুসলমান বুদ্ধিজীবী ইংরেজদের সাথে সহযোগিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। এ উদ্দেশ্যেই 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি ' গঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করা। এবং তাদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটিয়ে এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয়ে চিহ্নিত করা। এসব চেষ্টার ফলে দেখা যায় মুসলমানেরা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করে নিজেস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশে তৎপর হয়ে উঠে এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়।

মুসলিম জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলিম সাহিত্যিকেরা যে ধারার প্রবর্তন করেন তা স্বাতন্ত্র্যধর্মী বলে পরিচিত। *সুধাকর* (১৮৮৯) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যাঁরা সাহিত্য সাধনা করেছিলেন তাঁরা আবার 'সুধাকর দল' নামেও পরিচিত। তাদের রচিত সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্যে বলেও অভিহিত করা যায়। তাদের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি থাকলেও তাঁরা কখনো সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। উনিশ শতকের শেষে হিন্দুদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের যে প্রেরণা এসেছিল তা মুসলমানের মধ্যেও দেখা যায়। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্যে যাঁরা ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন তাঁদের মধ্যে মুনসী মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭) ও মুনসী জমিরুদ্দিন (১৮৭০-১৯৩০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্যে তাঁরা গ্রামে গ্রামে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁদের পথ অনুসরণ করে যাঁরা সাহিত্যর মাধ্যমে মুসলমান সমাজকে রক্ষার ব্যবস্থা করেন তারা 'সুধাকর দল' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সুধাকর দলের যাঁরা লেখক ছিলেন তাঁদের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

মৌলভী মেয়ারাজ উদ্দিন আহমদ, পণ্ডিত রিয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) ও মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন (১৮৬২-১৯৩৩) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের প্রচেষ্টায় *ইসলাম তত্ত্ব* (১৮৮৭) প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ প্রকাশ করে তাঁরা ইসলামের আদর্শ ও মর্ম জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) সমন্বয়ধর্মী ধারার প্রবর্তন করলেও তাঁর রচনার মধ্যে ইসলামী ভাব প্রকাশ পেয়েছে। তবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে সাহিত্য রচনা করেন নি। উনিশ শতকের শেষ দিকে মুসলমান সাহিত্যিকেরা ধর্মীয় বিষয়বস্তু নিয়ে সাধনা করলেও মীর মশাররফ হোসেন শুধু ধর্মের বিষয়বস্তুর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাহিত্য শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁর *বিষাদ- সিন্ধুতে* (১৮৮৫-৯০) ধর্মীয় চেতনার পরিচয় থাকলেও এর কাহিনী জীবন চেতনায় প্রাণবন্ত। এর কোন কোন চরিত্র ইতিহাসের কাহিনী ও পুঁথির পাতায় আবদ্ধ না থেকে আমাদের সমাজের রক্ত মাংসের মানুষের মাঝে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর এজিদ-জয়নব পুঁথির জগত থেকে বেরিয়ে এসে গভীর জীবনধর্মে জড়িয়ে মানব জীবনের ট্রাজেডিকে স্বীকার করে নিয়েছে।

স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকদের উদ্দেশ্যে ছিল মুসলমান জাতির অধঃপতন রোধ করা। তাঁরা বুঝতে পারেন মুসলমান জাতির উন্নতি করতে হলে মুসলমানদের অতীত ইতিহাস ও ধর্মীয় চেতানার প্রচার করা প্রয়োজন। তাই *মিহির* (১৮৯২), *মিহির ও সুধাকর* (১৮৯৫), *ইসলাম প্রচারক* (১৮৯৯-১৯১০), *সুলতান* (১৯০৩-১৯০৮), *নবনূর* (১৯০৩-১৯০৭), *মোহাম্মদী* (১৯০৩-০৪), *বাসনা* (১৯০৮-০৯), *আল এসলাম* (১৯১৫-২০) প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকার মাধ্যমেই মুসলমান জাতির মানসগঠন সম্ভব হয়েছিল। সে কালের স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকের সাহিত্য সাধনাও ছিল প্রচারধর্মী। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জাতির কল্যাণ সাধন করা। তাই তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের অতীত গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরে সাহিত্য সাধনা করেছেন। এসব স্বাতন্ত্র্যধর্মী লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৪-১৯৬৪), মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯-১৯৩১), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬), মুনসী জমিরুদ্দিন (১৮৭০-১৯৩৭), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৫৯-১৯১৯) প্রমুখ। এঁদের আগে কোন কোন মুসলিম সাহিত্যিক সাহিত্য সাধনা করলেও তা মুসলমানদের জাতীয় জীবনে কোন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নি। মুসলমান জাতির নিজস্ব আদর্শ তুলে ধরতে এবং মুসলিম সাহিত্যের বিকাশে এদের অবদান অপরিসীম। জমিরুদ্দিনও মেহেরুল্লাহর মতই প্রচারক জীবনে যথেষ্ট সার্থকতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর নিজের বিবৃতি থেকেই জানা যায় যে, তিনি তের হাজারের ও অধিক খ্রিস্টানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৮] এঁরা ছিলেন মূলত সমাজ সংস্কারক ও প্রচারক। তাঁরা ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমান সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের ইতিহাস, আদর্শ, ঐতিহ্য ও ধর্মনীতি যাঁরা রচনার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে সাহিত্য সাধনা করেন তাঁদের মধ্যে মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬) ও মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি করা। এঁরা

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন রাজনীতি সচেতন ও স্বাতন্ত্র্যবাদী। ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও আদর্শকে এঁরা রচনার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তবে এঁদের মধ্যে মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছিলেন প্রাচীনপন্থিদের তুলনায় প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী। বাঙালি জাতিকে এঁরা ইতিহাস সচেতন করে তুলেছিলেন। মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্যে তাঁরা কখনো বক্তার ভূমিকা, কখনো লেখকের ভূমিকা, আবার কখনো বা সংগঠকের ভূমিকা পালন করেছেন। এঁরা কুসংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন না। এঁরা সবাই ছিলেন মুক্ত মনের অধিকারী ও যুক্তিবাদী। এঁদের মধ্যে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ব্যাংকের সুদ প্রদানকে ধর্ম বিরুদ্ধ নয় বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন। "তিনি সারা জীবন কেঁদেছেন পাগলের মত কি হবে আমাদের ভবিষ্যত? মুসলমানেরা লেখাপড়া শিখছেন না, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসছেন না, খবরের কাগজ পড়েছেন না, আসছেন না রাজনীতি চর্চায়।"[১৯] ইসসাইল হোসেন সিরাজী স্বাতন্ত্র্যবাদী লেখক হয়েও ছিলেন প্রতিবাদী। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠগ্রন্থ *অনলপ্রবাহ* (১৯০০)-এ প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মুসলমান সমাজের জাগরণের জন্যেই তিনি সাহিত্য সাধনা করেছিলেন। তিনি সচেষ্ট ছিলেন মুসলমান সমাজের মাঝে নব জাগরণ আনতে। জ্ঞানে ও কর্মে মুসলমান জাতি উন্নতি লাভ করুক এটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করে মুসলমান জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠলে জাতীয় জীবনের উন্নতি হবে বলে তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। "স্বাধীনতা অর্জনের তীব্র আকাঙ্খায় উদ্দীপ্ত হয়ে প্রথম জীবনে তিনি অগ্রসর হিন্দু শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে দ্বিধা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় পরাধীনতার শৃংখল ছিন্ন হোক।"[২০]

মোহাম্মাদ এয়াকুব আলী চৌধুরীও ধর্মীয় বিষয় নিয়ে সাহিত্য সাধনা করেছেন। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য থেকে সাহিত্যর উপাদান সংগ্রহ করলেও তাঁর রচিত সাহিত্যে কোন সংকীর্ণতার পরিচয় নেই। "তিনি তাঁর সাহিত্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। মানব সমাজের কল্যাণ কামনা ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্মীয় বিষয় যে কত হৃদয়গ্রাহী হয় মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরীর রচনাই তার উজ্জ্বল নিদর্শন। এ উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সমগ্র জীবন ও সাহিত্যে।"[২১] মাতৃভাষার প্রশ্নে তিনি বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তার মতে, মুসলমানদের মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। *মানব মুকুট* (১৯২২) গ্রন্থে তিনি হযরত মোহাম্মদের মাহাত্ম্য তুলে ধরলেও তা আলেমদের মতো ধর্মীয় আবেগে জড়িত নয়। তার পদ্ধতি ভিন্ন রকমের। "আনা বাশারুম মোযলেকুম' আমি তোমাদেরই মতো একজন মানুষ। হযরত মোহাম্মদের এই বাণীই তাঁর সমগ্র চিন্তা-ভাবনার কেন্দ্র।"[২২] *মানব মুকুট* গ্রন্থে তিনি হযরতকে মানব জাতির সেবক ও পথ প্রদর্শক রূপে দেখেছেন। ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষাকে তিনিই মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বিশেষ করে মুসলমান সমাজ ইসলামের প্রকৃত আদর্শ তাদের জীবনে প্রতিফলিত করুক এটাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। *মানব মুকুট* গ্রন্থে তিনি হযরত মোহাম্মদের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন গভীর মানব প্রেম। *শান্তিধারায়* (১৩২৯) তিনি সুন্দর জীবন গঠনের কথা বলেছেন। সুন্দর জীবন গঠন করতে হলে ইসলামের আদর্শকে গ্রহণ করতে হবে। "ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি তাঁর বিষয়বস্তু হলেও সংকীর্ণ ঐতিহ্য গর্বের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন নি। বরঞ্চ সুষ্ঠু মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তনায় তাঁর মৌলিক চিন্তা শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।"[২৩]

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি গভীর আকুতি। আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি আকুলতা থাকলেও তাঁর রচনার মূলে ছিল প্রেম ও কল্যাণের প্রেরণা। মহৎ জীবনের বাণী প্রচারই ছিল তাঁর আজীবন সাধনা।

সেকালে *সুধাকর* পত্রিকার প্রধান কাজ ছিল ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত সংবাদ প্রচার করা। এ পত্রিকাই মুসলমান সমাজের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ সাধন করেছিল। সেকালে সুধাকর দলের লক্ষ্য ছিল মুসলিম সমাজের অধঃপতন রোধ করা। সুধাকর পত্রিকার লেখকরা বুঝেছিলেন মুসলমানদের জাতীয় জীবনে উন্নতির প্রেরণা জাগাতে হলে মুসলমানদের অতীত ইতিহাস ও ধর্মীয় চেতনার প্রচার করতে হবে। তাঁদের ধারণা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই জাতির মানস গঠন সম্ভব। এক কথায়, সেকালে সুধাকর পত্রিকার সাহিত্য প্রচেষ্টা ছিল প্রচারধর্মী। মুসলমান জাতির কল্যাণই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান জাতির ইতিহাস নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে 'সুধাকরদল'ই মুসলমানদের জাতীয় জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মুসলমান জাতির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে এঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

বাঙালি মুসলমানের জাগরণে *শিখা* (১৩৩৩) পত্রিকার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । 'শিখাগোষ্ঠী'র লেখকগণের মধ্যেই আধুনিক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিখা পত্রিকার লেখকেরা স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা করেছিলেন। তাঁরাই মুসলমান সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিলেন সমকালীন মুসলমান সমাজের অন্ধবিশ্বাসের মূলে আঘাত করার উদ্দেশ্যে *শিখার* লেখকেরা পীর পূজার কঠোর সমালোচনা করে মোল্লাদের বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করে সমাজকে সচেতন করে তুলেন।

শিখার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সমাজের পরিবর্তন সাধন। মুসলমান সমাজের জীবন ও তাদের চিন্তার পরিবর্তনই ছিল *শিখার* লক্ষ্য। *শিখার* লেখকগোষ্ঠী মুসলমান সমাজের কুসংস্কার ও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে লেখনি ধারণ করেছিলেন। *শিখাই* মুসলমান সমাজের মধ্যে নবজাগরণ এনেছিলো। এর লেখকেরা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। *শিখার* লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কাজী আনোয়ারুল কাদীর (১৮৮৭-১৯৪৮), কাজী আব্দুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবুল হুসেন (১৮৯৭-১৯৩৮), কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১), মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) আব্দুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) প্রমুখ।

বাঙালি মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সমস্যার সন্ধান এবং যে সমস্যার সমাধানের প্রয়াস রয়েছে *শিখা* পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধে।

> সব সময় মনে রাখতে হবে লোকহিতই ধর্মের উদ্দেশ্যে। ধর্মকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় অকল্যাণ হচ্ছে, তবে বুঝতে হবে কোথাও কোন একটা গোলমাল হয়ে আছে। হয় ধর্মের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি হয় নাই, নয়ত ধর্মের সে অংশের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বর্তমান অবস্থায় তা অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলার মুসলমান সমাজ নিজেদের আত্ম পরিচয় 'বাঙালি' না 'মুসলমান' বলে প্রকাশ করবে সে সম্পর্কে ছিল দ্বিধাগ্রস্ত।

> মানুষের চরম বিকাশের প্রথম পথ হচ্ছে মুক্তবুদ্ধি যাতে জগতের প্রয়োজন অনুসারে যুগধর্মের ইংগিত অনুসারে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করতে সহজ হয়। অতীতের কোন যুগ বিশেষের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যারা বর্তমানকে অস্বীকার করে তাদের মুক্ত বুদ্ধি নয়।[২৫]

শিখার লেখকগোষ্ঠী পর্দার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন বাঙালি মুসলমানের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত বাংলা ভাষা। মুসলমান সমাজের উন্নতির কথা এঁরা চিন্তা করেছেন। মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার অভাব সম্পর্কে শিখার লেখকেরা ছিলেন সচেতন। পর্দা প্রথার খারাপ দিক সম্পর্কে তাঁরা সমাজকে সচেতন করে দেন।

> বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্ম শিক্ষা হতে পারে না। ধর্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধির অভাবে আজকাল আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়ামিই আমাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২৬]

বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম মানসের চিন্তা-ভাবনা ছিল মুসলমান সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। তাই তাদের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে স্ব সমাজের উন্নতির উদ্দেশ্যে এবং এ-ক্ষেত্রে অন্যতম লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন। মুসলমান সমাজে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে না পারলে তাদের কোন উন্নতি হবে না এটা মুসলিম সমাজের অগ্রবর্তীগণ জানতেন। আর এ শিক্ষাও জ্ঞান বিস্তার ও প্রসার সম্ভব মাতৃভাষার মাধ্যমেই। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে মাতৃভাষা নিয়ে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও পরবর্তীকালে তারা এর উপর গুরুত্ব দেয়। বাংলা ভাষার সাথে তাদের গভীর পরিচয় হলে তাদের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠে এবং তাদের চিন্তা শক্তি প্রসার লাভ করে। 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ' যাঁরা গঠন করেন তাঁরা ভেবেছিলেন সাহিত্য চর্চার মাধ্যমেই তাঁরা নিজেদের চিন্তা-ভাবনা সমাজের কাছে তুলে ধরবেন। 'মুসলিম সাহিত্যসমাজ'ই সর্ব প্রথম বুঝতে পারেন যে, বাঙালি মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত করতে না পারলে শিল্পসাহিত্য তাদের কাছে কোন অর্থ বহন করবে না। জীবনকে জাগিয়ে তোলাই ছিল মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রধান লক্ষ্য। সমাজের অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মকে গোঁড়ামি থেকে, কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁরা বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন। বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম মানসের চিন্তাধারার বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁরা তখন সমাজ, জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্র ও সাহিত্য-শিল্প নিয়ে বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা করেছেন। মুসলমান জাতির জাগরণে তাদের এ চিন্তা-চেতনা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। তাঁরা অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন যে সব চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাকে কয়েকটি উপ-শিরোনামায় বিবেচনা করা যায়।